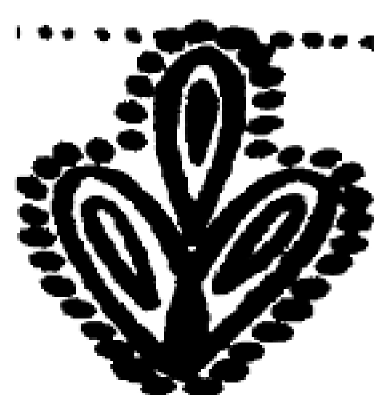
সংকট

সতীনাথ ভাদুড়ী



বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো



প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৬৪
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা
বিমল দাস
প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

পুস্তকে উল্লিখিত মুহূর্তগুলির মধ্যে কয়েকটির বিবরণ পূর্বে মাসিক-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সেক্রেটারির কথা

প্রত্যেকের জীবনই বোধহয় বিচিত্র এক আকাঙ্ক্ষা ও অন্বেষণের রহস্য। সে জিনিস কি, কোথা থেকে আসে, কেন আসে, সে সব আমি জানি না। একটা ক্ষেত্রে কেমনভাবে এসেছিল, শুধু সেই কথাটা আমার কিছু কিছু জানা। বিশ্বাসজীর কথা বলছি। তাঁর খোঁজের আগ্রহটুকু মোটা লাইনে, চড়া রঙে আঁকা; সেইজন্য আমাদের নজরে পড়েছিল। সুবিধার মধ্যে তাঁর মনের রূপান্তরের ধারা খানিকটা দূর পর্যন্ত তিনি আমার কাছে বলেছিলেন নিজমুখে। বাকিটা অবশ্য অনুমান-নির্ভর। তাঁর শেষ জীবনের কার্যকলাপ, কথাবার্ত্তা ও বাহ্য আচরণ থেকে কিছুটা আন্দাজ করতে পারি মাত্র।

বিশ্বাসজীর চরিত্রের আলোচনায় আমার তৃপ্তি আছে; কারণ তাঁকেই আমি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করি। তাঁর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে একসময় সমাজ-সেবার বন্ধুর পথে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আকর্ষণ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল অদ্ভুত। বারকয়েক তাঁর কর্মধারা ও জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন ঘটতে আমরা দেখেছি; প্রতিবার তিনি যেন আলাদা মানুষ, এত মৌলিক রূপান্তর; তবু কখনও পরিচিত ব্যক্তিরা তাঁর ভাবান্তরগুলোকে নতুন খামখেয়াল ব'লে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেনি। কেননা যে একবার সংস্পর্শে এসেছে, সেই জানত যে নিজের কাছে নিজের প্রশ্ন ও জবাবদিহির অন্ত নেই তাঁর। কতবার কতকিছু তো তাঁকে করতে দেখলাম; কিন্তু কখনও মনে হয়নি যে তাঁর নিষ্ঠার মধ্যে ভেজাল আছে, বা তিনি নিজেকে নিজে ফাঁকি দিচ্ছেন। গোঁজামিল দিতে যে তিনি জানতেন না, স্রোতে গা এলিয়ে দেওয়া যে তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় তিনি ছিলেন এ অঞ্চলের মস্ত নেতা। তাঁর নাম জানে না এমন লোক এখনও এ জেলায় পাওয়া কঠিন। তখন তিনি

হুলস্থুল পড়ে গেল এ নিয়ে—তাঁর জায়গা নেবার মত লোক যে আর নাই এ অঞ্চলে। রাজধানী থেকে সবচেয়ে বড় নেতা পর্যন্ত ছুটে এলেন খবর পেয়ে। কী ব্যাপার? কী চান তিনি? কার বিরুদ্ধে অভিযোগ? ছাড়ছেন কেন?…

"ছাড়ছি নিজের স্বার্থে। মনটা দিনদিনই স্বার্থপর হয়ে উঠছে।" আশার দ্যুতি দেখা গেল রাজধানীর নেতার চোখে।

"আহা, স্বার্থ বলছেন কেন। আমরা রয়েছি কিসের জন্য! আমরা নিজে থেকে খোঁজ নিয়ে জানতে চেষ্টা করিনি আপনার সুবিধা অসুবিধার কথা, সে ত্রুটি আমাদের। যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই। আপনি যে মুখ ফুটে মনে করিয়ে দিলেন সে আপনার অসীম দয়া। সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছু ভাববেন না। লোকে আপনাকে চায়, আর আপনি ছাড়লেই হ'ল!"

"না না, সে হয় না আর।"

এই এক উত্তর বিশ্বাসজীর। শত পীড়াপীড়িতেও তাঁর জবাব বদলাল না। তবু আশা ছাড়েন না রাজধানীর নেতা। যাবার আগে অতিরিক্ত বিনয়ের সঙ্গে, ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে বলেন—"আপনার একটা কোন অনুরোধ রাখবার সুযোগ যদি আমাদের দিতেন বিশ্বাসজী··"

সে সুযোগ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করলেন না বিশ্বাসজী। স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের কর্ণধার রাজধানীর নেতাটিকে তিনি অনুরোধ করলেন এক অদ্ভুত। একটা বিখ্যাত সরকারী রাস্তা আছে এ অঞ্চলে। সেকালকার সাহেব এনজিনিয়ার কি যেন মনে করে রাস্তাটার দুধারে কদম গাছ লাগিয়েছিল। বহুকাল আগেকার কথা। তখন সেই গাছগুলো জরাজীর্ণ। ডালপালা নাই বললেই চলে; কোন রকমে বেঁচে রয়েছে মাত্র। ওই কোটরেভরা শ্রীহীন গাছগুলোকে কেটে ফেলে, সেই জায়গায় নতুন গাছ পোঁতবার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন বিশ্বাসজী। রাজধানীর-নেতা কি বুঝলেন তিনিই জানেন; তবে অভ্যাসবশে, ফেরবার আগে দুই-একজন বিশ্বস্ত স্থানীয় অনুচরদের কাছ থেকে চুপিচুপি খোঁজ নিয়ে যেতে ভুললেন না, কোন কাঠের কারবারীর খুব মাখামাখি আছে কি না বিশ্বাসজীর সঙ্গে।

রাজনীতিক জীবনে আমি ছিলাম তাঁব সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য। তিনি কাজের সূত্রে এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। ভ্রাম্যমাণ জীবনে একজন কেউ সঙ্গে থাকলে একটু সুবিধা হয়। আমি ছিলাম বিশ্বাসজীর সেই সঙ্গী—লোকে বলত সেক্রেটারি। সেইজন্য আমি যতটা তাঁর অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ পেয়েছিলাম, ততটা বোধহয় আর কেউ পায়নি! কি পরিশ্রমই করতে পারতেন। শরীরটা ছিল খুব ভাল। গায়ে অসীম শক্তি। ভোর রাত্রিতে উঠে চিঠিপত্রগুলো লিখে রাখতেন। তারপর থেকে আরম্ভ হয়ে যেত তাঁর দৈনিক কাজের রুটিন। রাত এগারটায় শোয়া। এর মধ্যে স্নানাহার ছাড়া আর বিশ্রাম নাই।

আমিও তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর জনসেবার কাজ ছাড়বার কারণ। আমার কাছে তিনি মনের কথা বলেছিলেন।

"যতকাল চলল, চালালাম। আর চলল না। বুঝলে না? এতে প্রত্যেকটা মুহূর্ত এমন কাজের ঠাসবুননে ভরা যে শেষ পর্যন্ত এ সবের মানেটা পর্যন্ত হারিয়ে যায়। একাজ থেকে পরের কাজ, তারপরের কাজ, তারপরের কাজ,—সব মুহূর্তগুলো এক রকম। সবগুলো সমান কাজের হলে কোনটা ছোট কোনটা বড মুহূর্ত বুঝবে কি করে? নমস্কার করছ, হেসে কথা বলছ, ভয় দেখাচ্ছ, আশ্বাস দিচ্ছ, সবগুলো একরকম। তোমার টাইপরাইটারটায় যেমন ঠকঠক করে একটা অক্ষরের পর আর-একটা অক্ষরের ছাপ পড়ে সেইরকম, কাজের চিঠিতেও যেমন, অকাজের চিঠিতেও তেমন। সব সময় একরকম। আর চলল না। নিজের মনের দিকে পর্যন্ত ফিরে তাকাবার ফুরসত নেই।" এর চেয়ে বেশী তিনি আর কারও কাছে বলেন নি। এই গেল তাঁর জনসেবার কাজ ছাড়বার ইতিহাস। জেলার জনসাধারণ বলাবলি করল, বিশ্বাসজী চিরকালই 'সাধু আদমী', এইবার পাকাপাকি সন্ন্যাসী হবেন।

তিনি বডলোক ছিলেন না। তবে বাড়িভাড়ার থেকে নিজের খাওয়াপরা চলে যাবার মত আয় হয়ে যেত। বহুকাল পরে বিশ্বাসজী নিজের বাড়িতে স্থায়ীভাবে বাস করতে এলেন। রেণুদিদের বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা

বজায় থাকল। ফাইফরমাশ খাটত রেণুদিদের পুরনো চাকর রামধনী, কিংবা তার পালিতপুত্র রঘুয়া। অবসর পেলেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম।

প্রথমবার গিয়েই দেখি প্রচুর বই আনিয়েছেন কলকাতা থেকে, আর অনেক নতুন নতুন ফুলের গাছ পুঁতেছেন। বই আর বাগান নিয়ে মেতেছেন বিশ্বাসজী।

তাঁর পড়াশোনা যা কিছু সব জেল থেকে। জেলখানার পড়া সাধারণতঃ একটু একপেশে হয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, জড়বাদীদর্শন, অর্থনীতি, এই রকম কতকগুলি বিষয় পড়েছিলেন খুব, কিন্তু অনাবশ্যক বোধে জ্ঞানের অধিকাংশ ক্ষেত্র নিয়ে মাথা ঘামাননি। রাজনীতিক মহলে কঠোর যুক্তিবাদী বলে তাঁর নাম ছিল, প্রতি বৎসর কর্মীদের শিক্ষণ শিবিরে তিনি জড়বাদী দর্শন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিবাদের উপর যে ক্লাসগুলো নিতেন, সেগুলোতে নামকরা নেতারাও উপস্থিত থাকতে ভুলতেন না। বাড়িতে এসে বসবার পর তিনি যে সব বই আনালেন, সেগুলো দেখলাম অন্য সব বিষয়ের—যেগুলোকে এতদিন বাদ দিয়ে এসেছিলেন সেইগুলোর উপরেই ঝোঁক গিয়েছে এখন। লাইব্রেরী থেকেও দেখলাম এমন সব বই আনিয়ে পড়ছেন, রাজনীতিক জীবনে যে সব বই আমাদের পড়া তিনি অপছন্দ করতেন। আমার মত আনাড়ীর কাছে ঝাড়া একঘণ্টা নতুন ফুলের গাছগুলোর সম্বন্ধে লেকচার দিলেন। আগে, কথাবার্তা ও আচরণে লঘু চাপল্য প্রকাশ না পেয়ে যায় এ বিষয়ে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। রঘু বলে যে ছোকরাটা তাঁর ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল তার সঙ্গে দেখলাম প্রাণখুলে হাসি-তামাসা করছেন তার বাবরি চুল আর গেরুয়া কাপড় নিয়ে। পাড়ার ইউনিভার্সাল দাদিওলাদা' দেখি রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতে আসে। এমন গা এলিয়ে প্রাণখুলে গল্প করতে তাঁকে কখনও দেখিনি। বুড়ো নিরাপদবাবু যাঁকে এখানে সবাই ভয় আর সমীহ করে তাঁর সঙ্গেও দেখলাম বিশ্বাসজী হালকা হাসি-ঠাট্টার কথা বলতে ছাড়লেন

না। হালকা সুরে বাঁধতে চাইছেন মন। একেবারে আগেকার উলটো! বোধহয় তাঁর ধারণা এক-এক ধরনের কর্মজীবনের সঙ্গে জড়ান আছে এক-এক রকমের প্রত্যাশিত ও স্বীকৃত আচরণ। মনের মধ্যে যেন অনেকগুলো খোপ আছে। যেটাকে খুলবে, সেইটাকে নিয়েই থাকতে হবে তখনকার মত।

মৃত্যুকালে মায়ের সঙ্গে দেখা হয়নি বলে তাঁর মনে নিশ্চয়ই একটা আক্ষেপ ছিল। এর প্রমাণ পেলাম একটা ছোট্ট ব্যাপারে। বাড়ির ভাড়া-দেওয়া অংশের উঠনে একটা বাঁধানো তুলসী-মঞ্চ ছিল। তাঁর মায়ের। বিশ্বাসজী নতুন পাঁচিল তুলে উঠনটাকে এমনভাবে ভাগ করে নিলেন, যাতে তুলসী-মঞ্চটা তাঁর অংশে পড়ে।

"ওই দেখ দেখ,—এসেছে!"

তিনি বারান্দায় যেখানে বসেন তারই পাশে বাঁশের জাফরি করে একটা লতা তুলে দিয়েছেন, ভায়লেট রঙের ফুল; ছোট ছোট মটরের মত ফল থোকা থোকা ঝুলছে; পাকা ফলগুলো টুকটুকে লাল; সেই ফল খাওয়ার জন্য দুটো বুলবুলি পাখি এসেছে। তাঁর এই ছেলেমানুষী আনন্দ সেই বুলবুলি দুটোকে দেখে।

'এটা কী লতা'?

'ইংরাজীতে একে বলে আলুলতা। গোলআলুর ফুল দেখেছ? দেখনি? চোখ খুলে তাকিয়ে দেখবার অভ্যাস যে তোমাদের নেই। আলুর ফুল ঠিক এই ফুলগুলোর মত দেখতে। এর ফল খাওয়ার জন্য বুলবুলি আসবেই আসবে। সেই জন্যই লতাটা এই বসবার জায়গার পাশেই লাগিয়েছি। এখনও ভয় পায় পাখিগুলো। আচ্ছা, বুলবুলির ডাকের মধ্যে একটা নূপুরের ধ্বনির মত শব্দ পাও? পাচ্ছ না? সব ডাকগুলোতে নয়; মাঝে মাঝে! ওই যে! একটা ধাতব শব্দ!

ওই যে এইটা! ঘুঙুরের শব্দের মত লাগল না? না। কান নেই তোমাদের! আচ্ছা ওই যে রেণুদের ফক্সটেরিয়ার কুকুরটা ডাকছে না—ও ডাকের মধ্যে একটা ধাতব আওয়াজ পাচ্ছ না? ঘণ্টা বাজবার মত?"...

"আপনি বলে দিলেন বলে, মনে হচ্ছে যেন সেইরকম সেইরকম লাগছে।"

হো হো করে হেসে ফেটে পড়লেন তিনি। বুঝতে পেরেছেন যে আমি তাঁর মন জুগিয়ে কথা বলছি।

আমি অবাক হয়ে যাই বিশ্বাসজীর রকম-সকম দেখে। ভাবালুতা যে চিরকাল তাঁর দুচক্ষের বিষ।

এর বছর দেড়েক পরের আর একটা ঘটনা বলি। যুক্তির কষ্টি-পাথরে যাচাই না করে বিশ্বাসজী কোন বিষয়কে স্বীকৃতি দিতেন না। কেমন ভাবে হোমিওপ্যাথি ওষুধে কাজ করে, সে সম্বন্ধে মনে বসবার মত বৈজ্ঞানিক যুক্তি না পাওয়ায়, তিনি ওই শাস্ত্রটাতেই অবিশ্বাস করতেন। এহেন বিশ্বাসজীর মধ্যে যুক্তিহীন ভাবালুতা দেখলে বিস্মিত হবারই কথা। আমি ভোবে উঠে চলে আসবো, উনি আটকালেন।

"তোমরা হলে কাজের মানুষ, আমার মত তো নও। কিন্তু দু-তিন ঘণ্টা আরও থাকলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। সাড়ে দশটার সময় তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।"

তাঁর বাগানের পাঁচিলের একদিকে রেণুদিদের বাড়ি থেকে আসা-যাওয়া করবার জন্য একটা ছোট দরজা আছে। তারই পাশে একটা ভাল জাতের পাতাবাহারের গাছ। সাড়ে দশটার সময় তাঁর বারান্দা থেকে সেই গাছটাকে দেখালেন। তখন শীতকাল। গাছটার উপর এতক্ষণ রেণুদিদের বাড়ির ছায়া পড়ছিল। এই প্রথম শীতের সকালের রোদ লাগল, ছায়া সরে গিয়ে। আধভেজা লাল লাল পাতাগুলো স্নিগ্ধ রোদের ঝলক মেখে ঝলমল করে উঠল। এমন একটা কিছু দ্রষ্টব্য ব্যাপার নয়, উনি না বললে নজরেও পড়ত না।

"আমি রোজ দেখি। অপেক্ষা করে থাকি এই সময়টার।" মুখচোখ দেখেই বোঝা গেল যে তাঁর অনাবিল আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে কোনরকম ভেজাল নাই। আমারও দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে, এই কথাটা তাঁকে জানাবার পরও অভ্যাসবশে আমি বলি—"যে গাছের পাতা বেশ

ভেলা, তার উপর আলো পড়লে ঠিকরে পড়ে। দেখেন না নারকোল পাতার উপর চাঁদের আলো ঝিকমিক করে, অথচ তালগাছের উপর সেরকম হয় না?"

চিরকাল দেখে এসেছিলাম যে কোন ঘটনার যুক্তিসঙ্গত একটা ব্যাখ্যা পেলেই তাঁর তৃপ্তি হ'ত; কারও অন্যায় আচরণের বোঝবার মত কারণ খুঁজে পেলেই তাঁর মেজাজ নরম হয়ে আসত। এখন দেখলাম, চিকন পাতার উপর রোদের খেলার ব্যাখ্যাটা তাঁর বিশেষ মনঃপুত হল না। বললেন, "এই সময়গুলোই আসল, বুঝলে। অথচ বিজ্ঞানে বলে যে আলোর চেয়ে তাড়াতাড়ি যদি তুমি যেতে পার, তাহলে সময়ই থাকবে না। যদি সময় বলে জিনিসটাই না থাকে, তবে আনন্দ পাবার সময়গুলো কি থাকবে? এই আনন্দের ঝলক লাগার মুহূর্তগুলোতে কি যে হয় ভেবে পাই না। যদি এগুলোকে টেনে লম্বা করা যেত তাহলে বড় মজা হ'ত, না?....."

কোনদিন ভাবিনি যে এই ধরনের কথা তাঁর মুখে শুনব। লক্ষ্য করি যে, রাজনীতির কথা পাড়লে, সে গল্প এড়িয়ে যেতে চান তিনি আজকাল।

এর মাস ছয়েক পর আবার একবার গিয়েছি তাঁর ওখানে। বাগানে বসে গল্প হচ্ছে। নিরাপদবাবুর গাড়ি এসে থামল। বৃদ্ধ নিরাপদবাবু লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে এলেন আমাদের কাছে। উপদেশ দেওয়া তাঁর বাতিক। বিশ্বাসজীর মত শক্ত সমর্থ লোক এমনভাবে বসে বসে সময় কাটাবে, এ জিনিস নিরাপদবাবুর পক্ষে সহ্য করা কঠিন।

"বসেই তো আছ, বললাম গরীবদের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দাও। তাতে বললে যে তোমার হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস নেই। বললাম গুটিপোকার চাষ কর। তাতে জবাব দিলে যে ভেরেণ্ডার গাছ পুঁতলে তোমার বাগানের শোভা নষ্ট হয়ে যাবে। এত যে বসে বসে বই পড, পাড়ার যে সব ছেলেরা বাড়িতে মাস্টার রাখতে পারে না, তাদের একটু পড়াশোনা দেখিয়ে দিলেই তো পার সকালে বিকালে।"

বিশ্বাসজী হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন—"সকালে বিকালে আমার সময় কই?"

নিরাপদবাবুর মত কাটখোট্টা লোকও জবাব শুনে না হেসে থাকতে পারলেন না। তিনি চলে গেলে আমি বিশ্বাসজীকে বলি—"যখন প্রথম বাড়িতে চলে আসেন, তখন আমারও দুর্ভাবনা হয়েছিল যে, কাজ ছেড়ে দিয়ে থাকবেন কি করে আপনি। এখন দেখছি যে, বেশ দিব্যি আছেন আপনি।"

"আরে দূর! তুমিও যেমন!"

আর কিছু বলেননি। তবে এখানকার জীবন যে তাঁর মনের মত হচ্ছে না, এর আভাস ওই ছোট কথাটা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

এর পরের মাসেই তিনি দেশভ্রমণে বেরিয়ে যান। বেশ কিছুকাল তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান, নামকরা দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখবার জন্য। এর থেকেই আমার অনুমান যে বাড়িতে তিন বছর থেকেও তাঁর মনের অস্থিরতা কমেনি। যার চিরকালের আগ্রহ সব জিনিস জানবার ও বোঝবার, তার কি কখনও এত তাবালুতা ধাতস্থ হয়!

বিশ্বাসজীর এই প্রথমবারের দেশভ্রমণের সময় থেকেই আমাদের আসল কাহিনীর আরম্ভ। তাঁর মুখে শোনা। বাইরের জিনিসের সঙ্গে দর্শকের মনটা না মিললে, ঘটনা হয় না। সেই জন্য বিশ্বাসজীর নিজ মুখে বলা ঘটনাগুলো বলবার আগে তাঁর মনের বিবরণটা খুঁটিয়ে দিয়ে দিলাম। তাঁর মুখ থেকে যা শুনেছিলাম তা আমি পরের অধ্যায়ে দিচ্ছি। মূল ঘটনাগুলোকে প্রায় অবিকৃত রেখেছি। যেখানে যেখানে সামান্য একটু রঙ ফলানো আছে, সেগুলোকে পাঠকরা ধরতে পারবেন অনায়াসে। সমস্ত কথা তিনি একদিনে বলেন নি। আর বলবার সময় আমি লিখেও রাখিনি। অনেকদিন পরে লেখা। কত কথা ভুলে গিয়ে থাকব। আরও কত কথা শোনবার সময় বেশ চমকপ্রদ লেগেছিল, কিন্তু বর্তমান বিষয়ের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় সেগুলোকে বাদ দিলাম। তাঁর বলা মুহূর্তগুলির নাটকীয়তাটুকু কিন্তু পাঠকরা যেন আমার অলঙ্করণের ফল ব'লে ভুল না করেন। ওগুলো সম্পূর্ণ বিশ্বাসজীর। তিনি বলতেন যে যে কোন মুহূর্তকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে খানিকটা নাটকীয়তা আসতে বাধ্য তার মধ্যে।

বিশ্বাসজীর কথা

কত মন, কত জগৎ, কত কিছু, জানা অজানা; সম্মুখের, আড়ালের। জানাটুকুকে নিয়ে থাকতে পারলেই ছিল ভাল। কিন্তু তা কি হ'বার জো আছে। আড়াল থেকে খুনসুড়ি এসেই যে সব গণ্ডগোল করে দিল। আসবে, আব একটু বয়স হোক, অভিজ্ঞতা বাড়ুক, সবজান্তা ভাবটা একটু কমুক, তোমাদেরও জ্বালাতন করতে আসবে সে সব বোবা জিনিসে। আমিই কি ছাই তোমাদেব চেয়ে অন্য রকমেব লোক। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুল, তাব আমি কি কবি। চিবকাল ভাবতাম যে সত্যিকাবেব বাঁচা মানেই ভাবা, ভেবে ভালমন্দ বাছা, আর শত বাধা সত্ত্বেও সেই অনুসায়ী কাজ কবা। অনেকগুলো সম্ভাব্য আচবণ যেন মানুষের সম্মুখে ছিটনো বয়েছে, চরম মুহূর্তে তাব মধ্যে থেকে বাছা-বাছিতেই মানুষেব আসল পবিচয়। কী না পারে মানুষে। শাশুড়ী স্বর্গে যাবাব সময়ের বেণুব মুখখান জলজ্বল করত আমাব চোখেব সম্মুখে। আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম কি না বেণুকে। ওব বাবা তখন এখানে নাই। 'টুর'এ গিয়েছেন। আমি সেদিন বাড়ি এসেছি। হঠাৎ টেলিগ্রাম এল জামাইএর। সেই দিনই যেতে হবে। কে নিয়ে যায়। লোক কই। বউদি ভেবে আকুল। ঝোলে ঝালে অম্বলে যেখানে দবকাব পড়ে, সেখান-কাব জন্যই আছে, দাড়িওলা-মহাত্মা। হাতেব মধ্যে এক শুধু আছে সে। তবে তাকেই ডেকে পাঠাই? তুমি ববঞ্চ ঠাকুবপো, যার ওখানে সে কাজ কবে তাকে বলে ওব দিন দু'তিনেব ছুটি কবিয়ে দাও। দাড়িওলা-মহাত্মাব সঙ্গে যেতে বেণুব আপত্তি। কেন বে? ও তো ঘরের-ছেলেব মত—ওব সঙ্গে গেলে কি. হয়েছে? রেণু কিছুতেই বলবে না। অনেক পীড়াপীড়িতে জানা গেল, বাইরের লোকের সঙ্গে যাওয়া ওরা পছন্দ

করে না।……ওরাটা কে? তোর শাশুড়ী তো শয্যাগত। তবে কি জামাই? মণি!…রেণু চুপ করে থাকে। কত দিনই বা বিয়ে হয়েছে—এরই মধ্যে স্বামীর মন চিনে গিয়েছে—মেয়ে মানুষের এ সব বুঝতে দেরী হয় না। বউদি তো রেগে আগুন।…কত রকমেরই যে লোক আছে এ সংসারে। এখন কি এত বাছবিচার করবার সময়। এত যাদের বাছবিচার তারা এসে নিয়ে গেল না কেন? এখন লোক কি আমি তয়ের করব নাকি?… . . .

আমি তখন কাজের মানুষ, একদিনের জন্য এসেছি, আমাকে বলতে সাহস পাচ্ছিলেন না বউদি। শেষ পর্যন্ত আমাকেই যেতে হল সব কাজ ফেলে রেণুকে নিয়ে। বহুকাল পরে রেণুর কাছ থেকে শুনেছিলাম যে আমার সঙ্গে যাওয়াও মণি পছন্দ করে নি, অবশ্য মুখ ফুটে কিছু বলেনি, কিন্তু রেণুর ধারণা তাই। অদ্ভুত স্বভাব জামাইটার। কি যে বিয়ে ঠিক করেছিল রেণুর পিসি কমলাদি। কমলাদিরই বা দোষ কী? বিয়ে ঠিক করেছিল সে, রেণুর শাশুড়ীকে দেখে। খুব মাখামাখি কিনা ওদের সঙ্গে। রেণুর শাশুড়ীর মত লোক যে হয় না।

* * *

অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব ঠিক চলছে, শুধু হাবুর মায়ের সময় শেষ হয়ে এল। কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মধ্যে মধ্যে একটু আবলোর ভাব এলেও জ্ঞান আছে। ডাক্তার জবাব দিয়েছে।

দশজনে বলছে হাবুর মা স্বর্গে যাচ্ছেন, কিন্তু দশে যা বলে তার সবটাই সত্যি নয়। স্বর্গে কি নরকে, তার এখনও ঠিক নাই। সেটা ঠিক হয় শেষ মুহূর্তে। তাই না লোকে শেষ-মুহূর্তে ভগবানের নাম শোনায়।

ভদ্রমহিলা মরতে চান না। তবু তাঁকে যেতেই হবে। ডাক এলেই কি লোকে হুট করে চলে যেতে পারে। তা হলে তো ভাবনাই ছিল না। তিনি যে হাবুর মা। অন্য কারও মা হলেও বা কথা ছিল। তাঁর আরও দুই ছেলে আছে—কই তাদের সঙ্গে তো তাঁর নাম এমন ভাবে জড়িয়ে শক্ত করে গিঁঠ দেওয়া নয়! পাড়ার লোকে কখন ভুলেও তাঁকে মণির মা বা পটলার মা বলে না। বলতেও তো পারত! সেই হাবু হ'বার সময় থেকে তিনি যে বাঁধা পড়ে গিয়েছেন ওই নামটার সঙ্গে, আর এই সংসারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে। সেই জন্যই না আজ তাঁর যাবার পথে এত বাধা।···সংসার মানে, এই ছোট্ট ভাড়াবাড়ি—পায়রাখুপীর মত দুখানি ঘর—নামমাত্র বারান্দা আর একফালি উঠন। এরই সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা তিনি। কাশী নবদ্বীপ কেন, কোন যাগেযোগে গঙ্গাস্নানটা পর্যন্ত ঘটে ওঠেনি জীবনে। বাড়ি ছেড়ে তাঁর যে একদিনের জন্যও বাইরে যাবার উপায় ছিল না। হাবুর জন্য। ওই তো ছেলে! ওই ছেলে হ'বার পর রেণুর শ্বশুর যে ক'বছর বেঁচে ছিলেন, তিনিও কখন শহর ছেড়ে বাইরে যাননি, স্ত্রীর কথা মনে করেই। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে এ নিয়ে একটাও কথা হয়নি কোনদিন। হাবুকে ঘিরে একটা অব্যক্ত সহানুভূতি গড়ে উঠেছিল, উভয়ের প্রতি উভয়ের। একটু যেন দোষী দোষী ভাব দুজনেরই; কারও দোষ নাই, তবুও। ভগবানকে পর্যন্ত দোষ দেননি তাঁরা; শুধু কপালের লেখা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। স্বীকার না করে উপায় কী ছিল।

রেণুর শাশুড়ী মানুষটি ছিলেন অতি ধীর, শান্ত স্বভাবের। বুকের কথা কোনদিন মুখে প্রকাশ পায়নি তাঁর। স্বামী মারা যাবার দিনে পর্যন্ত নিজের কপালের উপর অভিযোগ জানাননি ভগবানের কাছে। সংসারে যা-কিছু সব মাথা পেতে নিয়েছিলেন। অভিযোগ করবে কার উপর? কার কাছে?···মা ভেঙে পড়লে নাবালক ছেলেরা যে ভেসে যাবে! বড়ছেলের কথা বাদ দাও; মেজছেলে মণি যে তখন মোটে চার বছরের! এতদিন তিনি ছিলেন ছেলেদের মা, ওদের বাবা চলে যাবার মুহূর্ত থেকে তিনি যে ওদের মা-বাবা দুইই। তাঁরই উপর যে ভার পড়েছে সংসারের ঝড়ঝাপটা

থেকে—এই অপোগণ্ড তিনটিকে আড়াল করে দাঁড়াবার। হাবুটা না হয় কোনদিন মানুষ হবে না; ওর কপালে যা লেখা আছে তাই হবে; কিন্তু বাকি দুটোকে তো মানুষ করে তুলতে হবে। এত বড় দায়িত্ব যার মাথায়, তার কি অস্থির হয়ে পড়লে চলে?······

- বিপদ-আপদের মধ্যেও তাঁর এই শান্ত আত্ম-প্রত্যয় চিরদিন পাড়ার লোকদের মুগ্ধ করেছে। কথায় কথায় লোকে তাঁর দৃষ্টান্ত দেখায়। সকলেই তাঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। পাড়ায় যার বাড়িতে যখন দরকার পড়েছে, হাবুর মা গিয়ে দাঁড়িয়েছেন সেখানে—না ডাকতেই। পুজাপার্বণে, আঁতুড়ে, ভোজেকাজে, হাবুর মাকে না হলে চলত না। কাজে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। নিখুঁতভাবে কাজ করতেন তিনি নীরবে—ঠিক যেখানে যেটি যেমন হলে ভাল হয় তেমনি করে—অথচ এর মধ্যেও সব সময় নিজেকে একটু আড়ালে রেখে রেখে। কাজের বাড়িতে তাঁর হাঁকডাক কেউ কোনদিন শুনতে পায়নি। কারও সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়নি কোনদিন।

······হাবুর মায়ের মত লোক যে সাতজন্ম মাথা খুঁড়লেও পাড়ায় আর একটা হবে না! অমন একটা মানুষ চলে যাচ্ছে! সাধে কি আর পাড়ার মেয়েরা আজ কাজকর্ম ছেড়ে হাবুর মায়ের বাড়িতে এসে রয়েছেন। পালা করে রাত জেগে তাঁরা গত তিনদিন থেকে রুগীর শুশ্রূষা করছেন।···থাকলই বা ছেলেরা—মেয়েমানুষের ব্যামোর সময় দেখাশোনা কখনও কি বেটা-ছেলেদের দিয়ে হয়? আছে তো কত রকমের কত কিছুর দরকার। আর ছেলের মধ্যে বড়ছেলের কথা বাদই দাও—প্রথম বাড়াবাড়ির দিন ছিল শুধু পটলা—মণিকে তো পরের দিন মধুগঞ্জ থেকে টেলিগ্রাম করে আনান হল।·· ···

হাবুর মা কিন্তু একবারও ভাবেননি যে, তিনি সময়ে অসময়ে পাড়ার লোকদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন ব'লে, আজ তারই প্রতিদানে সকলে তাঁর শুশ্রূষা করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন।·· না, তা' কেন হ'তে যাবে। প্রতি-বেশীরা যে চিরকাল তাঁকে ভালবাসে—সেই যবে থেকে তিনি এখানে ছোট্ট বউটি এসেছিলেন। পাড়ার লোকেরাই তো তাঁর মনের বল। এঁদেরই মুখ চেয়ে

তিনি, এই অপোগণ্ড তিনটিকে নিয়ে বিধবা হবার পর এখান থেকে নড়েননি, অন্য কোথাও যাবার নাম করেন নি। সে বিপদের সময়, কই তাঁর বাপের বাড়ির বা শ্বশুরবাড়ির কেউ তো তাঁকে দেখতে আসেনি, নিতে আসেনি। তখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল প্রতিবেশীরাই। মাসে মাসে চাঁদা তুলে তাঁকে অর্থসাহায্য করেছে, চ্যারিটি থিয়েটার করিয়েছে, সেবাসমিতি থেকে মুষ্টি-ভিক্ষার চাল দিয়েছে। তাঁর সেলাইকরা কাঁথা পাড়ার মেয়েরা কিনেছেন। তাঁর তয়েরকরা আচার আমসত্ত বড়ি পাড়ার ছেলেরা বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে। ছেলেদের স্কুলে 'ফ্রী' করাতে হবে, ক্লাসে পড়বার বই যোগাড় করতে হবে, ওষুধ-পথ্য কিনতে হবে, সব করেছে পাড়ার দশজনে। জন্ম জন্ম ঋণী তিনি পাড়ার লোকের কাছে। এঁরা না থাকলে তিনি ভেসে যেতেন। মণির আদালতের চাকরিটা পাড়ার অপূর্ববাবুই জজসাহেবকে ধরে করিয়ে দিয়েছিলেন। এই সেদিনও পটলা যে মিউনিসিপ্যালিটি-অফিসের চাকরিটা পেল, সে কি পাড়ার দশজনে গিয়ে উপরে ধরাধরি না করলে হ'ত? সবচেয়ে বড় কথা পাড়ার লোকে হাবুকে অবজ্ঞা করেনি কোনদিন। ওই তো ছেলে! নিজের বাড়িতে ও জিনিস হ'লে যেমন করত তেমনি করেছে। ঠিক আপন-জনের মত। এ ঋণ কি কোন দিন শোধ হবার! টাকা-পয়সার ঋণ নয় যে সুদিন এলে শোধ দিয়ে দেবে!...

রুগীর ঘরখানা ছোট। একসঙ্গে তিনচার জনের বেশী লোক আঁটে না। সেইজন্য মেয়েরা সবাই সম্মুখের বারান্দায় ঠেসাঠেসি করে বসেছেন। পুরুষরা বসেছেন পাশের ঘরে। রুগীর ঘরে মণি, পটলা ছাড়া আরও দুই-একজন সব সময়ই আছেন। ঘরের মধ্যে সকলেই চুপচাপ। শুধু একখানা হাত-পাখা চালানর শব্দ। এখানকার মন-চাউনির রাজ্যে অপরের মন বুঝতে হয় চাউনির মধ্যে দিয়ে; কথা বলা অপরিহার্য হলে বলতে হয় যতদূর সম্ভব ইশারায়, চলতে হলে হাঁটতে হয় নিঃশব্দে; গঙ্গাজল-ভরা পাথরবাটিটা সরিয়ে রাখবার সময় অন্যমনস্কতায় একটু শব্দ হলে অপ্রস্তুত হয়ে যেতে হয়। মুমূর্ষুর যতগুলি বিশেষ-অধিকার আছে তার মধ্যে এটা একটা। চেঁচিয়ে কাঁদবার আর কথা বলবার সময় তো পড়েই রয়েছে! তা'ছাড়া যে রুগীর কথা

বন্ধ হয়ে গিয়েছে, অথচ জ্ঞান আছে তার ঘরে শব্দ বেমানান, কথাবার্তা এক ধরনের রূঢ়তা। একমাত্র ছাড়পত্র পাওয়া পাখার শব্দটা কানে সয়ে গিয়েছে একঘেয়েমির জন্ত। এখানকার চার-দেয়ালে-ঘেরা বিষাদ-ভরা জগৎটুকু থমথম করছে আসন্নের আশঙ্কায়।

বারান্দায় কথা বলা চলে, কিন্তু ফিসফিস করে। নইলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটে কি করে? সব কথার কেন্দ্র জুড়ে রয়েছেন হাবুর মা। হ'ক একই গল্পের পুনরাবৃত্তি—তবু তাঁরা আজ অন্ত কোন অবান্তর প্রসঙ্গের মালিন্ত টেনে আনতে চান না, এখানকার বিষাদপূত পরিবেশে।

"যাক, ছেলেরা তবু এসময় কাছে থাকতে পেরেছে!"

"হ্যাঁ, ওই ছেলেদের জন্যই তিল তিল করে দেহপাত করে গেল হাবুর মা—সারাটা জীবন।"

"মণিটাকে যে অফিস থেকে ছুটি দিয়েছে সেই ঢের।"

"মা বলতে পাগল। অমন মা! কি কষ্ট করেই মানুষ করেছে! ওই টেলিগ্রাম পাবার পর ছুটি না পেলে, চাকরিতে ইস্তফা দিয়েই চলে আসত না! চিনি তো ওদের!"

"গবরমেণ্টও তো মানুষ! মা মরণাপন্ন—ছুটি দেবে না?"

"না না; সেই কথাই বলছি।"

"পরশু, এখানে আসবার পর থেকে সেই যে মায়ের শিয়রে বসেছে, এখন পর্যন্ত একবারও নড়েনি বললেই হয়। আহার নেই, নিদ্রা নেই, চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। আমি বলি—তুই হলি বেটাছেলে—তুইই একরকম বলতে গেলে মায়ের বড় ছেলে—তুই এত ভেঙে পড়লে কি চলে? তোর চোখে জল দেখলে মায়ের দুঃখ হবে না? রুগী ব'লে নিজের রোগের ব্যথা বিষে কাতর; তোরা এখন এত অবুঝ হলে কি চলে?"

"পটলাটা সে হিসাবে শক্ত আছে।"

"এখন বউমা এসে পৌছলে হয়!"

"হ্যাঁ। সময় থাকতে থাকতে। তা হলে শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা হয়। সাতজন্ম তপস্তা করলেও এমন শাশুড়ী কোন বউ পাবে না কোনকালে।"

"গাড়ি কখন? সাড়ে বারোটায় না?"

"হ্যাঁ। আর ধরগে স্টেশন থেকে বাড়ি আসতে আধঘণ্টা। একটা নাগাত পৌঁছে যাবে বাড়িতে। এখন ভগবানের দয়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত ."

"সেই তো হচ্ছে কথা। ধুকধুক করছে। আমি তো কর্তাকে বলে দিয়েছি গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যেতে।"

"তা হলে তো আরও আগেই আসবে। খুব ভাল করেছ। বাড়িতে গাড়ি থাকতেও যদি পাড়ার লোকের বিপদ আপদের সময় কাজে না লাগে, তবে অমন গাড়ি রেখে লাভ? বাপের বাড়ির কার না কার সঙ্গে আসছে—নতুন জায়গা—সে আবার পথঘাট চিনবে কি না চিনবে—অনর্থক দেরী হ'ত—ভালই করেছ গাড়ি পাঠিয়ে।"

"তা ছাড়া বউমার এই অবস্থায় ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে না চড়াই ভাল। যা রাস্তা এখানকার।"

"ক' মাস হল?"

"দেরী আছে এখনও, সবে সাতমাস চলছে।"

"মধুগঞ্জ থেকে ছেলে হবার জন্য বাপের বাড়ি গিয়েছিল কবে যেন?'

"এই তো দুমাস আগে। তখন যদি জানে যে শাশুড়ীর শরীরের এই অবস্থা, তা হলে কি আর এখানে দেখা না করে অমন বাইরে বাইরে বাপের বাড়ি চলে যায়।"

"অত সাধ করে ছেলের বিয়ে দিল—নাতির মুখ দেখা আর বুঝি হল না হাবুর মায়ের।"

"যাক, নিজের চোখে তো দেখে গেল যে ছেলেদুটো মানুষ হয়েছে। বড ছেলের কথা বাদ দাও।"

'বড় ছেলেব কথা বাদ দাও'—এই কথাটা অতর্কিতে বেরিয়ে আসে সকলের গল্পেব ফাঁকে ফাঁকে। কথাব মাত্রা যেন। কেবল ওই বাদ পড়ার শূন্যর অঙ্কটা ছাড়া বড ছেলে যেন আর কোন হিসাবের মধ্যেই পড়ে না। পাড়ার ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তাকে ধর্তব্যের মধ্যে গণে না। হাবুদা যেন একটা জিনিস, মানুষ নয়। আছে তো আছে। ওর সম্মুখে ছেলেমেয়ে

সিগারেট খেতে সঙ্কোচ নাই; মেয়েদের গায়ের আঁচল খসে পড়লে লজ্জা নাই।

এতগুলি লোক, প্রত্যেকেই চান আজকের মত দিনে, এদের সংসারের কোন কাজ করে দিতে। নইলে ঠায় এসে বসে থাকা—কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করে। কিন্তু এত লোকের কাজ কোথায়? অথচ হাবুর মাকে এই অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়াও যায় না। মাঝে মাঝে তাই এঁদের দুই-একজন ঘরে ঢুকছেন রোগিণীকে দেখতে। কিন্তু ছেলেরা রুগীর ঘরে ভিড় করা পছন্দ করে না। মণি মুখ ফুটে বলে না, কিন্তু পটলা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারণ করে সকলকে ঘরের মধ্যে ভিড় জমাতে। সে বারণ গায়ে না মেখে তবু দু-একজন মহিলা থেকে যান ভিতরে।

ছেলেরা এই সময়টুকু একান্তে মাকে পেতে চায়—নিজেদের মত করে—শুধু নিজেদের মধ্যে নিভৃতে—বাইরের লোক যেন কেউ না থাকে সেখানে! কত কথা বলবার আছে মণির—কত কথা শোনার আছে—সময় পেল কই—সব যে বাকি থেকে গেল—নাইবা মা বলতে পারলেন কথা—তাঁর চোখের ভাষা যে ছেলেরা বোঝে—মাও যে চোখের দিকে তাকালেই তাদের মন বুঝে যান।.........

এই তো ফোঁটা ফোঁটা গঙ্গাজল দিয়ে মায়ের ঠোঁট ভিজিয়ে দিচ্ছে মণি; আর কত কথা খেলে যাচ্ছে দুজনের চোখে চোখে। কত প্রশ্ন, কত উত্তর।

"মা তোমার কষ্ট হচ্ছে?"

"না তো।"

"না, বলো। তুমি বলছ না। পিঠে লাগছে? অনেকক্ষণ চিত হয়ে শুয়ে রয়েছ। পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিই?"

"না।"

"কেন?"

"তা হলে যে তোদের মুখ দেখা যায় না।"

"কি কষ্ট হচ্ছে, বলো!"

"তুই এলি বাড়িতে, আর আমি পড়ে থাকলাম বিছানায়। এ কি ভাল লাগে!"

"তাই বলে কি কারও অসুখ-বিসুখ হতে নেই।"

"না না, তাই বলছি। আমার মত লোকের কি অসুখ হয়ে পড়ে থাকলে চলে? আমার যে নানান লেঠা।"

শেষের কথাটি দুজনেরই মনের সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গাটার খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছে। এই জায়গাটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারলে ছিল ভাল। মায়ের মত চাপা লোক এই কথাটার মধ্যে দিয়ে অজ্ঞাতে নিজেকে একটু ব্যক্ত করে ফেলেছেন। মা চেষ্টা করেও বুঝতে পারলেন না, মণির মুখখান হঠাৎ অমন হয়ে গেল কেন—একটু যেন কিন্তু-কিন্তু ভাব—কিছু কি বলে ফেললেন তিনি?

"না মা, অত ভেবো না তুমি। অসুখ হয়েছে—দুদিন পরে আবার সেরে যাবে।"

মণি জানে যে একথা মিথ্যা। ডাক্তারবাবু পরিষ্কার বলে দিয়েছেন। মায়ের কাছে তারা কোনদিন মিথ্যা কথা বলে না। কিন্তু আজ—এই শেষমুহূর্তে মিছে কথা না বলে কোন উপায় নেই! মা যে বাঁচতে চান। যে মা জীবনে কোনদিন অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাননি, তিনি যে এবার ডাক্তার বাবুর ইনজেকশন পর্যন্ত নিয়েছেন। মৃত্যুকে ভয় করেন না, তবু বাঁচতে চান।·· হ'ক মিথ্যা—এই মিথ্যা আশ্বাসে যদি একটু মনে জোর পান—যদি তাঁর একটু দুশ্চিন্তা কাটে—যদি একটু শান্তি পান এই শেষ সময়ে।··· তাছাড়া ডাক্তারদেরও তো কত সময় ভুল হয়। কতটুকু জানে ডাক্তার? ডাক্তারের জবাব-দেওয়া কত রুগীও তো আবার সেরে ওঠে পরমায়ু থাকলে।······

ছেলের চোখমুখে মা সত্যি কথা খুঁজলেন।

"হ্যাঁরে মণি, সত্যি আমি সেরে উঠব তো? মিছে বুঝ দিচ্ছিস না তো আমাকে? সত্যি যদি, তবে তোর মুখচোখের ভাব এমন কেন? এত তোদের চিন্তা কেন? কেন তোকে টেলিগ্রাম করে আনানো হল? এজ্জ

পাড়ার লোক আমায় দেখতে আসছে কেন? কেন সবাই এত চুপচাপ? পাড়ার কত লোকের বাড়ির রোগভোগে কত সেবাশুশ্রূষা করেছি—জানি তো সব। বয়স তো কম হল না। ডাক্তারবাবু কেন আর ইনজেকশন দিতে আসছেন না, সে কথা আমি বুঝছি না ভাবছিস? কবিরাজমশাই নাড়ি দেখে যা বলে গেলেন তা তোরা আমার কাছে লুকোলি, সেকথা কি আর আমি বুঝিনি? কিন্তু আমার যে মরলে চলবে না। কতটুকু কি পেয়েছি জীবনে; তবু যে আমাকে বাঁচতেই হবে।"

"বুঝেছি; সব বুঝেছি মা! আর বলতে হবে না! অমন করে করে আর তুমি আমার কাছে ওকথা বল না!"

কত কথা মাকে বলতে ইচ্ছা করছে—চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করছে—চেঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে ইচ্ছা করছে! চোখের ভাষায় যে সব বলা যায় না—সবটুকু যে বুঝনো যায় না—বলেও যে খানিকটা বাকি থেকে যায়—বেশীর ভাগটুকুই যে বাকি থেকে যায়! চোখের কথায় বুকের ভার যে হালকা হয় না।···মায়ের না হয় কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তার তো কথা বন্ধ হয়নি! মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে সব কথা বলতে ইচ্ছা করছে—একবছরের জমানো সব মনের কথাগুলো। মা কোনদিন জিজ্ঞাসা করেননি তবু যে তাঁকে বলতে হবে। সব কথা কি বলা যায়? সব রকমের কথা কি মায়ের কাছে বলা যায়! তবু যে তাকে বলতে হবে। বাইরের লোকজনের সম্মুখে সেসব বাড়ির-কথা বলা যায় কখনও? কিন্তু এরা যে কিছুতেই ঘর থেকে যাবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে! পালা করে ঘাঁটি আগলাচ্ছে! এরা যে মা-ছেলেকে একদণ্ডও নিরিবিলিতে কথা বলতে দেবে না! ভাবছে খুব কর্তব্য করছে, খুব দরদ দেখাচ্ছে! কিছু বোঝে না বাইরের লোকে! কিছুতেই বুঝবে না!······

"ওকি মণি, তোর চোখের কোণে জল এসে গেল কেনরে? মুছে ফেলে ভাবলি বুঝি আমি দেখতে পেলাম না? কী আবার আমি বললাম। তোকে কিছু বলিনি তো। মিছামিছি মন খারাপ করিস না। তোকে বলব—আমি! তোকে ভুল বুঝব—আমি! কী যে ভাবিস! তোর মনের

কথা যে আমি বুকের মধ্যে শুনতে পাই। তোকে আমি একদিনের জন্যও দোষ দিইনি। শুধু তোকে কেন, আমি অন্য কাউকে দোষ দিইনি। তুই তাই ভেবে নিয়েছিস বুঝি? দেখ একবার বোকা ছেলের কাণ্ড।"

এইখানেই মণির দুঃখ সবচেয়ে বেশী। সত্যিকারের দোষ করে থাকলে সে মায়ের কাছে স্বীকার করে ক্ষমা চাইত নিশ্চয়ই। ঠিক দোষ বলা চলে না। তার দোষ নেই; রেণুরও কোন দোষ নেই। দাদা তো দোষগুণের বাইরে; কারও দোষ নেই। তবু কেন এমন হয়? কেন এমন ভাবে জট পাকিয়ে যায় সব? দু বছর আগে, সে কি কখন ভাবতে পারত এ কথা। না তার মা-ই ভাবতে পারতেন। তবু দাঁড়িয়ে গেল এইরকম। উপায় ছিল না। সকলে হয়তো ভেবেছিল যে রেণু সাতখান করে লাগিয়েছে কথাটা তার কাছে। ভুল সে ধারণা। রেণু কিছু বলেনি। শুধু তার চোখে ফুটে উঠেছিল ভয়। সর্বক্ষণ একটা আতঙ্কের ছায়া লেগে থাকত তার চোখমুখে, সেই দিনের পর থেকে। ঘৃণা, বিদ্বেষ, বিদ্রূপ বা তাচ্ছিল্যের লেশমাত্র যদি রেণুর হাবভাবে মুহূর্তের জন্য প্রকাশ পেত, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যেত। সে তো সেরকম মেয়ে নয়; কিন্তু আতঙ্কের উপর তো কোন কথা খাটে না। ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর কি কখন ভয় পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে? রেণুর মত নরম স্বভাবের মেয়েরা জানে যে, এ বিষয় নিয়ে কারও কাছে কোন কথা বলা মানেই রূঢ়তা প্রকাশ করা। কেউ বুঝে-সুঝে অন্যায় করলে তবে না তার উপর বিরক্ত হওয়া যায়। সে এ নিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেও হয়তো রেণু কোন জবাব দিত না। সে জিজ্ঞাসাও করেনি। মা, পটলা, রেণু কারও সঙ্গে তার কথা হয়নি এ সম্বন্ধে। এ পরিবারের পাঁচজন লোকের মধ্যে একজনকে তো বাদই দাও—বাকি চারজনের কেউ কারও সঙ্গে সেদিনকার ঘটনাটা সম্বন্ধে কথা বলেনি। বলা যায় না। দরকার মনে করলেও বলা যায় না।

অতি তুচ্ছ ঘটনা। তবু কি করে যেন গুরুত্ব পেয়ে গেল সকলের কাছে। কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া গেল না, কিছু নয় বলে।

মণি নিজেই কি নিজের বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে যে সে ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে পেরেছিল? নিজের কাছে করা এই প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যেতে চায় সে। মনকে ফাঁকি দিতে চায় রেণুর কথা তুলে। নইলে যে নিজের কাছে ছোট হয়ে যেতে হয়। অথচ রেণুর ভয় পাবার কথাটা মণির মনগড়া নয়। সত্যি। বলে বোঝাতে হবে কেন; তার ত্রস্ত চাউনি কি দেওরের নজরে পড়েনি? মুখ ফুটে না বলুক সে যে পায়ের শব্দে ভয়ে চমকে ওঠে, এ জিনিস কি শাশুড়ী লক্ষ্য করেন নি? সকলেই বুঝেছিল। ঠিকই বুঝেছিল। শাশুড়ী, দেওর, স্বামী, সকলেরই একটা কুণ্ঠা এসে গিয়েছিল নতুন বউয়ের কাছে। কিছুই নয় ব্যাপারটা—তবুও। সেইদিন থেকে এ পরিবারের প্রত্যেকের নিজেকে ছোট ছোট লাগে, পরের বাড়ির ওই মেয়েটির সম্মুখে। অথচ প্রত্যেকেই জানে যে রেণুর সাদা মনে সংকীর্ণতার লেশমাত্র নাই—সে পরকে আপন করে নিতে জানে—নিজেকে সব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে—এখানে আসবার দিন থেকেই সে মনে প্রাণে এই সংসারের একজন হয়ে গিয়েছে। তবু কেন এমন হল? গত কয়মাস থেকে মণি নিজেকে প্রশ্ন করতে, নিজেকে বিচার করে দেখতে বাধ্য হয়েছে—চেষ্টা করেও এড়াতে পারেনি। তার মধুগঞ্জে চলে যাওয়া শুধু কি রেণুর ওই ভয়বিহ্বল চাউনি দেখে?—তার মধ্যে আরও অন্য কিছু জড়ানো ছিল না কী? শুধু কি স্ত্রীর দুঃসহ মানসিক অবস্থা দেখে দরদ?—তার নিভৃত মনের একান্ত ব্যক্তিগত অন্য কোন ভাব তার সঙ্গে মিশানো ছিল না কী? নিজের কাছে স্বীকার করার মধ্যেও লজ্জা আছে।

স্বীকার না করলেও তবু প্রশ্ন থেকে যায়—আচ্ছা স্ত্রীর স্বস্তিই কি বড় হল মায়ের সুখের চেয়ে? মা, ভাই আর নিজেকে মেশানো এখানকার মিষ্টি নিবিড় পরিবেশের চেয়ে? তাদের পরিবারের স্বার্থের চেয়ে? মা যে নিজেকে নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়ে এখানকার সংসার গড়ে তুলেছিলেন; ভেবেছিলেন এই সুখের নীড় কোনদিনই বুঝি ভাঙবে না।

ছেলেদের দিক দিয়ে মা একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাতে যে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে আঘাত আসতে পারে সে কথা মা কল্পনাও করতে পারেননি। প্রতি বিষয়ের কত দিক আছে—সব দিক কি লোকে আগে থাকতে ভেবে রাখতে পারে? হাবুর কথা বাদই দাও—একরকম বলতে গেলে মণিই এ বাড়িব বড ছেলে। এ পরিবারের সম্বন্ধে মণিরই দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী হওয়া উচিত। একথা তাকে কোনদিন বুঝিয়ে দিতে হয়নি। তাদের মত দুঃস্থ পরিবারে আপনা থেকেই ছোটরা শিখে যায় যে বাইরের ঝড়-ঝাপটার হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় নিজেদের মধ্যে জড়াজড়ি করে থাকা। এই বন্ধন আরও দৃঢ হয়েছিল হাবুব জন্য। হাবুকে যে সব সময় আগলে আগলে রাখতে হয়; দশ জোড়া নিষ্ঠুর চোখেব থেকে যে সর্বক্ষণ আড়াল করে দাঁড়াতে হয়। বাড়ির মধ্যে দাদা যা ইচ্ছা করুক, তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু বাইরে? বাইরের লোকের কাছে যে লজ্জা লজ্জা করে। কোন ছোট ছেলে মেয়ে রাস্তায় হাবুকে দেখে যখন ভয়ে কেঁদে ওঠে, তখন লজ্জা করে সবচেয়ে বেশী। দাদা বাইরে গেলেই মণি, পটলার ভয় ভয় করে—এই বুঝি সে একটা হাস্যাস্পদ কিছু করে ফেলে, এই বুঝি অপুর্ববাবুদেব মালী তাকে শাসাচ্ছে বাগানের গেট খুলে দিয়েছে বলে; এই হয়তো দুষ্ট ছেলেরা তার পিছনে লেগেছে, হয়তো মারধরই করল দাদাকে। বাইরের লোকে তো বুঝবে না, তাই একটু চোখেচোখে রাখতে হয়। মা সব সময় তটস্থ—দারোগা পুলিশে আবার কোনদিন কি করে বসে হাবুটাকে! তিনি রান্নাঘরে রান্না করতে করতে এ ঘরের দিকে তাকালেই মণি, পটলা ছোটবেলা থেকে বুঝতে পারে যে মা জিজ্ঞাসা করছেন—"হ্যাঁরে সেটাকে তো দেখছি না! সেটা গেল কোথায়?" অমনি তাদের মধ্যে এক ভাই বাইরে ছোটে। এরা প্রত্যেকে জানে যে 'সেটা'র স্থানই এ পরিবারে সব চেয়ে উঁচুতে; এক মুহূর্তের জন্য সেটার কথা ভুললে চলে না। ছেলেরা জানে মায়ের টান দাদারই উপর সব চেয়ে বেশী। এইটাকেই তারা স্বাভাবিক বলে জেনেছে—এ যে হতে বাধ্য। এর জন্য কোনদিন

হিংসা করেনি দাদাকে—ওকে কি হিংসা করা যায়? তারা জানে যে পাড়ার লোকে যত ভাল ব্যবহারই করুক—তবু পর একদিকে আপন অন্য-দিকে; দয়ামায়াহীন বাইরের লোকরা একদিকে, আর দাদাকে কেন্দ্র করে তারা তিনজন অন্যদিকে। এই পরিবেষ্টনে পারিবারিক বন্ধন সাধারণের চেয়ে দৃঢ় হওয়াই স্বাভাবিক।

তবু মণি চলে গিয়েছিল বউ নিয়ে, সদর থেকে মহকুমা শহর মধুগঞ্জে। অন্য মা হলে হয়তো বলত যে একটা পরের-বাড়ির মেয়ে এসে ছেলেকে পর করে নিল। কিন্তু হাবুর মা অন্যরকম মানুষ। তিনি কিছু বলেন নি। তিনি যে জানেন রেণু কত ভাল। তিনি যে কিছুদিনের পরিচয়েই বুঝে গিয়েছিলেন, শাশুড়ী, ভাশুর, দেওরের উপর কর্তব্য সম্বন্ধে বউমা কত সজাগ। বুঝতে পেরে তিনি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন—পারবে—এ বউ পারবে! কিন্তু পারল কই? কী হল? মানুষ যা চায়, তা কি পায়! কত রকমের বাধা আছে পাবার পথে!...

একজন বদলি হয়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে। কত তুচ্ছ ঘটনাটা! কিন্তু মন যে একটা বিশাল জগৎ। সেখানকার ফাটলগুলো যে বাইরের জগতের ফাটলগুলোর চেয়ে আরও কাছের জিনিস।

মণির দিক থেকে কি কোনই ত্রুটি হয়নি? এ বিষয়ে তার বিবেক সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়; তাই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার এত চেষ্টা। তার গোপন মনের অন্ধিসন্ধির খোঁজ না নিয়েও, এটা পরিষ্কার যে, সে বদলির হুকুম রদ করানোর চেষ্টা করেনি। জজ সাহেব খুব ভাল লোক। তাঁকে একবার গিয়ে বললেই বোধহয় কাজ হয়ে যেত। রেণুর পিসেমশাই অপূর্ব-বাবুকে দিয়ে বলালে তো নিশ্চয়ই হত। মণি সে চেষ্টা করেনি। পটলা, মা দুজনেই একথা জানেন। সেই জন্যই তার এত কুণ্ঠা। বাইরের লোকে ধরতে পারবে না এ ত্রুটির গুরুত্ব; কিন্তু এ পরিবারের লোকে জানে যে, হাবুকে ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবা, সামান্য ত্রুটি নয়। চলে যাওয়া তো নয়—এখান থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া! সে যে কি কষ্ট! নিজের দুঃখ থেকে মণি বুঝতে পারে, মা আর পটলা কি রকম ব্যথা পেয়েছে। তাদের

মনের কোন না কোন জায়গায় কি আর চিড় খায়নি ? যতই ঢাকতে চেষ্টা করুক।···তবু মণি বলবে যে, তার দোষ ছিল না।······রেণু যে······। না না—রেণুকে সে দোষ দিতে চায় না—সে কিছু বলেনি। শুধু···শুধু সে যখন তার বদলির খবরটা প্রথম দিল, তখন স্ত্রীর ভয়-কাতুরে মুখখানায় অজ্ঞাতে একটা স্বস্তির দীপ্তি ফুটে উঠেছিল। অজানতে রেণুর চাউনির মধ্যে মুহূর্তের জন্য তার সত্যি মনের ঝিলিক খেলে গিয়েছিল। তারপরই সে ঝিলিক মিলিয়ে গেল তার আটপৌরে চাউনির মধ্যে। এ জিনিস মণির নজর এড়ায়নি। তখনই রেণু যদি বলত—'তোমার যেখানে যেতে ইচ্ছা হয় যাও, আমি যাব না মধুগঞ্জে'—তাহলে হয়তো আগাগোড়া ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যেতে পারত। এই অঘটনে রেণুর দায়িত্ব ওইটুকুই। একে ত্রুটি বলা চলে না। রেণু বলতে পারেনি ভয়ে ; এখানকার আতঙ্কের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায়। সেই ঘটনাটা তখন সদ্য ঘটেছে কিনা।

তারপর মণি যখন মাকে বদলির খবরটা দিল তিনি শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কবে যেতে হবে ?' তার কথার সুরেই মা ধরতে পেরেছিলেন যে, সে মধুগঞ্জে যেতে চায়। মা তাকাতেই মণি চোখ নামিয়ে নিয়েছিল।··· মা যে সব বুঝে যান এক নজরেই।···

কিন্তু মা বুঝেছিলেন যে, এখানকার দুঃসহ আবহাওয়া থেকে বউকে অব্যাহতি দিতে চায় ছেলে। মনের দুশ্চিন্তা চেপে নিজে থেকেই বলেছিলেন —"তাহলে বউমাকেও নিয়ে যা, একটা বাসা ঠিক করে। মেসে হোটেলে খাওয়া তোর চলবে না।"

সহজ করে দিতে চেয়েছিলেন ব্যাপারটা অল্প কথায়। এ তো আর শাশুড়ী বউএর মন কষাকষির ব্যাপার নয়—এ যে একেবারে অন্য রকমের কথা—আলোচনার বাইরের জিনিস। এর পর যে কদিন মণি ছিল এখানে সে কদিন মায়ের দিকে তাকাতে পারেনি। সামনা-সামনি হলেই দুজনেরই ভারী চোখের পাতা, নীচের দিকে নামতে চায়— চোখোচোখি হলে যেন দুজনেই ধরা পড়ে যাবে। নিজের চাউনিকে

বিশ্বাস পায়নি কেউ। দুজনের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সব সময় চেয়েছে; তাই পটলা কাছে থাকলে সোয়াস্তি পেয়েছে মণি।

মায়ের সেদিনকার সেই কিছু-না-বলাটাই আজ মণির বেশী করে মনে পড়ছে।...কিন্তু পরের-বাড়ির মেয়েকে এখানে থাকতে বাধ্য করা কি উচিত হত! যদি রেণু নিজে থেকে এখানে থাকতে চাইত, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা ছিল। সেই জন্য পরশু স্ত্রীকে যে টেলিগ্রাম করেছে তাতে সে লিখেছে—'মা বিশেষ অসুস্থ'। শুধু এইটুকু; আর একটা কথাও না। এ বাড়ির এমন বিপদের সময়, রেণু যদি পাশে এসে দাঁড়ানো দরকার মনে করে তাহলে আসবে।

তারপর রেণুর বাপের-বাড়ি থেকে একখান টেলিগ্রাম এসেছে—করছেন বিশ্বাসজী—তাঁদের রওনা হবার খবর দিয়ে। সে-ই থেকে স্ত্রীর আসারই প্রতীক্ষা করছে মণি। মাকে সে কথা বলা হয়নি, অযথা ব্যস্ত হবেন ভেবে। স্ত্রীর আসবার খবরে আনন্দ হয়েছে বইকি মণির—আনন্দের সঙ্গে খানিকটা আশা খানিকটা উদ্বেগ মেশানো।...তবে কি রেণু তার ভয় এতদিনে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে? চেষ্টা করলে মনের জোর নিশ্চয়ই বাড়াতে পারা যায়। সময়ের ব্যবধানে মনের কত গ্লানি আপনা থেকে কেটে যায়। আজ যেটাকে বড় বলে মনে হয়, কাল সেটাকে ছোট লাগে। ছেলেবেলায় যখন তারা তিন ভাই মায়ের সঙ্গে এই জোড়া তক্তাপোশে শুত, তখন এখানাকে কত বড় লাগত। কাছ থেকে যে ঘটনাটাকে খুব গুরুত্বপুর্ণ মনে হয়, দুরে গিয়ে ঠাণ্ডা মেজাজে সব দিক থেকে ভাবলে, সেটা অতি তুচ্ছ মনে হতে পারে। তাই যদি হয়ে থাকে রেণুর বেলায়! বুঝবার পরও হয়তো এতদিন বলতে পারছিল না এখানে ফিরবার কথা সঙ্কোচে! কিংবা হয়তো মনের কোণায় জমানো গ্লানি ও দ্বিধার অবশেষটুকু হঠাৎ মুছে গিয়েছে এই দুঃসংবাদের টেলিগ্রাম পেয়ে! বড় বিপদের মুখে নিজেকে কাটিয়ে উঠে কত কিছু করতে পারে লোকে।......

স্ত্রীর আসবার কথাটা, এই রকম ভাবেই ভাবতে ভাল লাগছে আজ মণির। এ ছাড়া যে আর সমাধানের অন্য কোন পথ নাই। আর কেউ না

বুঝুক, সে তো জানে রেণুর মন কত নরম কত ভাল। এখান থেকে চলে যেতে পেরে রেণু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল বটে; কিন্তু ভাণ্ডরের উপর তার মায়ামমতা নেই, সে কথা তো সত্যি নয়। অন্য লোকের হয়তো সেরকম ধারণা থাকতে পারে; কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রমাণ-সে যে নিজের চোখে দেখেছে—সে-ই মধুগঞ্জে যাবার দিন। না দেখলে তারও হয়ত স্ত্রীর মনের ভাবের একটা ভুল ধারণা থেকে যেত। স্টেশনে যাবার সময় রেণুর চোখে জল দেখে, সে তার হাতখানা নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় রেণু কাঁদেনি; কিন্তু তারপর কখন—ঠিক কোন মুহূর্তে কি দেখে তার চোখে জল প্রথম এসেছিল, সেকথা মণির স্পষ্ট মনে আছে। সেইটুকুই তার আজকের আশা ভরসার ভিত্তি।...ভাণ্ডরেব উপর রেণুর এত দরদ—এত আতঙ্ক সত্ত্বেও!...

সমস্ত দৃশ্যটা স্পষ্ট চোখের সম্মুখে ভাসছে। গাড়িখানা তখন চলতে আরম্ভ করেছে। মা, পটলা দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে। রেণুব চোখের জল হয়তো মা, পটলা অত দূব থেকে দেখতে পাননি, কিন্তু যা দেখে তার চোখে জল এসেছিল, সে জিনিস তাঁরা লক্ষ্য না কবে পারেন না—এ পরিবারের কেউ পারে না। এ বাড়ির লোকেব পক্ষে সে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

হাবু সেদিন জীবনে প্রথম ডানদিকে ঘুবেছিল।

মণিরা বাড়ি থেকে বার হবার সময় সকলের নজর অভ্যাসবশে গিয়ে পড়েছিল, অপূর্ববাবুদের গেটের দিকে। রেণু খানিক আগে ওই বাড়িতে পিসিমা, পিসেমশায়ের সঙ্গে দেখা কবে এসেছে—এখন তার ওদিকে না তাকালেও চলত। চার জনের কেউ ওবাড়ির গেটের দিকে তাকাতে চায় না—কেউ অন্যকে জানতে দিতে চায় না যে সে ওদিকে তাকিয়েছে। কিন্তু ওই দিকেই চুম্বকের আকর্ষণ। হাবুকে সব কিছু থেকে বাদ দেবার যত চেষ্টা করে সকলে, তত সে জায়গা জুড়ে বসে মনের মধ্যে। হাবুকে নিয়েই এত বড় কাণ্ড বাড়িতে, অথচ সে এসব কিছুর খোঁজও রাখে না।

...বাঁ দিকে কাত করা মাথা।...পুরনো ইনামেলের থালাখানা অপূর্ব

বাবুদের বাড়ির গেটের শিকগুলোর উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে, খটখট করে শব্দ করছে।···

গাড়ি যখন কাছাকাছি গিয়েছে তখন বুঝি তার হঠাৎ নজরে পড়ল। একটু বোধ হয় বুঝতে সময় লাগল। একি। চেনা চেনা।·পিচুটিভরা চোখে ফুটে উঠল বিস্ময়। গাড়িতে করে চলে যাচ্ছে যে?···তার দৃষ্টিকে পাল্লা দিতে হবে চলন্ত গাড়ির সঙ্গে। নইলে ততক্ষণে অনেক দূর চলে যাবে যে! বাঁ কাঁধের দিকে ঢলে পড়া মাথা সুদ্ধ সারা দেহটাকে সে ডানদিকে ঘোরালে—দেখবার জন্য। তখন চারজোড়া চোখের অপলক দৃষ্টি তারই দিকে। চারজনই ভুলে গিয়েছে যে হাবুর দিকে তাকানোর সময়, অন্য তিন-জনের কাছে ধরা পড়ে গেলে, একটু অপ্রস্তুত হতে হবে। হাবু যে এর আগে কখন ডান দিকে ঘোরেনি। একবার এদিক একবার ওদিকে শরীর দুলিয়ে, একটু পা ঘষটে ঘষটে বনমানুষের ধরনে সে চলে চিরকাল, মাথা থাকে বাঁ দিকে কাত করা, হাঁটুর কাছটাতে একটু যেন দোমড়ানো ভাব; হাত দুখান সামনে পিছনে দোলে। এইভাবে সোজা কয়েক পা হাঁটবার পর সারা দেহটাকে বাঁদিকে বাঁকিয়ে নেয় ধনুকের মত করে, তারপর বাঁদিকে একবার ঘুরে নিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করে। হাবুর হাঁটবার এই বিশেষত্ব-টুকু পাড়ার ছোট ছেলেটা পর্যন্ত জানে। সেই লোক আজ ডানদিকে ঘুরেছে। অবাক কাণ্ড। হল কি আজ হাবুর। পরিবারের এই সবচেয়ে দুঃখের দিনেও, এটা সব চেয়ে আনন্দের কথা।

ডানদিকে দেহটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে হাবু টলতে টলতে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি সে কোনদিন হাঁটেনি। হাত থেকে তার বহুদিনের প্রিয় ইনামেলের থালাখানা পড়ে গেল সেদিকে তার খেয়াল নেই। অধীর আগ্রহে সে নিজের হাত দুখানা সম্মুখের দিকে তুলে ধরেছে। প্রাণপণ শক্তিতে সে চেষ্টা করছে, যাতে ছুটে গিয়ে গাড়িখানাকে ধরতে পারে। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে পারবে কেন।

গাড়িখানা বাড়ির সেই ঘোমটা-মাথায় অদ্ভুত রহস্যময়ীকে নিয়ে চলে গেল। আর দেখা যাচ্ছে না। মোড়ের ওই মস্ত বাড়িটা সেই

অবাক-ঘোমটা মেয়েটিকে ঢেকে নিল। কেন? বুঝতে পারা যায় না কিছুই।...

হাবু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সেদিকে।...না না। তাদের বাড়ির সেই অবাক-ঘোমটা নতুন লোকটা—যেটা তাকে দেখলে মাথার ঘোমটা আরও টেনে দেয় সেইটা—বোধহয় ও গাড়িতে যায়নি। নিশ্চয় বাড়িতে আছে।...

হাবু বাড়ির দিকে এগল। মা, পটলা তখনও দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। অন্যদিন এতদূর আসতে হাবু অন্ততঃ চারপাঁচবার থেমে থেমে একটা করে বাঁদিকে ঘুরপাক খেয়ে, তবে আসত। আজ এল সোজা। কাজের তাড়ায় ঘুরপাক খেতে ভুলে গিয়েছে। ব্যস্ত হয়ে বাড়িতে ঢুকবার সময়, মা কিংবা পটলার দিকে সে একবার তাকালও না। ঘোমটা-ফাঁকে-মুখ-লুকানো সে-ই অন্যরকম মেয়েটিকে সে খুঁজছে—এ ঘরে-ওঘরে-রান্নাঘরে।

...কোথায় গেল? কোথাও তো নেই।· হতাশার ছাপ পড়ল তার মুখে। আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। পটলা তাকে ধরে গামছা দিয়ে তার চোখ মুখ মুছিয়ে দিল। সব সময় হাবুর চোখে পিচুটি পড়ে, আর কশ বেয়ে নাল পড়ে। তাই যতবার সে বাড়ির বার হয়, ততবার তার মা মুখ মুছিয়ে দেন; নইলে মাছিতে বড় জ্বালাতন করে। আজ মা তাঁর ডিউটি করলেন না দেখে, পটলা এগিয়ে এসেছে। মা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে; কি করবেন ঠিক করতে পারেন নি তখনও।...ভুল করলেন নাকি? মণিকে হয়তো কিছু বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল!...বাবা মারা যাবার সময়ের কথা পটলার মনে নেই, সেদিন সে জীবনে প্রথম মাকে কাঁদতে দেখল।

মায়ের মাথার কাছে বসে মণি আজ সেই দিনকার কথা ভাবছিল। একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল নিশ্চয়। হঠাৎ খেয়াল হল যে, মা একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

মন-চাউনির ভাষায় আবার কথাবার্তা আরম্ভ হল।

"হ্যাঁরে এত ভেবে আকুল হচ্ছিস কেন? আমি মরে যাব বলে? আমি মরব না রে মরব না। আমার মন বলছে আমি মরব না। ঘুম আসছে

তোর—না? আসবেই তো। সারারাত জেগে। আচ্ছা বল, এ কি আমার ভাল লাগে? একটু ঘুমিয়ে নে না কেন। হ্যাঁরে সকাল থেকে খালি পেটে রয়েছিস তো?"

"না, খেয়েছি তো।"

"খেলি আবার কখন? এখান থেকে উঠলি কখন, খেলি কখন? বললেই আমি বিশ্বাস করি!"

"পিসিমা যে সকালে তাঁদের বাড়ি থেকে চা জলখাবার নিয়ে এসেছিলেন।"

"জলখাবার নিয়ে এসে থাকবেন; কিন্তু তুই খাসনি। বাজে কথা বলিস না আমার কাছে। তার চেয়ে বরঞ্চ স্নান করে একেবারে দুটো ভাত খেয়ে নে। ভাত কি তোদের পিসিমার বাড়ি গিয়ে খেতে হবে, না এখানে দিয়ে যাবে? এখানে না দিয়ে গেলে 'সেটা'র অসুবিধে।"

আবার 'সেটা'র কথা এসে পড়েছে।

"না না, মা তুমি ভেব না! পটলা সকালে দাদার মুখ ধুইয়ে, নিজে সম্মুখে দাঁড়িয়ে খাইয়েছে। টিফিন কেরিয়ার-এ করে ভাত পিসিমাদের বাড়ি থেকে দিয়ে গিয়েছে। দাদা বাড়িতে এলেই খাইয়ে দেবো।"

"হ্যাঁরে—'সেটা' গেল কোথায়? সেটাকে তো দেখছি না? কালও দেখিনি, আজও দেখিনি!"

এইটাই আসল প্রশ্ন। হাবু নিজের খেয়ালেই ডুবে থাকে। কি জানি কেন, দুদিন থেকে এঘরে আসছে না। বোধ হয় ঘরে এত লোকজন দেখে। রাত্রেও ঘুমিয়ে পড়েছিল উঠনের তক্তাপোশখানার উপর। গরম লাগছিল হয়তো। চিরকাল সে মায়ের পাশে 'অয়েলক্লথ'এর উপর শোয়। তাকে কাছে না নিয়ে শুলে মায়েব ঘুম হয় না। তিনি পিঠে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেন। মাঝে মাঝে এক-আধ দিন রাত্রিতে কি জানি কেন হাবুর ঘুম আসে না; গোঙানি, কাতরানি, ও কান্নার মাঝামাঝি একরকম শব্দ তার গলা দিয়ে বার হয়। সে কথা বলতে তো পারে না; এই শব্দই তার কথা। এই সব রাত্রে মা অস্থির হয়ে,

পড়েন। আর ক্বচিৎ কখনও এক একদিন হাবুর কি যেন মনে হয়—অকারণ আনন্দে মায়ের বুকের কাছে ঘেঁষে এসে, তাঁর গা টিপে টিপে দেখে। কী দেখে সে-ই জানে। মধ্যে মধ্যে হাতের মুঠোয় মায়ের গা চেপে ধরে। এই হচ্ছে হাবুর আদর—তার নিবিড়তম সম্পর্ক অন্য লোকের সঙ্গে। আর তার এই আঙুলের চাপ, মায়ের জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ। কত রাত্রে এই আঙুলের চাপে ঘুম ভেঙে, আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছে তাঁর; আরও কাছে টেনে নিয়েছেন হাবুকে।···হাবুদের জগৎ যে আলাদা। সেখানে যখন-ইচ্ছা পৌছান যায় না যে? সেখানকার দরজা যে খোলে ক্বচিৎ কখনও।···

চোখের টেলিগ্রাম খেলে গেল মণি আর পটলার মধ্যে।

"দাদা কোথায় রে? বাইরে? মা দাদাকে দেখতে চাইছে। গ্যাখ, যদি ধরে আনতে পারিস। আলনার উপর থেকে মায়ের ওই শেমিজটা নিয়ে যা।"

হাবু পরনে কিছু রাখতে চায় না। হাফ প্যাণ্ট কিংবা ইজারে নানারকম অসুবিধাও আছে। সেইজন্য মা পুরনো কাপড় দিয়ে তার জন্য সায়া সেলাই করে দেন। সায়াও কোথায় কোথায় ফেলে আসে, সব সময় জানতেও পারা যায় না। যখন সায়া পর্যন্ত পরনে রাখতে চায় না, তখনকার ওষুধ হল মায়ের শেমিজ। এই জন্য মায়ের সব শেমিজগুলোর গলায় ফিতে দেওয়া; এই ফিতে পিঠের দিকে বেঁধে দিলে আর হাবু খুলতে পারে না। আজ বাড়িতে অনেক লোকজন—পরনে সায়া রেখেছে কি না রেখেছে—তাই এই সতর্কতা। হাবু বড় হবার পর থেকে এইটাই দাঁড়িয়েছে বাড়ির লোকের সবচেয়ে বড় সমস্যা, চোরের মত থাকতে হয় বাইরের লোকদের কাছে।

পটলা শেমিজ নিয়ে ঘর থেকে বার হল। বারান্দার মেয়েদের মধ্যে একজন ফিসফিস করে বললেন—"পটলা, তুই স্নান করে চারটি খেয়ে নে। যে যখন সময় পাস খেয়ে নেঁ। আবার বউমা এসে পৌছলে তাকেও চারটি খাইয়ে দিতে হবে তাড়াতাড়ি, পোয়াতি মানুষ, রেলগাড়ির ধকল তো কম নয়।"

"আসছি এখনই।"

পটলা বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

নিজের পায়ের দিকটা মা দেখতে পাচ্ছেন না; কিন্তু বুঝেছেন যে পটলা উঠে গেল।···কত বুঝে চলে পটলাটা! ···সে পায়ের দিকে বসছে তুদিন থেকে মাথার দিকটা মণিকে ছেড়ে দেবার জন্য। মণির যে এখন দরকার মায়ের চোখের দিকটা পাবার—কত-চোখের কথা যে এখনও বাকি তা কি সে জানে না?···চোখ কেন বন্ধ হয়ে আসছে? চোখের পাতা ভারী। যেন রাশি পেঁজা তুলো এসে জমছে চোখ মুখের উপর!··

"মা তোমার ঘুম আসছে; ঘুমিয়ে পড!"

"না! ঘুম অমনি এলেই হল নাকি!"

পটলা ফিরে এল, একা। শেমিজটা হাতে নেই। তার মানে, হাবুকে পরিয়ে দিয়ে এসেছে। চোখে চোখে তুই ভাইয়ে কথা চলল।

"দাদা এল না। কত চেষ্টা করলাম।"

"খিদে পেলে নিজে থেকেই খানিক বাদে আসবে।"

"পটলা, তুই বরঞ্চ এক কাজ কর। তক্তাপোশে এসে বসিস না এখন—মা বুঝতে পারবে। তুই আস্তে আস্তে এগিয়ে আয়—পা টিপে টিপে—একটুও শব্দ না করে—মা যেন জানতে না পারে। মায়ের পায়ের দিকের কোন জায়গা একটু চেপে ধর—ঠিক দাদা যেমন করে চেপে ধরে আদরের সময়। বুঝেছিস তো? আর কত বুঝিয়ে বলব তোকে!"

পটলা বুঝেছে ঠিক।

"তুমি বলছ বটে; কিন্তু মা ধরে ফেলবে। মা বুঝে ফেলবে যে এটা দাদার আঙুলের চাপ নয়। জানি তো!"

"আচ্ছা একবার করেই ত্থাখ! এখন কি আর মায়ের অত সাড় আছে।"

পটলা ঠিকই বলেছিল। মা ধরে ফেলেছেন।

চোখের ভাষায় ফুটে উঠল—"কে? পটলা না? খানিক আগেই যে উঠে গেল। পা ঠাণ্ডা কিনা তাই দেখছে নাকি? পা গরম করবার জন্য আবীর দিয়ে ঘষবে নাকি? দরকার নেই। বরঞ্চ ওকে বল, এখানে এসে বসুক। তুই যা—যাহোক কিছু খেয়ে আয়! বলছি, কথা শোন!"

মণি উঠে যেতেই একজন বর্ষীয়সী মহিলা রোগিণীর কাছে মুখ এনে

জিজ্ঞাসা করলেন—"ও হাবুর মা, কিছু খেতেটেতে ইচ্ছা করছে? একটু আম খাবে?"

পটলার চোখে অগ্নিবাণ দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভদ্রমহিলা সরে গেলেন। সে গঙ্গাজলে ভিজানো ন্যাকড়াটা নিয়ে মায়ের মাথার কাছে বসল। মা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন।

......মনে হচ্ছে তিনি বোধহয় পটলার উপর একটু অন্যায় করে ফেলেছেন। আগে ঠিক করা ছিল যে, মণির বিয়ের পরই ছোটছেলের বিয়ে দেবেন। ও কথা তুললেই পটলা মৃদু আপত্তি জানিয়েছে—ওই যেমন সব ছেলেরা প্রথমটায় বিয়ে করব না বলে আর কি, সেই রকম—কিন্তু সত্যিকার না বলেনি। বোঝা তো যায় সব। তারপর ?।ড়িতে ওই কাণ্ড হয়ে গেল। মণি মধুগঞ্জে চলে যাবার পর তিনি আর পটলার কাছে বিয়ের কথা তোলেন নি। নইলে পাড়ার মধ্যেই মেয়ে ছিল—মেয়ের বাপ মা তো ঝুলোঝুলি করছে আজও। এক ছেলের বিয়েতেই তছনছ হয়ে গিয়েছে, তাঁর এত সাধের গড়েতোলা সংসার। ঘরপোড়া গরু—তাই এত ভয়। নিজের স্বার্থে—হ্যাঁ একরকম নিজের স্বার্থেই বলতে হবে বইকি। মণি মধুগঞ্জে চলে গেলে তবু পটলা ছিল, কিন্তু আবার পটলাও যদি চলে যায় তা হলে? তাহলে হাবুটার কি হবে? এই ভয়েই পটলার উপর একটু অন্যায় করে ফেলেছেন। একটু দোষী দোষী ভাব মনের মধ্যে কির কির করে বিঁধছে। এবার সেরে উঠলে তিনি আর দেরি করবেন না। পাড়ার মেয়ে। হাবুদাকে জানে। কোন গোলমাল হবে না। তাঁর কোল-পোঁছা ছেলে পটলা। মণি না হয় মাসে মাসে কটা করে টাকা পাঠায়, পুটলার উপরই তো এখানকার সংসার? কিন্তু হাবুর জন্য কি আর তিনি অন্য ছেলেদের উপর সে রকম নজর দিতে পেরেছেন। 'সেটার' জন্য চিন্তাই যে সব সময় তাঁর সারা মন জুড়ে। সে-ই প্রথম যখন তিনি হাবুর অদৃষ্ট বুঝতে পারলেন তখন থেকেই।......প্রথম ছেলে। কত আদরের ছেলে। কত রকমের স্বপ্ন তখন মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে। প্রথমটায় তো বোঝা যায় নি—মায়েই বোধ হয় বোঝে এসব জিনিস সব চেয়ে শেষে!

সবাই জিজ্ঞাসা করে—এতটুকু ছেলে, এত শান্ত কেন? আমি ধরতে পারি না কোন দিকে ইশারা করছে তারা। ভাবি এ বুঝি ছেলের প্রশংসা। সবাই বলে—ওলো তোর ছেলে হাসে না যে? আমি জবাব দিই—হাসবে না আবার কেন; হাসে তো; খলখল করে হাসে না, কিন্তু মুচকে হাসে।...আসলে সেটা হাসি কিনা জানি না; মনে হত হাসির মত। তখন কি বুঝেছি?...ছেলের বাবা হাবা, হাবু, হাবলা বলে আদর করতেন 'সেটা'কে। তখন কি আর কেউ জানে যে সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি হবে তাঁর কপালে! তিনি বলেন—ছেলে বড় হল; কথা বলে না।...আমি বলি—বলবে এখন; সকলেই কি এক বয়সে কথা বলে?...তারপর যখন মণি 'সেটা'র চেয়ে আগে কথা বলতে শিখল তখন আর মনকে বুঝ দেবার জন্য কিছু রইল না! প্রথম বুঝতে পারার সে যে কী দুঃখ সে কথা মা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। পরে ও দুঃখ; যতদিন বাঁচতে হবে ততদিন দুঃখ!...হাবুনাম রাখার জন্য তখন ছেলের বাবার কী লজ্জা! ডাকতেই চান না আর। কিন্তু তখন আর উপায় কি; পাড়ার দশজনে ওই নামে ডাকে; থেকে গেল ওই নাম।......সেই দুঃখের জের আজও টেনে চলেছি। সত্যি করেই আমার মরবার ফুরসত নেই। হাবুকে কার কাছে রেখে যাব? আমার মত কে তাকে দেখবে? ওকাজ বেটাছেলের দ্বারা হয় না। ও পারে মেয়েরা। পটলা চলে যাবে আপিসে; তখন কে দেখবে কে খাইয়ে দেবে সেটাকে? কে পরিষ্কার করিয়ে দেবে? পুলিসেই হয়ত ধরে নিয়ে যাবে কোনদিন। হাবুর মত ছেলেদের শুনেছি ধরে নিয়ে গিয়ে কোথায় যেন পাঠিয়ে দেয়; মারধর করে; খেতে দেয় না।...আমি না থাকলে কি ওর চলে? ওর গোঙানির, ওর ঠোঁটের-কোণে-হাসির মানে, আমি ছাড়া আর কেউ কি বোঝে? সবাই যে ওকে ভুল বোঝে! বিশ্ব সংসারের কিছুই যে হাবুর মত ছেলেদের জন্য নয়। যেখানকার যা কিছু ভাল, সবই যে ভগবান সৃষ্টি করেছেন সুস্থ স্বাভাবিক ছেলেদের কথা ভেবে! কেন তা তিনিই জানেন। চিরকাল ভেবে এসেছি—যদি

ও ছেলে বড় হয়ে, বেশী নয় আর একটু বুঝতে শেখে! যদি আরও একটু বয়স হলে নেংটিখানা গায়ে রাখতে শেখে! এর চেয়ে বেশী আশা করিনি, বেশী চাইনি! কিন্তু আমার সে কথা কি ভগবানের কাছে পৌছেছে? হাবুর বয়স হবার পর থেকে, বাড়ির লোকেই যে একজন আর একজনের সম্মুখে, তাকাতে পারে না তার দিকে!...হে ভগবান, আমার চেয়ে আগে তুমি হাবুকে টেনে নাও! তারপর আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছা, তাই কর! তখন আমার ছুটি।...না না না! ছি ছি! এ আমি কী বলছি! মা হয়ে এমন কথা আমি ভাবলাম কি করে! দোষ নিও না ভগবান! আমার কি এখন মাথার ঠিক আছে? ষাট! সে যাবে কেন! ...পটলাটা একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে আমার মুখের দিকে; অথচ আমার মন উড়ে গিয়েছিল কোথায়! ও বোধ হয় বুঝতে পারেনি আমার মনের কথা।......

"মা, অমন করছ কেন? কী কষ্ট হচ্ছে?"

"হ্যাঁরে সেটা গেল কোথায়?"

হাবু যে এল না মায়ের কাছে একথা বলতে পটলার বাধে।

"আসবে এখনই খাবার জন্য নিশ্চয়। তখন দাদাকে নিয়ে আসব তোমার কাছে।"

"বাইরে এই প্রচণ্ড রোদ্দুর। দেখেছিস নাকি সেটা কোথায় আছে?"

"না। বাড়িতে এখন এত লোকজন। যত বাইরে বাইরে থাকে, ততই ভালো।"

"কিন্তু মন মানে কই।"

হঠাৎ বাইরে যেন গাড়ির শব্দ মনে হল। এরই জন্য সকলে এতক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করছিল। খুব তাড়াতাড়ি পৌছে গিয়েছে তো স্টেশন থেকে! বাইরের মৃদু গুঞ্জনধ্বনি ও ব্যস্ততার আভাস রোগিণীর কানে পৌছয় না। পটলাকে হঠাৎ উঠতে দেখে মনে মনে আন্দাজ করে নিলেন যে হাবু বোধহয় বাড়িতে এসেছে--তাই পটলা গেল দাদাকে খাওয়াতে।

রেণু গাড়ি থেকে নামতেই, মণির চাউনি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাল, এখানে আসবার জন্য। রেণুর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। মধুগঞ্জে যাবার পর থেকে, রেণু একটু একটু করে বুঝেছে, মণির ব্যথা কত গভীর। দেখেছে, সপ্তাহান্তে, কবে শনিবার আসবে, কবে আবার মা ভাইদের কাছে যাওয়া যাবে, সে জন্য স্বামীর কী আকুল প্রতীক্ষা! লক্ষ্য করেছে, মাইনে পেয়ে তখনই বাড়িতে মনিঅর্ডার না করলে, নয়; শনিবার পর্যন্ত দেরি করবার তর সয় না। অস্পষ্ট ভাবে বুঝেছে যে স্বামীর দোষী মন, তাড়াতাড়ি টাকা পাঠিয়ে প্রায়শ্চিত্তের তৃপ্তি খুঁজছে। শনিবারে বাড়ি যাবার সময় মণি একবারও তাকে জিজ্ঞাসা করে নি যে, সেও সঙ্গে যেতে চায় কিনা। নিজেকে অতি ছোট, অতি হীন মনে হয়েছে তার সে সময়। পুরুষমানুষে মেয়েমানুষের মন কতটুকু বোঝে! একটা কেমন যেন সঙ্কোচে সে নিজে থেকে, যাবার কথা বলতে পারেনি স্বামীর কাছে। মধুগঞ্জের বাসায় শনি রবিবার রাত্রিতে একা থাকতে তার ভয় ভয় করে; তবু বলে নি।

পিসিমা এগিয়ে এলেন। রেণু জিজ্ঞাসা করল—"মা এখন কেমন?"

"যা, ঘরের মধ্যে যা! শাশুড়ীর কাছে গিয়ে আগে বস একটু! তারপর স্নান করে তাড়াতাড়ি চারটি খেয়ে নে। আমি ততক্ষণ তোর কাকাকে নিয়ে যাই আমাদের ওখানে।"

রুগীর ঘরে ঢুকবার আগে রেণু আবার একবার তাকাল মণির দিকে। ......কি কাতর মিনতি স্বামীর চোখে! সে চাহনি বলতে চায়—"তোমারই উপর এখন সব নির্ভর করছে রেণু! মায়ের স্বর্গ নরক দুটোরই চাবি-কাঠি তোমার হাতে! তুমি কি ভুলে যেতে পারবে না সেদিনকার সেই ঘটনাটা? সে-ই রবিবারের দুপুরে তুমি যে ঘুমের থেকে হঠাৎ জেগে চেঁচিয়ে উঠেছিলে—দাদার হাতের মুঠোর চাপে ভয় পেয়ে! ভুল বুঝো না—দাদা যে মাকেও অমনি করে আদর করে। দু-বছরের অবুঝ ছেলের যে বুদ্ধি আছে, ওর যে তাও নেই। ওকে আবার ভয় কিসের?

মায়ের এই শেষ সময়ে, তাঁর একটু তৃপ্তির জন্য তুমি কি পার না মনে থেকে মুছে ফেলতে সেই দিনকার কথাটা ?···

পটলা বাহিরের লোকদের, ঘরের মধ্যে ভিড় করতে বারণ করে। মা এখনও জানে না যে বউদি আসছে। মা আর বউদির মধ্যে এই অন্তিম বোঝা-পড়ার সময় কোন বাইরের লোক যদি না থাকে, তাহলে ভাল হয়।

······বুক দুরু দুরু করে পটলার।

রেণু গিয়ে বসল শাশুড়ীর বালিশের পাশে।

"কে! বউমা! তুমি!"

অবাক হয়ে গিয়েছেন শাশুড়ী। রক্তহীন মুখখানি হঠাৎ আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মোটেই তৈরী ছিলেন না তিনি এর জন্য।··· তাহলে টেলিগ্রাম করে আনিয়েছে বউমাকে। এই শরীরে ওকে আনবার কী দরকার ছিল! এরা কি কিছু বলে আমাকে! মরবার আগেই মড়ার সামিল করে তুলেছে! কোন কথা আমার কাছে বলে না ছেলেরা আজকাল!······

রেণু একহাতে পাখাখানা তুলে নিল। আর একহাতে শাশুড়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

"থাক থাক বউমা! এখন থাক। একটু জিরিয়ে, স্নান করে, খেয়ে দেয়ে তারপর এস। এত দূরদেশ থেকে তেতেপুড়ে এলে। দেখি দেখি, মুখখান এদিকে ফেরাও। দেখি কেমন চেহারা হল। কতদিন দেখিনি। সিঁদুর অমন ম্যাড়মেড়ে কেন? রেলগাড়িতে এসেছে বলে? এই আমি বলে রাখলাম—সিঁথিতে সিঁদুর এমনভাবে দেবে, যাতে একেবারে যেন জ্বলজ্বল করে। নইলে কি মানায়? শুধু মুখখানি দেখা যাচ্ছে।

—চোখ ফেরাবার, মাথা নড়াবার শক্তি যে আমার নেই। তক্তাপোশের উপর উঠে এইখানে দাঁড়াতে, তবে না আমি তোমার সর্বাঙ্গ দেখতে পেতাম! হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তোমার সারা-গা দেখতে ইচ্ছা করছে।

আমার যে নাতি। নাতি আসছে যে! কিন্তু হাত যে আমার পাথর হয়ে গিয়েছে। তুলতে পারি না।...

...তোমার চেহারা এমন কেন? শরীরের যত্ন নাও না নাকি? না না ওসব চলবে না, তাহলে কিন্তু আমি খুব বকে দেবো। সেখানে তোমার মা তোমাকে বকেন না? যেটা আসছে সেটার কথা মনে করেও তো শরীরের যত্ন নেওয়া উচিত। বোধ হয় ট্রেনে এসেছ বলে এমন শুকনো শুকনো লাগছে। রাতে কী খেতে তুমি সেখানে? কত গল্প করতে ইচ্ছা করছে তোমার সঙ্গে। ওকি, তুমি কিছু বলবে? বলো! বলো না! এরা সব রইল তো কি হল? একটুখানি বলো, আমি বুঝে নেব বাকিটা। ওকি চোখ ছলছল করছে কেন? তোমাকে আমি দোষ দিইনি বউমা—একদিনের জন্যও দোষ দিইনি। আমি মেয়ে চিনি। দেখামাত্র চিনে যাই। নিজে দেখে পছন্দ করে তোমাকে আমি নিয়ে এসেছি এ বাড়িতে। তোমার কি দোষ? কিন্তু আমি তো হাবুকে ফেলে দিতে পারি না। তোমরা যেখানে থাক, সুখে থাকলেই আমার সুখ। যাকে ভগবান সৃষ্টি করেছেন, তার কোন না কোন উপায় তিনি নিশ্চয়ই করে দেবেন। তোমার উপর বিরক্ত হতে যাব কেন। কিন্তু তবু—তবু একটা কথা বলি—তুমিও তো মেয়ে!· হাবু যদি তোমার নিজের দাদা হত তাহলে?

মায়ের চোখের ভাষা মণি, পটলা যতটা বোঝে, রেণু তা পারবে কেন। তবু শাশুড়ীর চোখের মৃদু অনুযোগটুকু ধরতে পারে।

এরই উত্তর সে দিতে চায়, কিন্তু ভাষায় কুলায় না।

দোরগোড়ার মৃদু গুঞ্জনধ্বনি হঠাৎ সজীব হয়ে উঠল। মেয়েদের ঠেলে সরিয়ে সেমিজপরা হাবু ঘরে ঢুকছে। খুঁজছে কাকে যেন। অপূর্ববাবুদের গেটের কাছ থেকে সে দেখতে পেয়েছিল, সে-ই অবাক-ঘোমটা-মেয়েটার মত কে যেন গাড়ি থেকে নামল। তাই সে ছুটতে ছুটতে এসেছে। সেই দিনকার মত আজও হাবু একবারও থামেনি, একবারও বাঁদিকে ঘুরপাক খায়নি।

···দেখতে পেয়েছে! ঠিক খুঁজে পেয়েছে! ওই তো সেই অবাক-ঘোমটা-মেয়েটা! কোথায় যেন ফাঁকি দিয়ে লুকিয়েছিল এতদিন! কত দিন পর দেখা!···

অধীর আনন্দে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে শেমিজ-পরা হাবু। মুখ মোছাবার ছুতো করে পটলা চেষ্টা করল তাকে আটকাতে, কিন্তু কার সাধ্য তখন তাকে ধরে রাখে। টানাটানিতে হাত থেকে ইনামেলের থালাখানা ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল। পাডার ঠানদি পটলাকে ইসারা করলেন—এখন আর ওকে আটকাস না, হঠাৎ মনে পড়েছে মায়ের কথা; যেতে দে ওকে মায়ের কাছে।

থালার ঝনঝন শব্দতে মায়ের চোখের পাতা কেঁপে উঠল। · না ও কিছু না। মেয়েরা কি যেন ফেলল। তাকিয়ে চলবে না এরা কিছুতেই!··

হাবু এর পর কি কি করবে সেকথা রেণু, মণি, পটলা তিনজনেরই নখদর্পণে।

মণি, পটলা দুজনেরই অপলক দৃষ্টি রেণুর মুখের দিকে। মেঝেতে থালাপড়ার শব্দটা সেমুখে ভয়ের সাড়া জাগাতে গিয়ে পিছিয়ে গেল। শুধু চোখের পাতা কাঁপছে। নিজের সত্তার সমস্ত দৃঢ়তাটুকু দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে সে চেষ্টা করছে নিজেকে সামলে নেবার। এখনকার এই মুহূর্তটির গুরুত্ব সে জানে।

··শাশুড়ি তাকিয়ে রয়েছেন তার দিকে।···ও যদি তোমার নিজের দাদা হত, বউমা! নিজের মুখের উপর স্বামীর আকুল অনুনয়-ভরা দৃষ্টি সে অনুভব করতে পারছে।···রেণু, পরে তুমি যা ইচ্ছা করো, যেমন ভাবে ইচ্ছা চলো, শুধু এখন—এই মুহূর্তে—মায়ের কথা ভেবে, আমাদের কথা ভেবে, তুমি নিজেকে সংযত রেখো! ভয় পেয়ো না!···

···দেওরের অব্যক্ত মিনতি সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।···

···বউদি, তোমার চোখের মণিতে যেন ভয়ের ছাপ না থাকে, মা দেখছে! সাবধান! ভুরুর লেখায় যেন বিরক্তি না প্রকাশ পায়! দেখো, ঠোঁটের কোণে যেন ফুটিয়ে তুলো না বিদ্রূপের রেখাটা! দাদার কাণ্ডয় লজ্জা

পেয়ো না! ও যদি তোমার নিজের দাদা হত! বাইরের লোক থাকুক গে— যাক; তারা তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না; পাছে দেখতে পায় সেই ভয়ে আমরা দুভাই তাদের আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছি। তা ছাড়া এঁরা সবাই দাদাকে জানেন; কেউ কিছু মনে করবেন না। লজ্জা পেয়ো না। মনে জোর আন!···ও যদি তোমার নিজের দাদা হত!···রেণু, এখন দাদার কথা ভেবো না! চেষ্টা কর অন্য কোন কথা ভাবতে! হাবিজাবি যে কোন কথা! তা হলে মনে জোর পাবে। চেষ্টা কর, পারবে! নিশ্চয়ই পারবে তুমি!···

রেণু স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে শাশুড়ীর চোখের দিকে। তিনি এখনও বুঝতে পারেন নি কে আসছে। মণি, পটলা চেয়ে রয়েছে রেণুর দিকে রুদ্ধ নিশ্বাসে।···শান্ত, উত্তেজনাহীন, নিরাতঙ্ক তার মুখশ্রী। ডান হাতের পাখাখান বিছানায় রাখল—বাঁ হাতের আঙুলগুলো বার করে নিয়ে এল শাশুড়ীর মাথার চুলের মধ্যে থেকে—হাত দুখানিকে রাখছে তাঁর কপালের দুপাশে।···

সে চায় শাশুড়ী এখন যেন কিছু না দেখতে পান।

"আপনি একটু চোখ বুঁজে ঘুমুতে চেষ্টা করুন। আমি দুই ভুরুর উপর দিয়ে, চোখের চারদিক দিয়ে এমনি করে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিই—কেমন? আরাম লাগছে না?'

বোঝা যাচ্ছে এ প্রস্তাব শাশুড়ীর অপছন্দ।···আর বুঝি কিছুতেই কিছু করা গেল না! তিনি চোখের পাতা বন্ধ রাখছেন না; আঙুল সরে গেলেই তাকাচ্ছেন! রেণুর পরীক্ষার চরম মুহূর্ত এসে গেল।·· ভাশুর!

হঠাৎ মা চমকে উঠলেন।···একি! এগিয়ে আসছে আঙুলগুলো! এ আঙুল কি ভুল হবার জো আছে! অনেকদিন নখ কেটে দেওয়া হয়নি—কাটতে চায় না—ঘুমুলে কেটে দিতে হয়।···আঙুলগুলো বউমার মুখের দিকে এগিয়ে এল যে! শিউরে উঠেছেন তিনি।·· আবার সেইদিনের কাণ্ড!··· নরকযন্ত্রণার মুহূর্ত! শুধু তাঁর নয়; এ পরিবারের অন্য লোকদেরও। উদগ্র উত্তেজনায় হৃদস্পন্দন বুঝি বন্ধ হয়ে এল সকলের। এতক্ষণে হাবুর মুখ দেখতে পেলেন, মা। আনন্দবিহ্বল মুখ। সে মায়ের দিকে একবার তাকালও

না। নিজের আনন্দেই বিভোর। তার স্থির লক্ষ্য সেই অবাক-ঘোমটা মেয়েটার মুখের দিকে।...আজ অবাক-ঘোমটা মেয়েটা পালিয়ে গেল না তো! মাথার কাপড় বেশী করে টেনে দিল না তো!...তাই আজ আরও ভালো লাগছে হাবুর।

সঙ্কটের এই তীব্রতম মুহূর্তে বউমার মুখের দিকে তাকাতে চান না হাবুর মা।...জানেন, সেখানে ফুটে উঠেছে আতঙ্ক আর ঘৃণা।...হে ভগবান!...তবু তাঁকে দেখতেই হবে।.. কিসে যেন তাঁকে বাধ্য করাচ্ছে সেইদিকে দেখতে!

নরকের অন্ধকার বদ্ধনিশ্বাস—সুড়ঙ্গপথে তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে বউমার চোখমুখের দিকে।.. শান্ত দ্যুতি! ভয়, ঘৃণা, রাগ কিছুর চিহ্নমাত্র নেই! আছে উদার ক্ষমাশীলতা! ভ্রুকুটি পর্যন্ত কোঁচকানো নয়! ছোট ছেলের খুনসুড়ি সইবার হাসিটি ঠোঁটের কোণে ফুটে রয়েছে!· পারবে; পারবে!... বউমা পারবে!.. পারবে কি, পেরে গিয়েছে! ..আর কোন দুঃখ নেই!.. শুধু হাবুটা যদি একবার কাছে আসত, আর ওই রকম করে আমার গাটা একবার চেপে ধরত।...যাকগে আমার বদলে বউমাই তো সেটুকু পাচ্ছে!... ওর নখগুলো কেটে দেওয়া উচিত ছিল! ..

...ঘুমে ভারী হয়ে আসছে চোখ। চেষ্টা করেও খুলে রাখা যাচ্ছে না। দরকারও নেই আর! · স্বর্গের মন্দিরের কাঁসরঘণ্টার শব্দ কানে আসছে।

চোখের পথ বন্ধ, তাই ঠোঁটের কোণের লেখায় ফুটে উঠল স্বর্গের স্বাদ পাবার হাসিটি।

...একি! অবাক-ঘোমটা-মেয়েটা অমন করে কেঁদে উঠল কেন!...কেউ মারল নাকি?...তোমার লেগেছে? না না কেঁদো না লক্ষ্মীটি!

*　　　　*　　　　*

রেণুকে নিয়ে গিয়ে আমি সেবার সেখানে কিছুদিন আটকে পড়েছিলাম। দরকারের সময় এত মনের জোর দেখাল রেণু। কিন্তু এ জোর টিকল না। কোন কাজে এল না! চরম প্রয়োজনের তাগিদ ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গে তার পুরনো আতঙ্ক ফিবে আসে। ওর পিসি ওকে নিজেদেব বাড়িতে নিয়ে যায়। সেই যে শয্যা নিল, আর বোধ হয় তিন সপ্তাহেব মধ্যে বিছানা থেকে ওঠে নি। পেটের সন্তানটি সেই সময় নষ্ট হয়ে যায়। বেণুর ওই অবস্থা, ওর শ্বশুরবাড়ির ওই অবস্থা—চলে আসা ভালো দেখায় না। বেণুর মা, বাবা, সেখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমাকে থেকে যেতে হয়েছিল কমলাদির ওখানে। আমি এক এক সময় ভাবি, যে তখন যদি বেণুর উপব দিয়ে অত ধকল না যেত, তা হলে হয়তো ওব পেটেব সন্তানটি বাঁচত! আর তো হল না ছেলেপিলে। ছেলেপিলে থাকলেও কি ওর জীবনটা এইরকমই হত? কে বলতে পারে সেকথা! কিসে থেকে কি হয়, কে জানে! জোর গলায় কিছু বলবার সাহস এখন আর আমাব নেই। এই সাহস হারাবার ইতিহাসটাই তো বলতে বসেছি।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ? প্রত্যহ হয়তো খবরের কাগজ পড়ছ—একটা ইংরাজী কথার মানে যেদিন শিখলে, ঠিক তার পরদিন থেকে সেই কথাটা প্রায়ই নজরে পড়বে। পথের ধারের গাছে একটা প্রকাণ্ড মৌমাছির

চাক—হয়তো অনেককাল থেকে আছে, নজরে পড়েনি—একদিন হঠাৎ দেখতে পেলে সেটাকে—তারপর থেকে দেখবে যে ওপথে চলবার সময় আপনা থেকে চোখ চলে যাবে সেইদিকে—নিজেই অবাক হয়ে যাবে, যে এই সম্মুখের জিনিসটা এতকাল চোখে না পড়ে, ছিল কি করে।

এই রকমই হয়।

প্রথমবার যখন দেশ দেখতে বার হই সেই সময়কার কথা। কাশীতে হেডকোয়ার্টার করে নানা জায়গায় ঘুরছি বছর খানেক থেকে। বিশ্বনাথ ত্রিবেদীর ঠিকানায়, তুমিও তো কতবার এখানকার বাড়িভাড়ার টাকাটা মনি-অর্ডার করে পাঠিয়েছ কাশীতে। ত্রিবেদীকে দেখনি? আমার জেলজীবনের বন্ধু। কত পড়িয়েছে আমাকে জেলে থাকবার সময়। কর্মী বটে! আর তেমনি খাড়া লোক! গোঁজামিল দিতে জানে না কোন বিষয়ে। আজকাল ও অঞ্চলের নামকরা মজুর-নেতা সে। মজুরদের নেতা হবার সত্যিই উপযুক্ত লোক! তার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে দেখলে বুঝতে পারতে। তারই ওখানে আমার আস্তানা।...অনেককাল থেকে যেতে লিখতে, কিন্তু তখন কাজ থেকে আমার ফুরসত কই; এখন আমার ছুটি; কাজও নেই কর্মও নেই; যতদিন ইচ্ছা রাখ!...আছি। দু-চারদিন থাকি; আবার দু-দশদিন ঘুরে আসি এখানে, সেখানে।...

গিয়েছিলাম ইলোরা। ট্রেনে সারারাত জেগে; ভিড়ের ঠেলায়। তারপর 'বাস'এ। রৌদ্রের মধ্যে, সারাদিন এগুহা সেগুহা দেখে বেড়াচ্ছি। ভাল করে দেখতে গেলে এক-একটাতেই কত সময় লেগে যায়। হিন্দু আর জৈনদের গুহামন্দিরগুলো, সারতে সারতেই প্রায় বিকাল হয়ে এসেছে। গাইড উশখুশ করছে। তখন গেলাম বৌদ্ধদের গুহাগুলোতে। সেখানে একটি বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে আমার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। নামেই গুহা; আসলে প্রকাণ্ড হল-ঘর। সন্ধ্যা হবার তখনও দেরি আছে। আলো খুব বেশী না গেলেও ঘরের ভিতরের সবই দেখা যায়। গাইড বলল—"কী দেখবেন—এ গুহায় কিছুই নেই—শুধু সেই একই বুদ্ধমূর্তি যা অন্য ঘরেও দেখলেন।"

"এসে পড়েছি যখন, দেখাই যাক।"

"কিন্তু সাবধান! দেখছেন তো—আলসে থেকে ঝুলছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৌমাছির চাক? পাহাড়ে মৌমাছি। খেপলে আর রক্ষা নেই। ওরই ভয়ে অনেক টুরিস্ট বাইরে থেকে নমো নমো করে এখানকার ধ্যানী-বুদ্ধমূর্তিটি দর্শনের কাজ কোনরকমে সেরে নেয়।"

ঠাট্টা করে বলি, "বুদ্ধদেবের ধ্যানে কেউ যাতে ব্যাঘাত না করে, সেইজন্য মৌমাছিগুলো পাহারা দিচ্ছে।"

"একজন সাহেব একবার এখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়েছিল। সিগারেটের ধোঁয়াতেই, না কি জন্য যেন, মৌমাছিগুলো হঠাৎ খেপে গিয়ে, এমন কামড়ায়, যে সাহেবটা আওরঙ্গাবাদ হাসপাতালে মারা যায়। ভীষণ বিষ এদের হুলে।"

"যাকগে, আমি তো আব সিগারেট খাই না। সে দুর্ভাবনা আমার নেই। আপনি ববঞ্চ একটু দূরে গিয়ে একটা নতুন সিগারেট ধরান; আমি ততক্ষণ চট করে গুহাব ভিতরটা দেখে আসি। মোটেই দেরি করব না। আপনার সিগারেটটা শেষ হবাব আগেই আমি ফিরে আসবো—দেখে নেবেন।"

"না না, আমি কি তাই বলছি নাকি? যতক্ষণ ইচ্ছা দেখুন না।"

গাইড একটু অপ্রস্তুত হয়েছে আমার কথায়।

গুহার ভিতরে ঢোকামাত্র বেশ আরাম লাগল। রোদে তেতেপুড়ে এসেছি; এখানে বেশ ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা। একটা সোঁদা গন্ধ চারিদিকে। ঘরের ছাতের এক জায়গা থেকে চুইয়ে চুইয়ে জল পডছে চৌবাচ্চার মত একটা পাত্রে। তারপর উপচে-পডা জলটা ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে একটা নালীর মধ্যে দিয়ে। ছাত, চৌবাচ্চা, নালী সব শ্যাওলায় ভরা। এই শ্যাওলা-পচা ভিজে গন্ধটাই নাকে আসছিল। এই চৌবাচ্চার জল বোধহয় এক সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ব্যবহার করত। গম্‌গম্ করে একটা অবিরাম শব্দ হচ্ছে—বহুদূর থেকে নিশীথ রাতের রেলগাডির শব্দটা যেমন লাগে, সেই

ধরনের। বোধহয় মৌমাছিদের গুঞ্জনধ্বনি এই বিশাল গুহাকক্ষের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে, এই রকম দাঁড়িয়েছে। একটু পা পিছলে গেল এক জায়গায় শ্যাওলাতে। সামলে নিয়েই এগিয়ে গেলাম বুদ্ধমূর্তিটির দিকে। সুন্দর মূর্তিটি। এমন নির্জন স্থান পেয়ে যেন বুদ্ধদেব সত্যিই ধ্যানে বসেছেন। বাইরের তাপ, রৌদ্রের এখানে প্রবেশ নিষেধ। আলো-আঁধারের জড়াজড়ি মিতালি। এই রকম সব জায়গায় বিকালের দিকে গেলেই বুঝি যুক্তিতর্কের ঝাঁজ একটু মরে, উগ্র অনুসন্ধিৎসা একটু মিইয়ে আসে, ভয় আর বিস্ময়ের মাঝামাঝি একটা অজানা অনুভূতি মনের উপর চেপে বসে! কে জানে কী হয়! গুহার আলো-আঁধারির সঙ্গে মনের আলো-আঁধারি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কখন থমকে দাঁড়িয়েছি খেয়াল নেই। ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ। নিশ্বাস নিতেও যেন ভয় হয়, পাছে বুদ্ধের ধ্যান ভেঙে যায়! মৌমাছির সেই গুনগুননি ধ্বনিটার অনুরণন হঠাৎ আরও তীব্র হয়ে উঠল নাকি ?···কিন্তু··· একি! চোখে ভুল নয় তো? ··একটা সিরসিরনির ঢেউ পায়ের নীচ দিয়ে ঢুকে মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে মাথার দিকে উঠে গেল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।·

ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবের বুক উঠছে আর নামছে!

চোখের ভুল নয়তো? আবার ভাল করে দেখলাম। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ধ্যানী-বুদ্ধের বুক উঠছে নামছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে। কোন ভুল নেই। কোন সন্দেহ নেই! তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। বুঝবার চেষ্টা করি কোন আলোছায়ার কারসাজি নয়তো? শিল্পীর তক্ষণ-রেখার কোন টানের ফলে দর্শকের চোখের এই বিভ্রান্তি নয়ত ?···

সেখান থেকে সরে গিয়ে, অন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখলাম। সেই একই ব্যাপার। পাথরের মূর্তির বুক উঠছে নামছে। ভাবলাম যে একবার গায়ে হাত দিয়ে দেখি; কিন্তু সাহসে কুলল না। মৌমাছি, চামচিকা বা ওই রকম কিছু উড়বার জন্য এই চোখের ধাঁধার সৃষ্টি হচ্ছে না তো? মাকড়শায় জাল বুনছে নাতো ওখানে? আমার চোখের মণি কাঁপছে না তো?

সম্ভব অসম্ভব কত কারণ, কত ব্যাখ্যা, মুহূর্তের মধ্যে মনে এল আবার চলে গেল। কিন্তু আমি যে বুঝতে পারছি, যদি কোনরকমে উঁচুতে উঠে বিরাট মূর্তিটির বুকে হাত দিতে পারি, তাহলে আঙুলের ডগায় বুকের ওই স্পন্দনটা নিশ্চয়ই অনুভব করব।...ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্। কতকাল থেকে ওই হৃদয়-স্পন্দন মেপে চলেছে মুহূর্তগুলোকে, এই নিভৃতে। পৃথিবীর সুখদুঃখ, ভালমন্দর বাইরে থেকে।...আমিও চেনা-জগতের সীমা ছাড়িয়ে কোথায় যেন এসে দাঁড়িয়েছি!...একেবারে একা!...শুধু একটা বিশাল বুক উঠছে আর নামছে!...ভয় ভয় করছে আমার। প্রাণের ভয় নয়—কোন বিপদের ভয় নয়—শুধু একটা ভয় ভয় ভাব,—তার সঙ্গে মিশানো আরও কি কি যেন—ঠিক বলে বোঝানো যায় না—পুর্ব পরিচিত কোন অনুভূতি নয়—চেনা শুধু তার মধ্যের ওই ভয় ভয় ভাবটা।

টিপি টিপি পায়ে বেরিয়ে এলাম গুহার ভিতর থেকে। চেনা আলোতে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। বাইবের আলোতাপ রুক্ষতাই আমার ভালো। মৌমাছিদের গুঞ্জনের শব্দটা তখনও কানে আসছে। ঘড়িতে দেখলাম চারটে বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়েছে।

এতক্ষণে ভাল করে ভাববার সময় পেলাম ব্যাপাবটা। পাথরের মূর্তির বুক ওঠানামা করাব যে কোন একটা যুক্তিসঙ্গত কাবণ খুঁজে পেলে বেঁচে যাই তখন। চোখে দেখা জিনিসের সবটাই সত্যি নয় সব সময় একথা জানি। তবু নিজের চোখে দেখা জিনিসকে উড়িয়ে দিতে কি কেউ পারে? নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে. সারারাত জেগে, আব সারাদিন রৌদ্রে ঘুবে আমার স্নায়ুমণ্ডলীর নিশ্চয়ই কোন সাময়িক বিকার ঘটে থাকবে—সেইজন্যই ওই দৃষ্টি-বিভ্রম। যত বোঝাতে যাই নিজেকে, ততই চোখে-দেখা জিনিসটা মনের উপর চেপে বসে আবও বেশী কবে।

রেলগাড়িতে উঠেও ওই চিন্তার হাত থেকে নিস্তার নাই। কথাটা কাউকে না বলতে পেরে হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। কাশীতে পৌঁছেই কথাটা বলি ত্রিবেদীকে। শুনে সে হেসে বাঁচে না। জোলাপ নিতে বলল আমাকে। অবশ্য তার মুখ থেকে অন্য রকমের কথা আমি আশা করিনি। জেলে এক-

কালে সে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে, আমার মনকে সবরকমে কুসংস্কারমুক্ত করবার চেষ্টা করেছিল। তার কথাগুলো সে বয়সে নতুন নতুন লাগত; তাই আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, তার নেওয়া ক্লাসের দিকে। ক্লাসের 'লেকচার'এ বলা কথাগুলো দাগ কেটে বসত মনের উপর। পরে অবশ্য হুবহু সেই সব কথা, তারই দেওয়া বইগুলোতে পড়েছিলাম। তিনবছর ধরে তালিম দিয়ে দিয়ে সে আমার মনকে বেশ পাকা-পোক্ত ভাবে তৈরি করে দিয়েছিল, যাতে বিষয়-মুখী যুক্তির পথ থেকে কখনও আমার বিচ্যুতি না ঘটে। এ শিক্ষা সারাজীবন আমার কাজে এসেছে। কিন্তু এখন ইলোরার ঘটনাটার কোন থই পাচ্ছি না বলেই তো, তার কাছে কথাটা তোলা।

আমি কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে এসে বসে আছি শুনে সে দুঃখিত হয়েছিল। এখন সুযোগ পেয়ে সেই ঝাল ঝাড়ল আমার উপর। অবশ্য হাসি ঠাট্টার সুরে।

"আরও পালাও কাজ থেকে! এখনই হয়েছে কি! এখন তো শুধু পাথরকে নিশ্বাস নিতে দেখছ। আর কিছুদিন পর পাথরে সিঁদুর লাগিয়ে তার সম্মুখে ঢোল-করতাল বাজাবে। এই বলে রেখে দিলাম—দেখে নিও!"

"আচ্ছা। কাজ-পালানো মনের পরিণতি ভবিষ্যতে যা হয় হ'কগে যাক। এখনকার কথা এখন। যা দেখলাম তাব একটা সম্ভাব্য কারণ তো বলবে। ওই মুহূর্তটাতে কি ঘটল তাব একটা যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও তো দেবে। আমিই কি ব্যাপারটাকে অলৌকিক মনে করছি না কি? শুধু ওর কারণটা জানতে চাচ্ছি।"

"তার জন্য ডাক্তারের কাছে যাও। বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত অত সময় আমার নেই এখন। একটা মিটিংএ যেতে হবে। যাবে নাকি তুমিও আমার সঙ্গে মিটিংএ?"

"না, ইচ্ছা করছে না।"

"তবে আমি চলি। ফিরবো রাত দশটায়। তুমি ততক্ষণ অহল্যাবাই ঘাটের চাতালের উপর বসে, মনের আনন্দে ইলোরার সেই মুহূর্তটার কথা ভাবো।"

সাইকেল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে বার হবার সময়, দোয়গোড়া থেকে চেঁচিয়ে বলে গেল—"তোমার চিঠি আছে—গা-আলমারিতে।"

চিঠি তো সেই রকমই। মনিঅর্ডার-কুপনে লেখা দুছত্রের চিঠি। রেণুর লেখা। যেতে লিখেছে—অনেক দিন তো হল বেড়ানো—সে চলে যাবার আগে গেলে, দেখা হত।......

রেণুর চিঠির শেষের কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। চলে যাবে আবার কোথায়? কী যে বিয়ে হয়েছিল! দাদা-বউদির একমাত্র মেয়ে—অত ভাল মেয়েটা—কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে টিকতে পারল না—বড ভুঁদভুঁদে স্বামীটা! দশ-বারো বছর থেকে তো এখানে। সে আবার যাবে কোথায়? ...তবে কী...! ...আহা, তাই যেন হয়।......

হাসি এল ত্রিবেদীর কাণ্ড দেখে। চিঠির কথা বলে গেল, অথচ মনি-অর্ডারে টাকা এসেছে, সে কথাটা বলতে ভুলে গেল! কাজের মানুষ কিনা। দিনরাত চরখীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিন-চার বছর আগে, আমিও ঠিক অমনি মানুষই ছিলাম। যে মুহূর্তটা চলে গিয়েছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময় তখন আমারও থাকত না। তা'ছাড়া পাথরের বুক কাঁপছে এই অভিজ্ঞতার গল্প কারও মুখে শুনলে, আমিই কি আজগুবী বলে উড়িয়ে দিই না? বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প কাউকে বোঝাতে যাওয়া বৃথা; যার সে অভিজ্ঞতা নাই সে বুঝতে পারবে না; আর যার আছে তাকে বোঝাবার দরকার নাই।

এই সব সাতপাঁচ ভেবে রাত্রিতে শোবার সময়, ইলোরার সেই মুহূর্তটার কথা আর পাড়লাম না ত্রিবেদীর কাছে—যদিও খুব ইচ্ছা করছিল। তার মেজাজ জানি কিনা; সাহসে কুলাল না।

সকালে বন্ধুকে লুকিয়ে ডাক্তারকে দিয়ে চোখ দেখলাম, রক্তের চাপ মাপালাম। ডাক্তারে যদি আমার কোন রোগ হয়েছে বলে দেয়—যার জন্য ওই দৃষ্টিবিভ্রম—তাহলে তখন আমি বেঁচে যাই। কিন্তু কোন রোগ খুঁজে পাওয়া গেল না। কোন রকমের ভিটামিন খেতে পর্যন্ত ডাক্তার বলল না।

ত্রিবেদী সাধারণতঃ দুপুরে বাড়ি ফেরে না। বাইরেই কোথাও খেয়ে নেয়। সেদিন ফিরল। আমি তখন খাটিয়ায় শুয়ে সেই ইলোরার ঘটনাটাই ভাবছি।

"কি ব্যাপার? এই অসময়ে?"

"এলাম সাইকেলখানা রাখতে। এক জায়গায় যেতে হবে। তোমার ব্যাপার কি তাই বলো। হাতে একখান বই পর্যন্ত নেই দেখছি আজ। সেই কথাটাই ভাবছ নাকি এখনও? পারা গেল না তোমাকে নিয়ে দেখছি! একা একা কি করে যে এমন ভাবে থাক বুঝি না! যাবে আমার সঙ্গে? চল, তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই!"

"কোথায়?"

"না না ভয় পেয়ো না। মিটিংএ নয়।"

"তবে?"

"একটা উৎসবে। ট্যাক্সি ড্রাইভারদের ইউনিয়নের বার্ষিক উৎসবে।"

"সেখানে আমাকে তারা যেতে বলে নি, কিছু না, আমি যাই কি করে?"

"আরে না না! এ সে রকম ব্যাপার না। নিমন্ত্রণপত্র দেবার মালিক তো আমি—চাও তো দশখানা দিতে পারি। আমি তাদের ইউনিয়নের সভাপতি যে।"

আমার ওজর আপত্তি টিকল না। এক রকম জোর করে সে আমায় ধরে নিয়ে গেল তাদের বার্ষিক উৎসবে। ত্রিবেদী বোধ হয় চায়, এই সব করে আমার মনকে আবার ফিরিয়ে আনতে জনসেবার কাজের দিকে।

উৎসব ঠিকই। গান, বাজনা সব ছিল। বক্তৃতাও ছিল। বেশ গরম গরম বক্তৃতা। উৎসবের দিনের পক্ষে যে, সে সব কথা সম্পূর্ণ অনুপযোগী, তা কারও খেয়াল নাই। সভাপতিমশাই তো তাঁর ভাষণে, অমনোযোগী পথচারী, ঘুষখোর সরকারী-মোটর-বিভাগ, জুলুমবাজ পুলিস, দাঁত-বারকরা রাস্তা, ট্যাক্স-লোভী মিউনিসিপ্যালিটি, কাউকে ছেড়ে কথা বললেন না। বক্তৃতা শেষ করলেন এই বলে—"...নিত্য নূতন সমস্যা উঠবে। সেগুলোকে

ব্যক্তিনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে, কঠোর বিষয়ধর্মী যুক্তির নিকষ পাথরে যাচাই করে, বিচার করতে হবে। নিজের রুচি, অভিরুচি, খেয়ালখুশি, কুসংস্কার, বদ্ধমূল-ধারণা, ইত্যাদি যেন কখনও আপনাদের বিচারবুদ্ধিকে প্রভাবিত না করে।"...

যাদের জন্য এ মিটিং তারা হাততালি দিল অনেকক্ষণ ধরে; কিন্তু শেষের কথাগুলোর মানে কতদূর বুঝল, তা তারাই জানে। প্রতি বক্তৃতাই ত্রিবেদী এই সব কথা বলে শেষ করে কিনা জানি না। তবে আমার মনে হল যে এগুলো আমাকে শুনিয়েই বলা।

সভাভঙ্গের পর ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা চাইল, গাড়ি করে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিতে। তখন রোদ পড়ে আসছে; হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি আসতে বেশ আরাম লাগবে। অতি কষ্টে তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়িয়ে, আমরা দুজন বেরিয়ে পড়ি।

এ গল্প সে গল্প করতে করতে রাস্তার ফুটপাথের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। রাস্তার একদিকে হাসপাতাল। পিছন থেকে ইলেকট্রিক 'মোটর-হর্ন'এর একটানা কর্কশ শব্দ কানে আসছে। শব্দটা যত কাছে আসছে ততই দুঃসহ লাগছে; রাতজাগা আর দুশ্চিন্তার জন্য স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত থাকাই বোধহয় এর কারণ। কথাটা না বলে পারলাম না।

"ওহে সভাপতিমশাই, তোমার বক্তৃতায় ইউনিয়নের সভ্যদের ছাড়া পৃথিবীর বাকি সকলেরই তো দোষত্রুটির উল্লেখ করলে। ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের এই রকম অযথা হর্ন বাজানো বন্ধ করতে পার না?" ট্যাক্সিখানা হর্ন বাজাতে বাজাতেই চলে গেল পাশ দিয়ে। ট্যাক্সিচালকের দোষ স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে রাজী নন সভাপতিমশাই।

"দেখছ না—খালি ট্যাক্সি। ড্রাইভারটার বোধহয় কোন দরকারী কাজ আছে কোথাও। আর আমাদের পথচারীরাও তো সেই রকমেরই!..."

"না না, হাসপাতালের কাছে বলেই বলছি।" স্নায়ুমণ্ডলীর উপর আচমকা যেন সিরিশকাগজের ঘষটানি লাগে।

হঠাৎ ব্রেক কষবার বিদঘুটে শব্দটা কানে এসে বিঁধল। দুজনেই তাকিয়ে সম্মুখের দিকে। সেই ট্যাক্সিখানা!···লোকজন ছুটছে।···চেঁচামেচি হইচই।

দুর্ঘটনা! নিশ্চয়ই লোক চাপা দিয়েছে। অনেকে ছুটছে সেই দিকে। আমরা দুজনও ছুটছি। দেখা যাচ্ছে সম্মুখে ট্যাক্সিখানা।

"গাড়িখানা বাঁদিকেই তো রয়েছে। বাঁ দিক দিয়েই তো চালাচ্ছিল।"

এ হেন সময়েও সভাপতি মশায়ের প্রথমে মনে পড়ল ওই কথাটা। অর্থাৎ তখনও আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে ট্যাক্সি-চালকের কোন দোষ নাই।

ছুটছি। ট্যাক্সিওলাটাকে বাঁচাতে হবে, লোকজনদের হাত থেকে। লোকে মারধর করতে ছাড়বে না—যেমন এসব ক্ষেত্রে হয়। হয়ত ওর গাড়িখানাতেই আগুন লাগাবে। ত্রিবেদী বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, ট্যাক্সি ড্রাইভারটার দুর্দৈবে। বলতে বলতে ছুটছে—"···বেচারার কোন দোষ নেই···ঠিকই বাঁদিক দিয়ে চালাচ্ছিল···বহুদূর থেকে হর্ন দিতে দিতে আসছিল···গাড়ি চাপাপড়া লোকটা হয়ত কানেই শুনতে পায় না··· নিজেরা পথ চলবার নিয়মকানুন মানবে না, আর সমস্ত দোষটা গিয়ে পড়বে ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের উপর। প্রাণপণে ছুটছি ত্রিবেদীর সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য। লোকরা একবার খেপলে তাদের শান্ত করা তখন যে কত শক্ত তা আমার জানা। তবে ত্রিবেদীকে এ শহরের প্রত্যেকে জানে, আর শ্রদ্ধা করে। সে গিয়ে পড়লে ট্যাক্সি-ড্রাইভারটাকে লোকদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিতে পারবে। তার কথা রাখবে সকলে, এ বিশ্বাস ত্রিবেদীর আছে।

এসে গিয়েছি আমরা কাছাকাছি।

"শালারা ঘিরে ধরেছে ড্রাইভারটাকে!"

চাপা, ভাঙা গলার স্বর ত্রিবেদীর। ওর অবিচলিত লক্ষ্য ট্যাক্সিচালকের দিকে, যে লোকটা গাড়ি চাপা পড়েছে তার কথা মনেও আসছে না এখন। লোকটার আঘাত গুরুতর কি সামান্য, লোকটা বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে,

লোকটা পুরুষ না স্ত্রী না শিশু, এ সব কথা এখন গৌণ ; এ সব মনের নীচে তলিয়ে গিয়েছে মুহূর্তের জন্য।

গাড়িখানাকে ঘিরে পাঁচমিশালী ধ্বনির একটা আবর্ত। কে কি বলছে বোঝা যায় না। হাসপাতালের গেটের দিক থেকে একজন কোটপ্যান্টালুন-পরা ডাক্তারবাবু ছুটে এসেছিলেন। এই হট্টগোলের মধ্যেও সবাই তাঁর জন্য সরে গিয়ে পথ করে দিল। সেই ফাঁকে ক্ষণিকের জন্য দেখা গেল আহত লোকটির মাথার দিকটা। ধবধবে সাদা চুলগুলোর মধ্যে দিয়ে একটা রক্তের ধারা বইছে। পৌঁছে গিয়েছি আমরা।

কোলাহলের স্বরবিসঙ্গতির মধ্যে ক্ষণিকের নিস্তব্ধতা। উদগ্র উৎকণ্ঠায়, আর প্রতীক্ষায় সকলে একই সঙ্গে কথা বলতে ভুলে গিয়েছে। ডাক্তারবাবু কি বললেন শুনতে চায়। তাঁর বলা কথার একটি শব্দও যেন ছেড়ে না যায়। কাছে যেতে চায় সকলে—এগিয়ে যেতে চায় যেখানে তিনি পরীক্ষা করছেন আহত লোকটিকে।

"সরে যান আপনারা! সরে যান আপনারা! যদিই বা ইনি এখনও বেঁচে থাকেন, তাহলেও আপনাদের ভিড়েব চাপেই যে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবেন!"

ডাক্তারবাবুর গলা। কথার সুরে আহত লোকটির প্রতি অকুণ্ঠ সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা সুস্পষ্ট।

কে ইনি ?

"আহা! এত বড় ভক্ত মানুষ!"

"এত বড় পণ্ডিত সারা দেশে আর একজন আছেন কিনা সন্দেহ!"

কে ?···কে ?···কে !···কে ইনি ?···

"শাস্ত্রী মশাই। শাস্ত্রী মশাই।"

"আমাদের শাস্ত্রী মশাই ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ! হরিহর শাস্ত্রী। হরিহর শাস্ত্রী।"

"মহামহোপাধ্যায় হরিহর শাস্ত্রী।"

"ভারতীয়-দর্শনের একজন সর্বজনস্বীকৃত দিকপাল।"

"পেন্সন নেবার পর থেকে এখানেই থাকেন যে—গেল ত্রিশ বছর থেকে।"

"কেদারঘাটের কাছে।"

"তাঁকে চেনেন না? কি রকম কাশীর লোক আপনি মশাই?"

"শালারা চোখ বন্ধ করে গাড়ি চালায়!"

শাস্ত্রী মশায়ের সঙ্গে তাঁর একজন শিষ্যগোছের লোক ছিলেন। তাঁর দুঃখই সব চেয়ে বেশী—তিনি সঙ্গে থাকতেও এই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে বলে। কী জবাব দেবেন গিয়ে বাড়ির লোকের কাছে?…তাঁর আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল।……"কি কুক্ষণেই যে শাস্ত্রীমশাই আজ বাড়ি থেকে বার হয়েছিলেন!…কাশীখণ্ডে দেখানো কেদারনাথের এলাকা পার হয়ে, উনি কখনও বিশ্বনাথের এলাকায় পদার্পণ করেননি, গত ত্রিশ বছরের মধ্যে। …ভয়ে।…বলতেন—ঠিক কি—যদি মারা যাই ওখানেই! কাশীখণ্ডে বলা আছে যে কেদারের রাজ্যে মরলে, সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়-শিবলোকে যেতে পারা যায়, কিন্তু বিশ্বনাথের রাজ্যে প্রাণ-বায়ু বার হলে বহু লক্ষ বছর ভৈরব-যন্ত্রণা ভোগ করবার পর তবে অক্ষয়-স্বর্গ লাভ হয়। সাবধানের মার নাই; তাই তিনি আসতেন না এদিকে। বিশ্বনাথ দর্শন করবার চিরকালই সাধ ছিল খুব। কিন্তু সব সাধই কি পুর্ণ হয়! আজ বাবা বিশ্বনাথ তাঁকে টেনেছিলেন। জন্মেব সাধ পুরণ করবার জন্য, তিনি মনের সব দ্বিধা ভয় কাটিয়ে, আজ নিষিদ্ধ রাজ্যে পদার্পণ করেছিলেন।…"

"আহা এত বড় সাধক ভক্ত লোক!"

"বাড়িতে খবর পাঠানো উচিত এখনই।"

জনকয়েক করিতকর্মা লোক এরই মধ্যে ড্রাইভারকে চেপে ধরেছে,—বেশ করে উত্তম মধ্যম দেবার উপক্রম করছে! মুহূর্তের মধ্যে কি যেন ঘটে গিয়েছে আমাদেরও মনে। ক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে ট্যাক্সি-চালককে উদ্ধার করবার কথা ত্রিবেদী পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে—আসল দরকারের সময়। ভুলে গিয়েছে এর দোষ নাই—রাস্তার বাঁদিক দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল—হর্ন বাজিয়েছিল। ভুলে গিয়েছে যে শাস্ত্রী মশাই কানে শুনতে পেতেন না।

ভুলে গিয়েছে যে শাস্ত্রীমশাই হঠাৎ বাঁদিককার ফুটপাথ থেকে নেমে পড়েন রাস্তাটা পার হবার জন্যে। চটে লাল হয়ে ত্রিবেদী এগিয়ে গেল ট্যাক্সি-ড্রাইভারের কাছে।

"চোখ বুঁজে গাড়ি চালাও নাকি তুমি? ষ্টিয়ারিং-হুইল ধরে বসলেই নিজেকে লাটসাহেব বলে মনে হয়—না? তখন আর কোন জ্ঞান থাকে না তোমাদের!"...সভাপতিমশায়ের মুখ থেকে অনর্গল কটুকথার স্রোত বইতে দেখে, ড্রাইভার নিজের সমর্থনে কিছু বলতেও ভুলে গিয়েছে। পালাবার চেষ্টা বৃথা জেনে, বিনা বাধায় নিজেকে সঁপে দিয়েছে ক্ষুব্ধ জনতার হাতে। চারিদিকে অন্ধকার! কোন আশা নেই তার।...এক শুধু যদি পুলিশ এসে পড়ে এর মধ্যে!......জয় বাবা বিশ্বনাথ!......দোহাই বাবা কেদারনাথ!......

বাড়ি ফিরবার পর প্রথম ঠাণ্ডা মেজাজে ভাবলাম জিনিসটাকে। ক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে ট্যাক্সিড্রাইভারটাকে বাঁচাতে গিয়ে কী ঘটে গেল সেই মুহূর্তে? নিমেষের মধ্যে মন বদলে গেল কি করে? ওই মুহূর্তটা, ঠিক তার আগের মুহূর্তগুলোর মত নয়। কী হল? কেন হল? কেমন করে হল? আমার কথা বাদ দাও। নিজের অজানতে ত্রিবেদীর মত লোকের মনের মধ্যেও কি ঘটে গেল? তার এত 'লেকচার', এত কথা, এত যুক্তিতর্ক—সে সব গেল কোথায় তখন? মনোবিজ্ঞানে হয়ত বলবে যে আমরা ক্ষুব্ধ জনতার যৌথমনের আওতায় পড়ে গিয়েছিলাম। বৈজ্ঞানিক হয়ত বলবে যে ওই সময় রক্তের উপকরণ বদলে গিয়েছিল অমুক গ্রন্থির রস নিষ্কাশনের ফলে। আগে হলে, এইটুকু জানতে

পারলেই, আমি আর বেশী জানতে চাইতাম না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওটা উপরের কথা—আরও ভিতরে যেতে ইচ্ছা হয়—আরও পিছনে যেতে ইচ্ছা হয়!···প্রত্যেকেরই এমন এক-একটা মুহূর্তের অভিজ্ঞতা হয়, যে সময় সে জানা-নিজের বাইরে চলে যায়; অজানতে অন্যরকম হয়ে যায়; কী হয়ে গিয়েছিল পরে মনে থাকে না। পরে মনে থাকবার কথাও না—নিজের অজ্ঞাতে হয়েছিল যে। সে সব সময় কী হয়? মন কি অন্য কোথাও চলে যায়? আর-এক জগতের পরশ নয়ত! হয়ত অমনি করে ধরা দেয় আর এক অজানা জগৎ! সেইটাই এগিয়ে আসে আমার দিকে, না আমিই এগিয়ে যাই সেই দিকে, জানা-সীমানা পার হয়ে? আমার উচ্ছল মুহূর্তে সেই সীমানা-পারে যেতেই, সেখানকার উদ্বেল ঢেউ বুঝি আমায় একটু ছুঁয়ে যায়।···ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা যাচ্ছে না—বোঝাবার মত কথা নাই—অথচ কথার মধ্যে ধরতে ইচ্ছা করছে সেই মুহূর্তের সেই জিনিসটা—ঠিক সেই যে জিনিসটা ঘটে। সেই অজানা ব্যাপারটা একটা জানা কথার মধ্যে ফেলতে না পারলে, বাঁধতে না পারলে তৃপ্তি নাই। কথার নাগালের মধ্যে আনলেই, আর ও জিনিসটা অমনভাবে ফসকে যেতে পারবে না। কত কথা খুঁজলাম—ক্ষণাভিসার; চকিতদীপ্তি; আবছা আড়াল; গণ্ডিপার; ঝাঁকি-দর্শন; অলখ-মুখর; আড়ালের জগৎ—আরও কত কথা। কোন কথা, ঠিক যেটা বলতে চাচ্ছি সেইটা পর্যন্ত পৌঁছয় না। 'ক্ষণাভিসার' শব্দটা তবু খানিকটা···না না তবু অপর্যাপ্ত।···একটা মনের মত কথার আড়ালে জিনিসটাকে ফেলতে পারলে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়।

ত্রিবেদীর কিন্তু দেখলাম এসব কোন চিন্তার বালাই নাই। ইউনিয়নের সভাপতির যোগ্য ব্যবহার সে ট্যাক্সিচালকটির সঙ্গে করেনি; তবু সে নির্বিকার।···সে মুহূর্তের ব্যাপারটা সেই মুহূর্তেই শেষ হয়ে গিয়েছে; তা নিয়ে আবার মাথা ঘামানো কেন!···

তার সঙ্গে আর এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছা হল না। বুঝবে না। স্বীকার করবে না সে। অনর্থক চেঁচামেচি বাড়িয়ে লাভ কি!···

তোমাদের হয় কিনা জানি না—আমার উপর এক-এক সময় এক-একটা কথা ভর করে। দাড়ি কামাবার সময়, তেল মাখবার সময়, স্নান করবার সময়, বা অন্য অনেক সময় হাবিজাবি ভাবতে ভাবতে, নিজের অতর্কিতে বলে ফেলি সেই কথাটা। একা থাকলেই এ জিনিসটা হয় বেশী; তবে অন্য লোক উপস্থিত থাকতেও, কথাটা মুখ থেকে আচমকা বেরিয়ে যাওয়ায়, কখন যে অপ্রস্তুত হতে হয়নি তা নয়। তোমরাই তো কত সময় এ নিয়ে হাসাহাসি করতে। কথাগুলো কিছুদিন পর পর বদলায়। অজানতে বদলায়। কিন্তু কি করে, কবে থেকে একটার বদলে আর একটা কথা আসে, তা এর আগে কখন খেয়াল করিনি। এইবার প্রথম নজরে পড়ল। মোটর দুর্ঘটনার দিনকয়েক পর লক্ষ্য করি যে 'ক্ষণাভিসার' শব্দটা এরই মধ্যে আমার উপর ভর করেছে। বেশ কথাটা। অতর্কিতে বেরিয়ে গেলেও, ওর শেষের দিককার ধ্বনির ঝঙ্কারটা কান দিয়ে ঢুকে মনের কোন সুপ্ত তন্ত্রীতে সাড়া জাগায়। আবার সজ্ঞানে বললেও ক্ষণিকের জন্য অভিনব কি একটা জিনিস যেন কাছে এসে যায়।—উচ্চারণের ধ্বনির বাইরের, শব্দার্থের বাইরের; অথচ সেই-দিনকার-ভাবা 'আর এক জগৎ', 'মুখর আড়াল' প্রভৃতি কথাগুলোর সঙ্গে যেন কোথায় একটা দূর সম্পর্ক আছে জিনিসটার।

খাইদাই, অহল্যাবাই-ঘাটে গিয়ে মাঝে মাঝে বসি, আবার বাড়িতে এসে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ি। কোন কিছুতে মন বসে না। খবরের কাগজটা পর্যন্ত পড়া হয়ে ওঠে না। অদ্ভুত এক মানসিক অবস্থা। ইতিমধ্যে রেণুর চিঠির পর, বউদির চিঠি পেয়েছি। বউদি চিঠি লেখেন কম। দাড়িওলা-মহাত্মা

ওখান থেকে হঠাৎ চলে যাওয়ার খবর দিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন মাসকয়েক আগে। তারপর এই চিঠি। লম্বা চিঠি।

"ঠাকুরপো, আমাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক কি তুলে দিলে? আমার আগেকার চিঠিখানার জবাব দেবার দরকারটা পর্যন্ত মনে করলে না! আমি কিন্তু দরকারে পড়েই লিখছি! নিজের দরকারে নয়, নাতির দরকারে। নাতি ফিরেছেন। ফিরবে না তো যাবে কোথায়! ও বেচারার জায়গা জমির একটা বিহিত না করলে চলছে না। সে পারো এক তুমিই। আর সকলে তো দেখি মুখের উপদেশ দিয়েই খালাস। বুড়ো নিরাপদবাবু পর্যন্ত। দেখ দিকি অবিচার, অতটুকু ছেলের উপর! আর এক খবর। সুখবর। মণি নিতে আসছে রেণুকে, কয়েক দিনের মধ্যেই। সে সব অনেক কথা। এলে পরে শুনবে। যার কপালে যা লেখা আছে, তা ভোগ করতেই হবে। এলে রেণুর সঙ্গে দেখা হত, যাওয়ার আগে। এখানকার অন্যান্য খবর সব ভাল। আসছ কবে। আমাদের টানে না আস, তোমার বাগানের গাছগুলোর টানেও তো আসতে হয়। এবার রেণু চলে গেলে সেগুলোকে গরমের সময় জল দিয়ে বাঁচাবে কে?···এই খানিক আগেই জামা-কাপড় কেচে, বালতির সাবানগোলা জলটা খিড়কির দুয়োরের পাশের তোমার সেই পাতাবাহারের গাছটাতে দিয়ে এল। পাতাবাহারের গাছ বড় হলে আবার কেউ কোনদিন জল দেয় নাকি? রেণু বলে যে তুমি নাকি বলেছ যে সাবানগোলা জলে পাতার রঙ খোলে। জানিও না, বুঝিও না, ওসব। তবে মোটমাট কথা হচ্ছে যে, চলে আসবে। নইলে আমাদের নাতিটা পথে বসবে। বসবে কি, বসেছে। এখানে মন না টেকে, আবার চলে যেও কাজ হয়ে গেলে। আসবে! আসবে! আসবে। তোমার সাধন ভজন তীর্থ ধর্ম আমরা কেড়ে নিতে যাচ্ছি না।"···

একেবারে জোর তাগিদ। বউদির নাতি হচ্ছেন রামধনীর পালিত ছেলে রঘুয়া। ছোট থেকে বউদিদের ওখানেই মানুষ। রেণুকে মাইয়া বলে ডাকত;—রামধনী শিখিয়েছিল। সেই সূত্রে ও হয়ে যায় বউদির নাতি। আমিও বাড়িতে আসা থেকে ও ছোঁড়াটাকে কিছু কিছু দিতাম, মাসে মাসে।

আমার ফাইফরমাশ খাটত, ঘরদুয়োর ঝাঁট দিয়ে দিত। সে যা ছেলে! তার জন্য দুশ্চিন্তা করে লাভ নাই। তবে রামধনী মারা যাবার পরও যে তার জন্য দুশ্চিন্তা করবার লোক আছে, একথা বোঝা গেল বউদির চিঠি থেকে। আমার ধারণা হল যে রেণুই ওই চিঠি লিখিয়েছে মাকে দিয়ে। নইলে বউদি যে রঘুয়াটার উপর হাড়ে চটা চিরকাল। কিছুদিন আগে চিঠিতে জানতে পেরেছিলাম যে, ছোকরাটা না বলে, উধাও হয়েছে কোথায় যেন। আবার ফিরেছে তাহলে রঘুয়া। রেণুর সেই মনিঅর্ডার কুপনে লেখা চিঠিখানার জবাব দেওয়া হয়নি বলেই বোধহয় সে নিজে চিঠি দেয়নি। যাক! মণি আবার তাকে নিতে আসছে—এ একটা সুখবর! এতকাল তো একখান চিঠি দিয়েও খোঁজ নেয়নি। মণির দেওর পটলা সে-ই তবু শুধু মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নিত! বুঝি যে সব মিলিয়ে, এখন একবার বাড়ি যাওয়া দরকার। এখানেও আর বিশেষ ভাল লাগছে না। বাড়িতেও জানি ভাল লাগবে না। তবু একবার যেতে হয়। আমি সেখানে না থাকবার সময় গত আট-দশ বছর থেকে আমার গাছপালাগুলোর দেখাশোনা রেণুই করে এসেছে। এবার সে সুবিধাটুকু ঘুচল। ঘুচুক, তাতে দুঃখ নাই!

রঘুয়াটার কথাই ঘুরে ফিরে মনে হতে লাগল। এ গোলমাল যে একদিন লাগতে পারে, একথা পাড়ার লোকে ভাবেনি কোনদিন। ওর জন্মের ইতিহাস জান তো! সকলেই জানে। তবে আমার মত খুঁটিয়ে জানা আর কারও পক্ষে বোধ হয় সম্ভব নয়। আমাকেই এসে ধরে পড়েছিল কিনা মুনিয়া আর মুনিয়ার মা। কত কালের কথা হল!…

কাশী আর ইলোরার ব্যাপার দুটোর পর আমি তখনও মুহূর্তগুলোকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। তাই মুনিয়ার সেই সঙ্কট-মুহূর্তটাকে মনে মনে খাড়া করবার চেষ্টা করি। আমার কাছে এসে কেঁদে পড়বারও আগের কথা সেটা।

পথচলতি উছল হাসিখুশির মধ্যে যেন খেজুর কাঁটা ফুটল আচমকা। হঠাৎ খটকা লেগেছে। মুনিয়ার মনে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। আতঙ্কে।

…না না! তা কেন হতে যাবে!

নিজেকে আশ্বাস দিতে চায় সে; কিন্তু মন মানে কই। রক্ত হিম হয়ে আসে। বুকের ভিতরের ভারি ভারি ভাবটা আস্তে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। কোন সাড আর যেন নাই শরীরে। তার নিরীহ গোবেচারা স্বামীর চোখ-পচানি চেহারাটা চোখের সামনে ফুটে ওঠে। ওই মিনমিনে লোকটাকে সে কোনদিন মানুষের মধ্যে গণ্য করেনি; আজ হঠাৎ ভয় ভয় করে তাকে। সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি ভেসে ওঠে লাল-কাপড়-পরা, দাড়ি-গোঁফ-জটাওলা অঘোরীবাবার পেশীবহুল লম্বা চওড়া চেহারা। মনে পড়তেই রিরি করে উঠল সর্বশরীর এখন। চোখের পাতা নেমে আসতে চায় আপনা থেকে, নিজের কাছে কুণ্ঠায়।… সন্ন্যাসী না ছাই! অঘোরীবাবা না ছাই!…কোথা থেকে যে মা এগুলোকে জুটয়!…

সব দোষটা মা'র উপর চাপাতে ইচ্ছা করে; কিন্তু চেষ্টা করেও নিজের চোখে নিজের দোষ কাটে না।…মা তো তাকে এখানে আসতে বলে না। সে নিজেই তো শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে আসে। মা বরঞ্চ বারণ করে আসতে।…

মা আছে ওদিককার খেজুরপাতার চাটাইখানার উপর। উরুতের ঘাখানায় কবিরাজ মশায়ের দেওয়া চালমুগড়ার তেল লাগিয়ে, অনেকক্ষণ থেকে বসে ছিল। প্রত্যহ দুপুরে ঘাখানাকে জবজবে করে তেলে ভিজিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে, আর সময় কাটাবার জন্য কবিরাজকে গালাগালি

দেয়। এইবার সেটাকে ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে বাঁধছে।⋯ বেঁধেই বা কি! চলাফেরা করবার সময় কিছুক্ষণের মধ্যে আলগা হয়ে খসে খসে পড়ে পা গলিয়ে! পথে ঘাটে লোকজনের সম্মুখে কখন কখন অপ্রস্তুতের একশেষ হতে হয়।⋯

"ওরে ও মুনিয়া, ঘুমুলি না কি? এই না আজ সকালে কথা দিয়ে এসেছিস নিরাপদবাবুর ছেলের বউকে, খেজুর পাতার চাটাই বোনা শিখিয়ে দিবি, দুপুর বেলায়। যাবি তো ওঠ! কি! সাড়া দিচ্ছিস না যে বড়।"

"ইচ্ছা করছে না এখন যেতে।"

"কি কুড়েই যে হয়েছিস!"

"এখন কারও আসবার কথা আছে নাকি?"

কথাটা মাকে ঠেস দিয়ে বলা। মা'র উপর মনটা বিরূপ হয়ে রয়েছে, এটা তারই জের। মা'র কাছে নানারকমের লোকজন আসে—তাদের সঙ্গে মায়ের নানারকমের কারবার—বহুরকমের লেনদেন, লুকোচুরি, সলাপরামর্শ, ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপার—গুজগুজ করে চলে কথা—কথা কাটাকাটিটা পর্যন্ত হয় চাপা গলায়। সে সব সময় মা তাকে ছুতোনাতায় একটু দূরে দূরে রাখতে চায়। তারই দিকে ইঙ্গিত মুনিয়ার কথার।

শুনে মায়ের গা জ্বালা করে; কিন্তু গায়ে জ্বলুনি ধরলে হবে কি—কথাটা যে সত্যি। তাই চেষ্টা করে কথার স্বর মোলায়েম করতে হয় মুনিয়ার মাকে।

"বাঃ! বেশ খোঁচামারা কথা বলতে শিখেছিস তো দেখছি আজকাল! কাল সারারাত জেগেছি; আজ রবিবারের উপোস—নইলে আমি নিজেই যেতাম নিরাপদবাবুদের বাড়িতে।"

কাল শনিবার গিয়েছে। প্রতি শনিবারের রাত্রিতে অঘোরীবাবা আসে। মদ খায়; গাঁজা টানে; পুজো করে, মন্ত্র পড়ে বিড় বিড় করে। নতুন মালসায় মন্ত্রপুত চাল, কলা, সিঁদুর, সিঙিমাছ আরও কি কি যেন সাজিয়ে দেয়। মুনিয়ার মা নিশুতি রাতে সেই মালসাটা চৌমাথায়

মোড়ে রেখে দিয়ে আসে—নিজের রোগ যাতে অসতর্ক পথচারীদের উপর চলে যায়, সেই উদ্দেশ্যে।·· এখনও ঘরের চালের বাতায় গোঁজা গাঁজার কলকেটা মুনিয়া দেখতে পাচ্ছে। অঘোরীবাবার জন্য মা ওটাকে আলাদা করে রেখেছে; আর কারও ছোঁবার হুকুম নাই।···ইচ্ছা করে যে টান মেরে ঘর থেকে বাইরে ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এই মুহূর্তে···। কিন্তু সে বুকের পাটা যে নাই!···

"হয়েছে হয়েছে! এখন থামো! কানের কাছে ভ্যাজর ভ্যাজর ভাল লাগে না! রাত জেগেছ তো আমার মাথা কিনেছ!"

মুনিয়ার মা'র জিভের ধার কম নয়। চেষ্টা করেও সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না।

"পেটের সন্তান দেবে এমনি করে মুখ-ঝামটা! নিজের মাকে! তুই যে আঁটকুড়ী; নইলে বুঝতিস, পেটের সন্তানের কাছ থেকে এই ব্যবহার পেলে, কী করতে ইচ্ছা করে! দেবো ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। যা—স্বামীর ঘরে মন টেকে না, যা যেখানে মন চায়! আসিস কেন এখানে মরতে—ঘুরে ফিরে—বারবার? কত খোয়ারই যে আছে তোর কপালে, সে আমিই জানি! ওরে ও আঁটকুড়ী, আমি আরও দু-দুটো ছেলে পেটে ধরেছিলাম; তারা বেঁচে থাকলে, আজ কি তুই এমন সব কথা আমাকে শোনাতে সাহস করতিস? পেটের সন্তানের চেয়ে বড় শত্রু, মানুষের কেউ নেই রে কলিযুগে!"······

মায়ের কটুকথার স্রোত একবার আরম্ভ হলে তাড়াতাড়ি বন্ধ হবার নয়, সেকথা মুনিয়া জানে। এখন থামাবার চেষ্টা করা বৃথা—সে স্পৃহাও তার নাই। ভাল করে শুনছেও না, সব কথাগুলো। মন আটকা পড়েছে মায়ের গালাগালির দু-একটা কথায়···পেটের সন্তানের চেয়ে বড় শত্রু মানুষের কেউ নেই রে কলিযুগে!···কথাটা গিয়ে বিঁধছে মনের মধ্যে।···মা তাকে আঁটকুড়ী বলে গালাগালি দিয়েছে। পেটের সন্তানকে আঁটকুড়ী বলে গালাগাল দিতে মায়ের বাধেনি। অন্যদিন হলে সে এই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিত। আজ কথাটা মোটেই খারাপ লাগছে না।···হে ভগবান, তাই যেন হয়! মায়ের দেওয়া গালাগালটাই যেন সত্যি হয়!···নাক মোছবার শব্দ কানে

আসছে। বোঝা যাচ্ছে যে গালাগালির স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মায়ের চোখের জল বইছে।

"মাথাটা ধরেছে বলে একটু শুলাম; তা তুমি চীৎকার করে অনর্থ বাধালে!"

কান্না থামল।

"শরীর খারাপ? তা বললেই তো হয়। বলিসনি তো আমাকে সে কথা।"

"একটু মাথা ধরেছে; তাই আবার পাড়ায় পাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে বেড়াতে হবে নাকি।"

"আচ্ছা বলো! আমি হলাম পাড়ায় পাড়ায়! আমি হলাম বাড়ি বাড়ি? বলারও তো একটা সীমা আছে!"

আবার আরম্ভ হল। মুনিয়া চাদরখানা দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে নেয়। যত পারে চীৎকার করুকগে মা!...এবার মায়ের খেদোক্তি নূতন পথ নিয়েছে।...

পুরনো ধুয়োটা কিন্তু ঠিক বজায় আছে।...'পেটের সন্তানের চেয়ে বড় শত্রু মানুষের কেউ নেই রে আর পৃথিবীতে।' এই কথাটাকে ভাষার রদবদল করে নানা ভাবে বলা। যতই মাথা মুখ ঢাকো কানে আসবেই আসবে। যতবার শোনে, শিউরে ওঠে গা মুনিয়ার।

ভেবে কূলকিনারা পাওয়া যায় না।...যদি তাই হয়!...তা হলে কি হবে!...

এতবড় সমস্যা জীবনে কখনও তার সম্মুখে দেখা দেয়নি।..না না একটা উড়ো আপদের কথা ভেবে নিয়ে সে বৃথাই মন খারাপ করছে!...

ধুত্তোর ছাই! বৃথাই চাদর মুড়ি দেওয়া। মুনিয়া টান মেরে ফেলে দিল চাদরখানাকে। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘরের চালে তোলা 'সাতপুতিয়া' শিমের লতা। এক এক থোকায় অনেকগুলো করে ফলে বলে এর নাম 'সাতপুত্তুর' শিম। মা ষষ্ঠী বড় ভালবাসেন এ শিম খেতে।...এ শিমের সরষেবাটা-দেওয়া আচার খেতে সেও খুব ভালবাসে।...কিসে থেকে

কি হয় কে জানে!···ছটপরবের সময় মা ষষ্ঠীকে খুশী করবার জন্য সবাই লাউশাক খায়। নিয়ম—তাই সেও খেয়েছিল।···কেন মরতে খেতে গিয়েছিল! প্রথম যেদিন অঘোরীবাবা তার সঙ্গে হেসে কথা বলেছিল, তখনই যদি সে গম্ভীর হয়ে যেত!···যদি সে শ্বশুরবাড়ি থেকে এবার পালিয়ে না আসত!···

'শত্রু···পেটের সন্তানই সবচেয়ে বড় শত্রু কলিকালে!'···

"চিঠ্ঠি"!

চমকে উঠেছে দুজনেই। ডাকপিয়নসাহেব এসেছেন উঠনে। ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। তাড়াতাড়ি কাপড় সামলে নিয়ে মুনিয়ার-মা ওঠে। মুনিয়াও। বাইরে এসে দাঁড়াল দুজনে। দুজনেরই চিঠির নামে বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠছে। এ পাড়ায় ডাকপিয়নসাহেব আসেন কালেভদ্রে। চিঠি আবার কে দিল?···চিঠি তো এর আগে কখনও এসেছে বলে মনে পড়ছে না!···

উঠনের লাউমাচাটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে ডাকপিয়ন। "বাঃ বেশ লাউ ধরেছে তো! অগুনতি কচি কচি জালি পড়েছে দেখছি!"

জবাব দেবার দরকার ছিল না; কিন্তু একটা কথাও পড়তে পায় না মুনিয়ার-মায়ের কাছে। তার উপর ডাকপিয়নসাহেবের খাতিরেও কিছু বলা দরকার।

"মেয়ে পুঁতেছে। লাউ—ভাগ্য চিরকালই দেখি ভাল ওর। কিন্তু কলিযুগে পাঁজি পুঁথির লেখা আর ফলে কই! ডাকপিয়ন সাহেব, চিঠি কার নামে?"

"তোর।"

"কে লিখেছে?"

কৌতূহলের চেয়ে ভয় অনেক বেশী। চিঠি যখন, তখন খারাপ খবর নিশ্চয়ই। ফ্যাকাশে হয়ে যায় তার মুখ চোখ।

"তা আমি কি করে জানব।"

তেওয়ারী কনস্টেবলকে দিয়ে চিঠি পড়াতে গেলে সেই সন্ধ্যার আগে আর

হবে না। তাই ডাকপিয়ন সাহেবকে একটা লাউ কবলে, মুনিয়ার মা চিঠিখান পড়ে দিতে বলে।

অযোধ্যা থেকে চিঠি লিখেছে জামাই। বেশ গুছিয়ে লেখা—কাকে দিয়ে যেন লিখিয়েছে। খবর দিয়েছে যে মাসতিনেক হল সে আবার বিয়ে করেছে। বিয়ে না করে আর উপায় কী ছিল তার। মুনিয়া তো স্বামীর ঘর করবেই না ঠিক করেছে। কেন, সেকথা সে-ই জানে। গতবার যখন স্ত্রীকে নিতে এসেছিল, তখন স্ত্রী দেখা পর্যন্ত করেনি; রাতে সইএর বাড়িতে শুতে গিয়েছিল। এসব তো সকলেরই জানা। দোষ সে কাউকে দেয় না। দোষ কপালের। কিন্তু মরবার সময় মুখে জল দেবার জন্য, আর মরবার পর মুখাগ্নি পাবার জন্য দরকার ছেলের। সেই জন্যই সে আবার বিয়ে করেছে। বিয়ের পর সে যখন প্রথম শ্বশুরবাড়িতে আসে তখন সে শাশুড়ীর কথাতেই গিয়েছিল এখানকার সতীথানে ইট বাঁধতে। কিন্তু কী হল? ইট বেঁধে কী ফল হল? সেমাপুরের সন্ত মিহিদাস সন্তানার্থে তাকে আবার বিয়ে করতে বলেন। তিনি বলেছিলেন বিয়ে করবার পর নতুন বউকে নিয়ে কিছুকাল অযোধ্যাজীতে থাকতে; তা হলে স্ত্রীভাগ্য ভাল হবে। তাই অযোধ্যাজীতে সস্ত্রীক আসা। রামনবমী পর্যন্ত থাকবার ইচ্ছা। সন্ত মিহিদাসের আর একটা আদেশ পালনের জন্য এই চিঠিখানা আপনাদের দেওয়া। তিনি আপনাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিতে বলেছিলেন যে আপনার মেয়ের জন্য আমার দরজা খোলা রইল; যদি কখন আসতে চায়—তাহলে নিজের সংসারে ফিরে আসতে পারে।···

জামাই-এর আবার বিয়ে করবার খবর একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। তবু শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল মুনিয়ার—মা। ডাকপিয়নসাহেব একটার জায়গায় দুটো লাউ নিয়ে চলে গেলেন, সেদিকে তার খেয়াল নাই। কিন্তু চিঠির এত বিন্যাস-করা কথার মধ্যে, মুনিয়ার মনে গিয়ে গেঁথে গেল একটা মাত্র কথা। আবার বিয়ে করবার কথাটা নয়; সতীথানে ইট বাঁধবার কথাটা।

···নদীর ধারে সতীথান আছে না? ভারী জাগ্রত। কোনকালে যেন

সতীমা স্বামীর চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই জায়গাটায়। তারপর স্বর্গ থেকে পুষ্পক রথ নেমে এসে, জলন্ত চিতা থেকে তাঁদের দুজনকে তুলে নিয়ে যায়। ঠিক সেইখানটায় এখন আছে তাজা তেল—সিঁদুর-মাখানো একটা বেদী। তার উপর পোঁতা উঁচু বাঁশের সঙ্গে লাল তিনকোণা নিশান টাঙানো। এত উঁচু যে পাশের বুড়ো বটকেও ছাড়িয়ে উঠেছে। ও নিশান বহুদূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। বট গাছটাই কি কম প্রাচীন নাকি? গাছ থেকে নামা কয়েকটা ঝুরি এত মোটা যে এয়োস্ত্রীরা দুই হাতের বেড়ে নাগাল পায় না। বটের আওতার ঠিক বাইরেই একটা ঘর উঠেছে কিছু কাল হল। অঘোরীবাবার ঘর। অঘোরীবাবা বছর কয়েক আগে এই বটতলায় প্রথম আস্তানা গেড়েছিল। লোকটা করিতকর্মা; বেশ গুছিয়ে নিয়েছে এরই মধ্যে। পুজার্থিনীদের সুবিধার জন্য, পাশেই আর একখান দেওয়াল গাঁথা হচ্ছে। বাঁশের ভারা বাঁধা থাকে বারোমাস। রাজমিস্ত্রীরা নিজেদের সুবিধামত মাঝে মাঝে এক আধঘণ্টা বিনা পয়সায় সতীমায়ের কাজ করে দিয়ে যায়। করবে না? সতীমায়ের কৃপাতেই যে তাদের ছেলেপিলেয় ভরা বাড়-বাড়ন্ত সংসার!

বটগাছটার কাছে গেলে দেখা যায় যে গুঁড়ির কোটরে কোটরে, শাখা-প্রশাখার খাঁজে খাঁজে, ঝুরির বিনুনিগুলোর ফাঁকে ফাঁকে, সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায়, অসংখ্য ইট বাঁধা; এলোমেলোর মধ্যেও একটা যেন সাজানো গোছানো ভাব। মেয়েরা সন্তান কামনা করে ওখানে ইট বেঁধে আসে। মনস্কামনা পুর্ণ হবার পর, সতীথানে পুজা দেবার আগে, ইটখানা খুলে নামিয়ে রাখে। নীচে নামানো ইটের পাহাড় দিয়েই অঘোরীবাবা ঘর তয়ের করিয়েছিল।

…স্বামীর চিঠিখান মনে পড়িয়ে দিল, তাদের সতীথানে ইট বাঁধবার কথাটা। বাঁধবার পর কিছুদিন ইটখানা ছিল কত ভয়ভক্তির লক্ষ্য। তারপর অপ্রয়োজনীয় বোধে কথাটা কবে থেকে যেন মন থেকে সরে গিয়েছিল কথাটা।

…ছি ছি ছি! কি কাণ্ডই সে করেছে! কেন মরতে সে সতীথানে ইট

বাঁধতে গিয়েছিল! কেন সে উঠনে লাউগাছটা পুঁততে গিয়েছিল! কেন সে শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে গিয়েছিল! কেন সে সাতপুত্তিয়া শিমের চারাগুলো ছোটতেই উপড়ে ফেলে দেয়নি!…কেন?…কেন?…কেন?…

আগেকার করা প্রত্যেক কাজ, ঘটে-যাওয়া প্রত্যেকটা ঘটনা, ভেবে-নেওয়া প্রতিটি চিন্তার উদ্যত সূচিমুখ ছিল তারই দিকে! এতদিন নজরে পড়েনি, বোঝা যায়নি! গাছপালা, ইটপাটকেল, ঠাকুর দেবতা, সাধুসন্ন্যাসী, ফলমূল, জিনিসপত্র সব তার বিরুদ্ধে! এই বিস্বাদ পৃথিবীটার প্রতি অণু-পরমাণু তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে! নইলে আজকের মত বিমুখ দিনেই, যে স্বামী কোনদিন চিঠি লেখে না, তার চিঠি আসবে কেন! চিঠিখানা অন্যদিনও তো আসতে পারত! চিঠিখানায় সতীথানের কথাটাই বা লেখা হয়ে যাবে কেন? লেখা না থাকতেও তো পারত! ভগবান নারাজ হলে এমনিই হয়! চারিদিক অন্ধকার! কোন উপায় নাই এই কানাগলি থেকে বার হবার!…মা কি যেন বলছে।…

হঠাৎ!…পথের হদিশ! হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখতে পেল সে।…বিপদের মুখে রামচন্দ্রজী-ভগবান পথ দেখিয়েছেন, অযোধ্যাজী থেকে পাঠানো চিঠিখানার মধ্যে দিয়ে!…ঠিক তাই! ওই জন্যই চিঠিখান এসেছে!…

হেঁচকা টান মেরে মুনিয়া লাউমাচার একখানা লম্বা বাঁশ বার করে নিতে গেল। মডমড করে পুবনো নডবডে মাচাটা ভেঙে পড়ে।

…পড! পড়! ভেঙে চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যা!…

…"অ্যাঁ! ও কি করিস মুনিয়া!"—হাঁ হাঁ করে ওঠে মুনিয়ার মা

…মাচার বাঁশ লম্বায় এত ছোট তা আগে আন্দাজ করতে পারা যায়নি। …আর একেবারে ঘুণধরা পচা! এতে হবে না। আরও মজবুত জিনিসের দরকার। আরও লম্বা জিনিসের দরকার। কিছু পাওয়া যাচ্ছে না হাতের কাছে! …এক এই উথলি-সামাটটা ছাড়া। এতেই হবে; এই সামাট

দিয়েই হবে, এর চেয়ে মজবুত জিনিস পাবে কোথায় ; কিন্তু এও যে নেহাত ছোট হবে ; উথলিটাকেও তাহলে নিতে হয় সঙ্গে।···

মাথায় উথলি, হাতে সামাট—পাগলের মত বেরিয়ে গেল মুনিয়া।

"ওরে ও মুনিয়া! ও কি! কোথায় যাস অমন করে? শোন! শোন!"

মায়ের কথা মুনিয়ার কানে গেল বলে বোধ হল না। ছুটে চলেছে সে। প্রতি মুহূর্তের মূল্য আছে তার কাছে এখন। সতীথান মনে হচ্ছে কত দূর। আর একটু কাছে হল না কেন! অত উঁচুতে—নাগাল পাবে তো? উথলির উপর চড়ে, এই সামাটটাকে দিয়ে? এই জন্যই উথলিটা নেওয়া। ইটটা সে বেঁধেছিল অনেক উঁচুতে; মইয়ের উপর চড়ে। অঘোরীবাবার ঘরে মিস্ত্রীদের কাজ চলছিল তখন। সেইখান থেকেই তার স্বামী এনে লাগিয়ে দেয় মইখানাকে, বটগাছের ডালের সঙ্গে। হাসতে হাসতে বলেছিল—সব চেয়ে উঁচুতে বাঁধতে হবে। পুজো দিতে এসে কেউ যদি আবার ভুলে তার বাঁধা ইটখানা নিজের ভেবে নামিয়ে নেয়—তাই তাদের ছিল এত সতর্কতা। স্বামী মইখান ধরেছিল। বলেছিল—দেখিস, সতীমায়ের গাছের ডালে পা লাগাস না যেন! খবরদার! ···নিজের ইটখানাকে সে দেখলেই চিনতে পারবে। মস্ত থান ইট—একদিকে গর্তর মধ্যে ঢ্যারাকাটা দাগ—নিরাপদবাবুর ছেলে, ওই যে ঠিকেদারবাবু আছেন না, তাঁদের পাঁজার ইটের চিহ্ন, ওই ঢ্যারাকাটা দাগ। ···স্পষ্ট মনে আছে। খাটিয়ার পায়ার নীচ থেকে একখান ইট বার করে মা দিতে গিয়েছিল জামাইএর হাতে। জামাই তো চটে আগুন—যে ইটের উপর শোবার বিছানা পাতা হয় প্রত্যহ, সেই ইট পৌঁছতে চাচ্ছে সতীমায়ের দরবারে? এটুকু আক্কেল মেয়েমানুষের থাকা উচিত! ···তখন মা ছুটে গিয়ে ওই আনকোরা ইটখানা নিয়ে আসে নিরাপদবাবুদের পাঁজা থেকে। ··ইট বাঁধবার জায়গাটা তার ঠিক মনে আছে। ডালের সেখান থেকে একটা ঝুরি নেমেছে। তারই খাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। গত চার বছরে, ঝুরিটা নিশ্চয়ই মোটা হয়ে চেপে ধরেছে থান ইটখানাকে। ···যদি সামাটের ধাক্কায় না পড়ে? যদি কেটে বার করতে হয়। তা হলে দা পাবে কোথায়? মই পাবে কোথায়। মই না পেলে ক্ষতি নাই—গাছে

সে চড়তে পারে—বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত সে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে গাছে চড়ার খেলা 'ঝাল-ঝুপ্পা' খেলেছে—আজ আর সতীমায়ের গাছের ডালে পা লাগবে বলে সে ভয় করে না—সতীমা তার উপর বিরূপ হলেই সে আজ বাঁচে। —কিন্তু একখান দা'র দরকার যে এখনই! এই মুহূর্তে।

হয়ত সতীমায়ের আশীর্বাদ এখনও পায়নি সে। চায় না সে সতীমায়ের দয়া! আশীর্বাদ পাবার আগেই সে ইটখানাকে নামিয়ে নিতে চায়। বিপদ থেকে রক্ষা পাবার তার একমাত্র পথ সময় থাকতে ইটখানাকে খুলে নেওয়া!—

—অঘোরীবাবার ঘরখান এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। সন্তানবতী স্ত্রীলোকদের সফল কামনার প্রতীক ওই ঘরখান; গাঁথনির প্রত্যেকটি ইটে সতীমায়ের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা মেশানো। সতীমায়ের আশীর্বাদ-নিষিক্ত ইটগুলি দিয়ে ঘরটা তৈরী; সেইজন্য ওদিকে তাকাতে ভয় করছে। —ঘরের প্রত্যেকটা ইট তার শত্রু। ভয় দেখাচ্ছে! সিঁদুর-মাখানো বেদীটাও তাকে চোখ রাঙিয়ে শাসাচ্ছে। বাঁশের ডগায় লালরঙের তিনকোণা নিশানটাও। সতীথান এত জাগ্রত বলেই তো ভয়।—ইট বাঁধবার সময় গাছের ডালে পা ঠেকে গেলেই বেশ হত!—দোহাই সতীমা আমার উপর সত্যিকার রাগ করে আমার ইটবাঁধা বিফল করে দাও!—

এতক্ষণে গাছে বাঁধা ইটগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওগুলির একখানির পিছনেও কি কোন বন্ধ্যার বুকের দুরু দুরু লুকানো নেই?—বাঁধা ইট সকলে খোলে সাফল্যের গর্বে, কিন্তু সে—?

গাছতলাতে গিয়ে মুনিয়া মাথা থেকে উদুখলটা নামাল।

—কিন্তু কই! কই তার নিজে হাতে বাঁধা সেই ইটখানা? নেই তো! কি হল? কে যেন নামিয়ে নিয়েছে; সেখানকার গাছের ছাল ছেঁড়া ছেঁড়া, রস গড়াচ্ছে দুধের ধারার মত! শুধু তারটা কেন, পুরনো ইট একখানাও বাঁধা নেই গাছে। গাছের গায়ে অনেক জায়গাতেই তাজা ক্ষতের দাগ। অনেকদিন আগেকার বাঁধা হলে ইটে শ্যাওলা ধরে—গাছের ছাল কেটে চেপে বসে ইটের উপর—তা কি সে জানে না। যে ইটগুলো গাছে এখন

রয়েছে সেগুলো সব যেন আলগা ভাবে রাখা; আলগোছে বসানো; একটা বর্ষাও কাটেনি বোধ হয় ওগুলোর উপর দিয়ে; সব ইদানীংকার বাঁধা!—ভয়ে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল তার!—আবার দেখে।—আবার ভাল করে দেখে—যদি কোন রকমে নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকে—যদি হঠাৎ নজরে পড়ে যায়।—উপর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ফেটে গেল।—কে তার সঙ্গে শত্রুতা করল? তার রক্ষা পাবার একমাত্র পথ বন্ধ করে কে নামিয়ে নিল ইট? দম বন্ধ হয়ে আসছে।—জিজ্ঞাসা করতে কি পারে—কথা আটকে যায়—গোঁফ-দাড়ির ফাঁকে হাসি নিয়ে অঘোরীবাবা এগিয়ে আসছে, হাতে-সামাট মুনিয়ার দিকে—কি যেন একটা রসিকতাও করল যেন হাতের ওই সামাটটাকে নিয়ে। চোখ নেমে এল মুনিয়ার মাটির দিকে। প্রাণপণ চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করে সে—"আমার ইট কে খুলে নিল?"

অঘোরীবাবা প্রথমটায় বুঝতে পারল না প্রশ্নটা; তবে ব্যাপারটা যে হালকা হাসিখুশির নয়, তা ধরতে পেরেছে সঙ্গে সঙ্গেই! পরমুহূর্তেই একটা দোষী-দোষী ভাব ফুটে উঠল তার চোখমুখে।

বন্ধ্যা নারীদের অভিশাপ মেশানো বহুদিন আগেকার বাঁধা ইটগুলো সতীথানের খ্যাতির অন্তরায়, দেখলেই লোকে বুঝে যায় যে অতগুলি ক্ষেত্রে সতীমায়ের মাহাত্ম্য নিষ্ফল হয়েছে। তাই অঘোরী-বাবা মাঝে মাঝে বাতদুপুরে গাছ থেকে পুরনো ইটগুলো নামিয়ে রাখে—বিশেষ করে রাজ-মিস্ত্রীরা যখন সতীথানের ঘর তয়েরের কাজে হাত দেয়, তখন। এই তো কাল রাত্রে মুনিয়ার মায়ের বাড়ি থেকে আসবার পর, অনেকগুলো পুরনো ইট নামিয়ে নিয়েছে সে। সবচেয়ে উঁচু ডালের ইটখানা গাছের ছাল চেঁছে তবে বার করতে পেরেছিল! কিন্তু সে কথা তো বলা যায় না মুনিয়ার কাছে।

মুখে রসিকতার হাসি ফুটিয়ে বলে—"সে ইট দিয়ে আবার তুই কি করবি? আবার নতুন করে বাঁধবি নাকি?"

—বলে আর খিকখিক করে হাসে।

মুনিয়ার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। আর কোন অনিশ্চয়তা

নাই। চারিদিক অন্ধকার! কিছুতেই নিস্তার নাই তার! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মুনিয়া।

কি যে হয়ে যায় মানুষদের এই সব মুহূর্তে! হাতের সাম্মাটটা দিয়ে এক ঘা লাগিয়ে দিল না কেন মুনিয়া অঘোরীবাবাকে? ওসব মুহূর্তে মানুষ আর এক জগতের নিয়মকানুন মানে বোধ হয়। কেন অমন করেছিল সে কথা কি বলতে পারে মুনিয়া? তাকে কাছে পেলে এখন জিজ্ঞাসা করতাম! যখন প্রথম আমার কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল এসব, তখন আমারও খেয়াল হয়নি একথাটা। আমি তখন নিজেকে একজন খুব বড় কর্মী বলে ভাবি; মনে মনে একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা যে সমাজের ভাল মন্দ দেখবার ভার আমারই উপর পড়েছে। যার যেখানে আটকায়, যে এসে কেঁদে পড়ে, তার উপকার করতে চেষ্টা করি সাধ্যমত। সেই জন্য লোকে ছুটেও আসত আমারই কাছে। কি করা উচিত, সে কথা ভাবতে তখন সময় লাগত না। মুনিয়ার মুখে লোকটার নাম শুনেই তো মাথার রক্ত গরম হয়ে উঠল। সতীথানের অঘোরীবাবাটার এই কাণ্ড! কোথাকার কোন একটা বাইরের লোক এসে পাড়ার মধ্যে এই কাণ্ড করে যাবে! লোকটার সম্বন্ধে অনেক রকমের কথা আগেই কিছু কিছু কানে এসেছে। ভণ্ড, বুজরুক, নেশাখোর! ওর টাকাপয়সার উপর লোভের কথা পাড়ার সকলেই জানত। ভদ্রলোকরা সন্দেহ করতেন যে লোকটা হয়ত পুরনো দাগী আসামী হতে পারে। কিন্তু কারও কিছু বলবার সাহস ছিল না। পুলিস 'লাইন' এর কনস্টেবলরা ওর ওখানে গাঁজা খেতে যায়; অনুন্নত শ্রেণীর লোকরা তার ভক্ত; বলে যে লোকটা সিদ্ধপুরুষ—তুকতাক মন্ত্রতন্ত্র জানে—নেশার জিনিস শোধন করে নিতে

জানে; এই সব কারণেই পাড়ার লোকে কিছু বলতে সাহস করত না অঘোরীবাবাকে।

আজকে হলে হয়ত ভাবতাম, কিন্তু সেদিন কি করা উচিত সে কথা ভাবতে বিন্দুমাত্র সময় লাগেনি। তখনই সতীথানে গিয়ে, অঘোরীবাবাকে বেশ উত্তম মধ্যম প্রহার দিয়েছিলাম। শাসিয়ে এসেছিলাম, যে এই অল্পর উপর দিয়ে গেল এখনকার মত; কিন্তু কাল সকাল থেকে যেন আর তাকে সতী-থানে না দেখি!...দেখতে পেলে তার হাড় আর মাংস আলাদা করে দেবো! দেখতে অত ষণ্ডামার্কা হলে কি হয়—লোকটা আসলে ভীরু স্বভাবের; মার খাওয়ার সময় পর্যন্ত আমার দিকে তাকাতে পারেনি, ভয়ে। পর দিন সকালে আর তাকে দেখা যায়নি সতীথানের বটগাছটার নীচে। কিন্তু কি আশ্চর্য! সব জানা সত্ত্বেও ওই বুজরুক অঘোরীবাবাটার উপর, মুনিয়ারমা, বা রামধনী কারও ভয়-ভক্তি একটুও কমেনি, একদিনের জন্যও!

এর মাসদুয়েক পর দাদার বাড়ির চাকর রামধনীর সঙ্গে মুনিয়ার মা আর মুনিয়া তীর্থ করতে বেরিয়ে যায়—। কাশী, অযোধ্যা, সেরে বোধহয় গয়াতেও গিয়েছিল,—মুনিয়ার বাপের আত্মার সদ্গতির একটি ব্যবস্থা করতে। তারপর সেখান থেকে ফেরবার সময়, একরত্তি কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলেটাকে নিয়ে ফেরে। এক-এক জনের কাছে এক-এক রকম কথা মুনিয়ার মা বলেছিল। কাউকে বলেছিল, এর মা কাশীতে তীর্থ করতে এসে কলেরায় মারা যায়; মারা যাবার সময় তার হাতে সঁপে দিয়ে যায় ছেলেটাকে। কাউকে বলেছিল ধর্মশালায় কুড়িয়ে পেয়েছে এটাকে। কাউকে বলেছিল যে ভোর বেলায় গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে ছোট ছেলের কান্নার শব্দ শুনতে পায়, তারপর তাকে তুলে নিয়ে আসে। আরও অনেক কিছু বলে থাকবে অনেকের কাছে। এখানকার কেউ বিশ্বাস করেনি সে সব কথা। বিশ্বাস যে করবে না সেকথা মুনিয়ার মাও জানত। তবে তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। যে নামটি সঠিক-ভাবে জানবার জন্য প্রতিবেশীদের কৌতূহল সেটা কেউ আন্দাজ করতে পারেনি। মুনিয়ার মায়ের বাড়িতে চিরকাল পুলিস কনস্টেবলদের আর বহু-রকমের সন্দেহজনক চরিত্রের লোকজনের যাতায়াত—মুনিয়ার বাবা বেঁচে

থাকবার সময় থেকেই—একথা কারও অজানা নয়। মুনিয়ার-বাপ তো বহু-কাল আগে একবার নাকি চোরাইমাল বিক্রির দায়ে জেলও খেটেছিল।... তাদেরই কারও হবে!...

কাশী থেকে এইবার বাড়ি ফিরতে হবে। ঠিক করেছি মনে মনে। অথচ যাই যাই করেও যাওয়া হয়ে উঠছে না। ফেরবার জন্য যেন সত্যিকারের আগ্রহ নাই। আমার কর্মজীবনের কথা বাদ দাও, গত বছরখানেক থেকে তো ট্রেনে ট্রেনেই কাটিয়েছি। অথচ মোটঘাট বেঁধে স্টেশনে যেতে এখন আলস্য লাগছে। ঘরে খাটিয়ায় শুয়ে বা গঙ্গার ঘাটে বসে হাবিজাবি ভাবা ছাড়া কাশীতেও কিছু করবার নাই। তবু যেন এই ভাল।

এই অবস্থা।

একদিন দরজায় ধাক্কা পড়ল। ত্রিবেদীর খোঁজে বুঝি কেউ এসেছে! "বাবু! বাবু!"—গলাটা চেনা-চেনা ঠেকে।

দরজা খুলে বার হয়েই দেখি শ্রীমান রঘুয়া দাঁতগুলো সব বার করে দাঁড়িয়ে।

"কে রে? তুই!"

"হ্যাঁ বাবু।"

সঙ্গে সঙ্গে আঁচ করে নিলাম ব্যাপারটা। তবু জিজ্ঞাসা করি—"তুই এখানে যে হঠাৎ?"

"দিদিমা, (নানী) চিঠিতে লেখেন নি? তিনি যে আমাকে বললেন যে আপনাকে সব কথা জানিয়ে দিয়েছেন?" একেবারে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল রঘুয়া, আমার পায়ের উপর।

বউদির এই নাতিটিকে আমি বিলক্ষণ চিনি। ওর একবছর বয়সের সময় থেকে দেখছি তো! ছোটবেলা থেকেই ওই রকম! এমন বিশ্ববখাটে ছেলে সচরাচর দেখা যায় না! রামধনীই আশকারা দিয়ে দিয়ে ওর মাথা খেয়েছিল! কেউ এ নিয়ে কিছু বললে বলত—আমি যে ওর বাপ আর মা দুইই। রাম-ধনীর সম্মুখে কেউ যদি রঘুয়াকে 'পুষ্যি-ছেলে' বলত তাহলে সে রেগে আগুন

হত। "কেন—শুধু ছেলে বলতে পারিস না! ছেলে আবার কখন 'পুষ্যি' হয় না কি?" এই গুণধর ছেলেকে নিয়ে কারও না কারও সঙ্গে ঝগড়া তার নিত্য লেগে থাকত। সাত-আট বছর বয়স থেকেই রঘুয়া গাঁজা খেতে শেখে, বাপের কাছ থেকে। তাড়ি খাওয়ার দিন রামধনী ছেলেকেও একটু একটু খাওয়াত; বলত শরীর ভাল হবে—পেটরোগাদের তাড়ি খাওয়া ভাল। এহেন যার শিক্ষা দীক্ষা, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেয়াড়াপনা তার না বাড়লেই আশ্চর্য হবার কথা। বাপের শাসনের বালাই ছিল না—যা একটু ভয় করত রেণুকে আর রেণুর মাকে। ছেলেটার ধাঁচই আলাদা। বয়সে-বড়দের দলেই ওর গতিবিধি। কনস্টেবলরা যেখানে সাঁঝের বেলায় ভজন গায়, সেখানে ও খঞ্জনী বজায়। দশ-বছর পার হতে না হতে, সতীথানে পল্টন বাবাজী যে নূতন আস্তানা গেড়েছে, তার আড্ডায় গাঁজার প্রসাদ পেতে যায়, ফেরবার সময় কপালে ছাইয়ের তিলক লাগিয়ে ফেরে। এসেই রেণুর ঠাকুর-ঘরে প্রণাম করা চাই। এসব রামধনীর শেখানো। রেণু জিজ্ঞাসা করত, কিরে রঘু, সন্ন্যাসী হবি নাকি রে?—যা বাবরি চুল রেখেছিস। তার উপর আবার তিলক কপালে।' ছেলের সন্ন্যাসী হবার কথাটা রামধনীর অপছন্দ। সে জবাব দেয়—'সন্ন্যাসী হতে যাবে ও কোন দুঃখে, দিদিমণি। ও ছোঁড়া নোলক পরে ছুতোরদের নাচের দলে নাচে যে—তাই চুল বড় বড় রাখে।"

"আমরা কি চাই যে তোর ছেলে সন্ন্যাসী হোক; কিন্তু তুই বাপ হয়ে ওকে যে নেশাভাঙ করানো শেখাচ্ছিস, গাঁজার আড্ডায় যেতে দিচ্ছিস, ও ছেলে বড় হলে সন্ন্যাসী হবে না তো কী হবে?"

"না দিদিমণি, ও ছেলে সেরকম নয়। গোঁফদাড়ি উঠতে দাও না ওর; উঠলেই বিয়ে দিয়ে দেবো। সন্ন্যাসী হবে কি! ও তোমারই সন্তান, তোমাদের কৃপাতেই মানুষ, তোমাদের এখানেই থাকবে চিরকাল। চারটি চারটি তোমাদের পাতের অন্ন প্রসাদ পাবে, আর তোমাদের বাড়িতে কাজ করবে আমার মত; মাইনে দিতে ইচ্ছা হয় দিও, না দিতে ইচ্ছা হয় না দিও।"

ছেলেটা পল্টন-বাবাজীর অনুরাগী চেলাদের মত তিলক কাটতে আর

চুল রাখতে আরম্ভ করেছিল, বোধ হয় বালকসুলভ নূতনত্ব-প্রিয়তায়। ছেলের এই সন্ন্যাসীদের অনুকরণ রামধনীর ভাল লাগত না; কোথায় যেন একটা আঘাত লাগত; বুঝি বা মনে পড়িয়ে দিত অঘোরীবাবার কথাটা।—পর কি কখনও সত্যিকার আপন হয়? একটা অস্বস্তি জাগত তার মনে যে, সবাই চব্বিশ ঘণ্টা বলে বলেই আবার ছোঁড়াটাকে সন্ন্যাসী না করিয়ে দেয়।—

কিন্তু ছেলের বিয়ে দেওয়া রামধনীর হয়ে ওঠেনি। তার আগেই সে মারা যায়—সন্ন্যাস রোগেই। লোকে বলেছিল যে গাঁজা খেয়ে খেয়ে মরেছে। অবশ্য তার বয়সও হয়েছিল অনেক। বাপ মারা যাবার পর রঘুয়া মাথা নেড়া করেছিল। বেশ মনে আছে—দেশভ্রমণে বার হবার কিছু দিন আগে তাকে কথায় কথায় একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঠাট্টা করে—"কি রে, আবার যে দেখি সেই বাবরি চুলই রাখছিস? এবার সত্যিকারের সন্ন্যাসী হবি না কি রে?" রঘুয়ার চোখে-মুখে কথা। সে হেসে জবাব দিয়েছিল—"আগে কড়া কড়া গোঁফদাড়ি উঠবে, তবে না সন্ন্যাসী হবার কথা ভাবব।" রেণু বকে উঠেছিল—"ঠেঙিয়ে তোর সন্ন্যাসী হওয়া বার করছি! দাঁড়া, তোর আমি দেখাচ্ছি মজা! বাপ স্বর্গে যাবার ছমাসের মধ্যেই, সে যা বারণ করে গিয়েছে সেই কথা মুখে আনা!"

কথাগুলো মনে পড়ল এতদিন পর আজ কাশীতে রঘুয়াকে অন্য মূর্তিতে দেখে। সে তিলক ও নাই, সে বাবরি চুলের বাহারও নাই। পা জড়িয়ে ধরে কান্নার সুরে বলছে—"আমার একটা বিহিত করুন বাবু! এ অধমকে পায়ে ঠেলবেন না! তা হলে আপনার এখানেই প্রাণত্যাগ করব—আপনার দুয়ারেই!"

হেসে বলি—"একেবারে প্রাণত্যাগ করবি? দাড়িওয়ালা-মহাত্মা একবার অনেককাল আগে বারোয়ারিতলায় প্রাণত্যাগ করবার হুমকি দিয়ে উপোস আরম্ভ করেছিল, সে গল্প শুনেছিস তো?"

শুকনো কান্নার মধ্যেই সে বলে—"কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন বাবু! দাড়িওয়ালাদা ওখানে থাকলে আর আমায় ভাবনা ছিল কিসের!"

"রেণু তোকে শিখিয়ে দিয়েছে নাকি, আমার পা জড়িয়ে ধরে, প্রাণত্যাগ করবার সঙ্কল্প জানাতে?"

"কী যে বলেন বাবু! মা শিখিয়ে দিতে যাবেন কেন! সতীথানের সতীমায়ের দিব্যি বলছি! কেউ শিখয়নি! অনেক আশা নিয়ে আপনার আশ্রয় নিয়েছি। এ অধমকে পায়ে ঠেলবেন না! আপনি একবার সেখানে গিয়ে হুকুম করলে খোঁড়া নথুনী পর্যন্ত লাঠি নিয়ে এসে দাঁড়াবে আমার পক্ষ হয়ে।"

কথার বাঁধুনি ওর চিরকালই বেশ। তবু মনে হচ্ছে যেন এগুলো আগে থেকে মুখস্থ করা। নাকী কান্নাটা পর্যন্ত, কান্না নয় বলে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এইবার পায়ের উপর মাথা কুটতে আরম্ভ করে, নাটকের রস আরও ঘোরালো করে তুলল। ব্যাপারটাকে একটু হালকা করে দেবার জন্য অন্য কথা পাড়ি।

"কি রে, সন্ন্যাসী হবার সাধ ঘুচেছে দেখছি তোর? বাবরি চুল আবার ছাঁটিয়ে ফেললি কবে?"

শুকনো চোখ মুছতে মুছতে আবার আরম্ভ হল—"সেই সব কথা বলবার জন্যই তো ছুটে এলাম এতদূর আপনার কাছে। সব বলছি। আপনি বাবু শুধু কথা দেন, সেই শালাকে ঠাণ্ডা করবেন। আপনি ছাড়া আর কারও কম্ম নয়। সবাই শুধু সলাপরামর্শ দিয়েই খালাশ—সব শালা দুনিয়াকে দেখে নিয়েছি! নিরাপদবাবুর মত অত বড় একটা লোক, তিনি সুদ্ধ একবার মুখে রা কাটলেন না আমার দিকে হয়ে। সবাই ভয়েই জুজু। আপনার কথা কাটে, এমন লোক সেখানে কেউ নাই। আপনি বাবু আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন! শালাটার জুলুম জবরদস্তির কথা তো দিদিমা আপনাকে চিঠিতে লিখেছেন?"

সেই শালাটা'র কথা একটু বলে না দিলে বুঝতে পারবে না। রামধনীর

দ্বিতীয় পক্ষের বউটাও যখন মারা গেল, ছেলেপিলে না হয়ে, তখন সে ঠিক করে, আর বিয়ে করবে না।

সে সব বহুকাল আগের কথা। সেই থেকে সে দেশেও যায় না। মুনিয়ার মায়ের সঙ্গে তার দহরম-মহরম চিরকালের। তাদের বাড়ির নেশাভাঙের আড্ডায় রামধনীর যাতায়াত ছিল। রঘুয়াকে পোষ্য নেবার সময় শুনেছি যে মুনিয়ার মা রামধনীকে কিছু টাকাও দিয়েছিল। সে সময় পাড়ার লোকে বলাবলি করত, যে এই লোভেই নাকি তার পোষ্যপুত্র নেওয়া। এর কিছুকাল পর মুনিয়ার মা যখন নিজের ধেনোজমি বিঘাকয়েক বেচে, বাড়ি আর আমকাঁঠালের বাগানটা রঘুর জন্য রামধনীকে দিয়ে, কোথায় যেন চলে যায়, তীর্থবাস করতে, তখনও লোকে নানা রকম জল্পনা কল্পনা করেছিল। বুদ্ধিমানরা বলেছিল যে মুনিয়া আবার সতীন নিয়ে ঘর করতে গেল কিনা, তাই ওর মা এখানকার সঙ্গে সব সম্বন্ধ তুলে দিতে চায়—যাতে জামাইএর এখানে আনাগোনা না থাকে—রঘুয়াকে নিয়ে কোনদিন কি একটা কথা কানে উঠবে আবার—বলা তো যায় না!···

বাড়ি বেচে চলে যাবার কিছুকাল আগে থেকেই মুনিয়ার মা, বাড়ি থেকে বার হওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। রামধনী বউদির কাছে বলত যে, সব সময় একা একা বসে বসে কাঁদে। বউদি বলেছিলেন যে, মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারে না, তো সেখানে গিয়ে থাকলেই তো পারে। রামধনী বলে—"সে কি সব সময় হয় মা? আপনিই কি চিরদিনের তরে রেণুদির সংসারে গিয়ে থাকতে পারেন? তার উপর আবার সতীন নিয়ে ঘর মুনিয়ার।"······

এখন রঘুয়াকে জেরা করে যে খবরগুলো পাওয়া গেল সেগুলো এক জায়গায় করলে মোটামুটি এই রকম দাঁড়ায়। 'সেই শালা' হচ্ছে রামধনীর কি রকম যেন ভাইপো। দ্বারভাঙ্গা জেলা থেকে এসেছে। সঙ্গে আর এক শালাও আছে। দুটোই ইয়াঃ জোয়ান! ইয়াঃ মোচ! ইয়াঃ লাঠি! এসে তার ঘর দখল করে বসেছে। কাউকে কাছে ভিড়তে

* দেয় না। বলে রামধনীর কোন ছেলে নাই; তার বাড়ি বাগান ভাইপো পাবে। শুনুন একবার কথা! এতকাল ছিলি কোথায়! বাপের মুখে কোনদিন শুনিনি ভাইপোর কথা। কেউ শোনেনি। বাবা মারা যাবার কথা খবর পেল কি করে কে জানে। পাড়ারই কোন হিতৈষী দিয়ে থাকবে। মোচওয়ালা লোকটা নাকি দ্বারভাঙ্গায় আদালতের চাপরাশী ছিল। ফটর ফটর করে সরকারী আইনের কথা বলে। পল্টন-বাবাজী রঘুয়ার হয়ে আইনের কথা বলবার জন্য তার চেলা কপুরী মুন্সীকে পাঠায়। মোচওয়ালা লোকটা পালটা আইনের পয়েণ্ট বলে একেবারে চুপ করিয়ে দিয়েছে মুন্সীজীকে। দুটোরই নেড়া মাথা, রোজ সকালে কুস্তী করে, হাতে তেল-মাখানো লাঠি নিয়ে হাট-বাজার করতে যায়। কারও সাহস নেই তাদের কিছু বলে। দশজনে যার কথা শোনে, এমন একজন কেউ তার পক্ষ নিয়ে দাঁড়ায়, তবেই তারা কাবু হয়। সে পারেন, শুধু বাবু আপনি! শালারা বলে কিনা—তোকে যে পুষ্যি নিয়েছিল তার দলিল দেখা! রেজিস্টারী মেজিস্টারী আরও কি কি যেন সব বলে। সে সব কি আমরা বুঝি! মুন্সীজীর মত অতবড় একটা লোকই বলে সে সব কথা বুঝতে পারেনি, তার আবার আমরা! বলে কিনা, সেই মেয়েমানুষটা বাগান আর ঘর চাচাকে দান করবার সময় যে দলিল লিখে দিয়েছিল দেখা সেই দলিল! দেখা, তার মধ্যে কোথায় তোর কথা লেখা আছে। মাস কয়েক হয়ে গেল আমার ঘর দখল করে থাকা, সেই শালাদের। মা বলে দিয়েছেন আপনাকে বলতে, যে যত দেরি হচ্ছে ততই সেই শালারা আরও জমিয়ে বসছে—তত আমার পক্ষে খারাপ। সেই সব কাগজপত্র লেখাপড়ার কথা বোধ হয় জানতেন আপনি, আর দাঁড়িওলা-মহাত্মা, দুজনেই বিবাগী আর দেশত্যাগী। দাড়িওলা-মহাত্মা কোথায় আছেন কে জানে, তাঁকে তো ধরতে পারব না; আপনার ঠিকানাটা তবু জানা; তাই আসা আপনার কাছে। মা বলে দিয়েছেন যে আপনি একবার গিয়ে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে; আপনার তীর্থধর্মের ব্যাঘাত বেশী দিনের হবে না।

বুঝি যে রেণুই পাঠিয়েছে রঘুয়াকে এখানে। দলিল-দস্তাবেজের কথা আমার কিছুই মনে নাই, কিন্তু সে কথা বললে রঘুয়া পা ছাড়বে না। তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাই। নইলে লোক জড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা। পাশের দোতলা বাড়ির জানলা খুলে গিয়েছিল; দুই-একটি ছোট ছেলেমেয়েও জুটে গিয়েছিল এরই মধ্যে, মজা 'দেখতে। আমার দ্বারা যা হবে তা আমি করব তার জন্য—এই কথা আদায় করে তবে নাছোড়বান্দা রঘুয়া ছাড়ল।

তারপর আরম্ভ হল তার প্রাণখোলা কথা। পা জড়িয়ে পড়ে থাকবার রাস্তাটা বাতলে ছিলেন দিদিমা। আপনাকে মাও জোর তাগিদ দিয়েছেন যাবার জন্য। শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার আগে মা নিজের চোখে দেখে যেতে চান যে তাঁর অধম সন্তান রঘুয়ার একটা হিল্লে লাগিয়ে দিয়েছেন বিশ্বাসজী। শ্বশুরবাড়ি কথাটা ঠিক না—শ্বশুরও নাই, শাশুড়ীও নাই— তার আবার শ্বশুরবাড়ি কিসের! স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছেন। মায়ের সেই পাগলা ভাশুরটা মরবার কথা আপনি তো বুঝি শুনেই এসেছিলেন, কাশীতে আসবার আগে? ভগবানের জীব! আহা, গিয়েছে, বেশ গিয়েছে! যতকাল বেঁচে থাকত নিজেরও কষ্ট, অন্য লোককেও কষ্ট দেওয়া। ভাশুর মরে যাবার পর ছুটি পেয়ে মায়ের দেওর আর জা—ওই যে পটলাবাবু আর তার বউ এসেছিলেন—আমাদের ওখানে। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী—বড় ভাল লোক। যাবার আগে দুজনে আলাদা আলাদা বকশিশ দিয়ে গেলেন—একজন এক টাকা, আর একজন আট আনা! নেমন্তন্নও করে গেলেন একবার তাঁদের ওখানে যাবার জন্য। মুখের মিষ্টি কথাটুকুও বলে কজনে! সে কদিন খুব হই-হল্লা করে কেটেছিল মা দিদিমার। পটলাবাবুও বউদি বলতে পাগল, পটলাবাবুর বউও দিদি বলতে পাগল, না বলে থাকতে পারলাম না—এত যে দিদি দিদি তবে এতদিন সেই দিদির কথা মনে পড়েনি কেন?' জবাবটা যা দিলেন পটলাবাবুর বউ, সে একেবারে নম্বর-মারা কথা। বললেন—মনে পড়বে না কেন—মনে পড়েছে অষ্টপ্রহর—কিন্তু ওই ভাশুরকে ফেলে কি কোথাও যাওয়া যায়? তোর মাকে জিজ্ঞাসা করিস না।

কেন, সে তার ছোটবোনের সঙ্গে কবার দেখা করতে গিয়েছিল!—এ কথার জবাব কি দেবো।

এর পর রঘু চাপা গলায় একটি গোপন কথা জানাল। কেউ তাকে বলেনি; জা দেওরের সঙ্গে রেণুর কথাবার্তা তার কানে এসেছিল যেটুকু সেইটুকু থেকেই তার বলা। রেণুর নাকি ধনুকভাঙ্গা পণ যে মণিবাবু নিজে থেকে যেতে লিখবে, তবে সে যাবে স্বামীর ঘর করতে। নইলে কভ্‌ভী নহী। সেই চিঠি এসেছে, তবুও কি মন গলে! তখন হল যে শুধু চিঠিতে হবে না—নিজে এসে নিয়ে যাক, তবে যাওয়া হবে। আসছে সপ্তাহে ছুটি নিয়ে আসছে মণিবাবু, মাকে নিতে। এবার ঠিকই যাবেন। এই সেদিন আমায় বললেন—'ছাখ রঘু, আমি চলেই তো যাচ্ছি এখান থেকে—-আর কোন দিন তোকে কিছু বলতে আসব না—আমার একটি কথা রাখ—কেটে ফেল মাথার চুলগুলোকে ছোটছোট করে।' সেই কথাতেই না কেটে ফেললাম চুলগুলো। মা চলে গেলে বাড়িটা খালিখালি লাগবে, না বাবু?

"ওঃ! মনিবের সংসারের উপর টান তো তোর কত! এত যদি তোর টান তবে রেণুদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলি কেন, এই কিছুদিন আগে?"

একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব রঘুর মুখচোখে। এর আগে তাকে কখনও অপ্রতিভ হতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বেশ গম্ভীর হয়ে বলল—"পালাইনি। বেরিয়ে গিয়েছিলাম সন্ন্যাসী হয়ে।"

"কেন রে? হঠাৎ সন্ন্যাসী হবার সাধ গেল কেন রে? তুই যে বলেছিলি দাড়ি-গোঁফ ভাল করে গজালে তারপর সন্ন্যাসী হবার কথা ভাববি?"

"গেলাম কি সাধে! আপনি যদি সেখানে থাকতেন তা হলে কি আর আমাকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে হয়। দ্বারভাঙ্গার সেই বেজন্মা ছুটোর সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে, মনের দুঃখে সন্ন্যাসী হয়েছিলাম।"

তার পক্ষে অপরকে বেজন্মা বলে গালাগালি দেবার অসঙ্গতির দিকটা এরকম সময়েও রঘুয়ার খেয়াল হল না। ছেলেটা সত্যিই অভাগা। জন্মর আগে থেকেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে ওর অবাঞ্ছিত জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। মুনিয়া ও মুনিয়ার মায়ের সব কথা ও নিশ্চয়ই শুনেছে পাড়ার লোকের

কাছে। ছোটবেলাতে রঘুর কাছে ওই সব কথা বলবার জন্য রামধনী পাড়ার লোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করেছে। এবারকার গণ্ডগোলের সময় তো, নিশ্চয়ই ওই কথাগুলোর খোলা খুলি আলোচনা হয়েছে দশমুখে! এতকাল তবু ওর সম্মুখে একটু রাখ-ঢাক ছিল—এখন বোধ হয় তাও নাই। তবে রঘু যে 'টাইপ'এর ছেলে, তাতে এসব জিনিস নিয়ে ও মাথা ঘামায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু ওর উপর একটা অবিচার সত্যিই হয়ে যাচ্ছে। পাড়ার লোকের বিশেষ করে নিরাপদবাবুব মত লোকের, সাহায্য করা উচিত ছিল ওকে। রঘুয়াটার যা স্বভাব! সেই জন্যই বোধহয় কেউ ওর পক্ষ নিয়ে দাঁড়ায়নি। নইলে মুনিয়ার-মায়ের সম্পত্তিতে যদি কারও অধিকার থাকে সে হচ্ছে তার মেয়ে-জামাইএর। তারা কেউ কিছু বলল না—কোথাকার দ্বারভাঙ্গা থেকে কে এসে জাঁকিয়ে বসল সেই সম্পত্তির উপর! সত্যিই অন্যায়!

"হ্যাঁরে রঘু, দ্বারভাঙ্গার সেই লোকটা ঠিক কে হয় রে রামধনীর?"

"বলে তো তার জেঠতুতো ভাইএর ছেলে! আপনিও যেমন! বিশ্বাস করেন সে কথা!"

আবার আরম্ভ হয়ে গেল সেই বেজন্মাটার উদ্দেশে রঘুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভরা বাছাবাছা বিশেষণের বর্ষণ। একবার খুললে তার মুখ বন্ধ করে কার সাধ্য। আমার সম্মুখে সব কথা বলবার দ্বিধা সঙ্কোচের অবশেষটুকুও এই সঙ্গে কেটে গেল।

"হ্যাঁরে, সন্ন্যাসী হয়ে বার হয়েছিলি কখন? রাত্রিতে নিশ্চয়ই?"

"তবে কি দিনে? দিনে বার হলে পাড়ার সবাই দেখে ফেলবে না? আমার কি ঢাকঢোল পিটিয়ে সন্ন্যাসী হওয়া?"

"ঠিক যখন বাড়ি থেকে বার হলি, তখন কি মনে হচ্ছিল রে?"

"ভয়ভয় করছিল, কারও সঙ্গে আবার দেখা না হয়ে যায়। ছাই-টাই-মাখা ওই বেশ!"

বুদ্ধদেবের বাড়ি ছেড়ে বার হবার মুহূর্তের তুলনা এসে যাচ্ছে আমার মনে তখন।

"কোথায় যাচ্ছিস, কোথায় থাকবি, কি খাবি, সেসব কিছু মনে হয়নি?"

"না, ভাবনা কিসের—সঙ্গে যে টাকা ছিল আটটা।"

বুঝি যে রঘুর কাছে সে মুহূর্তটার কোন দাম নাই। সেটাকে অযথা গুরুত্ব দিচ্ছি আমি। ও ছেলে, রামধনী বেঁচে থাকাতেও কতবার পালিয়েছে এর আগে, বাপের টাকা চুরি করে। একবার অনেকগুলো আতা নিয়ে ফিরেছিল জন্মাষ্টমীর দিন; রামধনী সকলের কাছে বলে বেড়িয়েছিল যে ছোঁড়াটা দিদিমার জন্মাষ্টমীর আতা আনতে গিয়েছিল।

"তোকে সন্ন্যাসীর বেশে বড় দেখতে ইচ্ছা করছে একবার, বুঝলি। গেরুয়া রঙের কাপড় পড়েছিলি নাকি?"

"না, লাল।"

"কেন রে?"

কে বলে রঘুয়ার লজ্জা নেই! কিছুতেই উত্তর দেবে না আমার কথার। অনেক পীড়াপীড়ির পর জানা গেল যে তার ধারণা মদ গাঁজা দুইই খেতে গেলে গেরুয়া কাপড় পরা চলে না—লাল কাপড় পরতে হয়।

"দাঁড়া, সন্ন্যাসী হতে হলে কি কি করতে হয়, শিখে নিই তোর কাছে।"

"সে সব আপনাদের কম্ম নয় বাবু। গাঁজা, মদ, না খেলে কি মশার কামড়, রোদ, বৃষ্টি, শীত সহ্য করা যায়। আপনারা বাবু পারেন, সুটকেসে মশারি নিয়ে কাশীতে আসবার সন্ন্যাসী হতে।"

"চিমটে আর কমণ্ডলু নিয়েছিলি তো সঙ্গে?"

"না।"

"অমন এক কথায় সারছিস কেন। ভাল করে বল দেখি শুনি—কি কি নিয়েছিলি।"

"কম্বল, লোটা, লাঠি, আর একটা ঝোলার মধ্যে কাপড, কলকে, ধুনুচি, আরও কি কি যেন টুকিটাকি জিনিস—এখন কি সব মনে আছে।"

"তাহলে তো দেখছি বেশ গুছিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলি। ধুনুচি আবার নিতে হয় নাকি রে সন্ন্যাসীদের?"

"আরে আপনিও যেমন! ওকি আমি কিনেছি! মায়েদের বাড়ির বৈঠকখানাটা ভাড়া নিয়ে মুদীখানার দোকান দিয়েছিল না হরিশবাবু—ওই যে যে দোকানে দাড়ি-ওলাদা কাজ করত—সেই ঘরের কুলুঙ্গিতে রাখা ছিল। অনেক কাল থেকেই ওখানে রাখা ছিল। মায়ের না দিদিমার, কার যেন হবে। ভাড়া নেবার পর ঘরের কলি ফিরিয়ে দোকান খুলবার সময়ও ওটা ওখানে। দেখেছি তো। মহাত্মা মানুষ দাড়িওলাদা। সে সকাল বিকালে ওইটাতে করেই দোকানে ধুনো দেওয়া আরম্ভ করল। তারপর দোকান তো গেল উঠে। জিনিসপত্র সব নিয়ে গেল, কিন্তু ধুনুচিটা কুলুঙ্গিতেই থেকে গিয়েছিল। মনেও নেই কারও ওটার কথা। আমাদের সতীথানের পল্টন-বাবা যখন সফরে বার হন, তখন দেখেছি ধুনুচি নেন সঙ্গে। দেখাদেখি আমিও যাবার দিন ওটাকে নিয়েছিলাম।"

"পল্টন-বাবাজী বুঝি তোর গুরু?"

"যখন তিনি ওখানে থাকেন, তখন যাই পেসাদ-টেসাদ পেতে। গুরু তো আমার সবাই—আপনিই কি কম গুরু নাকি আমার?"

"তোর আবার কম গুরু বেশী গুরু আছে নাকি?"

"বাবু ঠাট্টা করছেন আমার সঙ্গে! আমি কি আপনার হাসিঠাট্টার যুগ্যি?"

"না না, ঠাট্টা কেন হবে। আমি জিজ্ঞাসা করছি জানবার জন্য—কোথায় কোথায় গেলি—কি কি করলি—সব খুলে বল, শুনি।"

"ওসব কথা যেতে দেন বাবু। আমার ব্যাপারটার একটা গতি করুন—নইলে আমাকে আত্মহত্যা করে মরতে হবে।"

বেশ গল্প করছিল; হঠাৎ আবার আরম্ভ হয়ে গেল তার কান্নাকাটি। চোখে কিন্তু জল নাই। বহু সাধ্যসাধনার পর মায়া কান্না থামলে, অতি কষ্টে তার কাছ থেকে বার করা গেল, তার সন্ন্যাস জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ।

যে কথাটাকে সে চেপে যেতে চাচ্ছিল এতক্ষণ, সেটা হচ্ছে যে—সে গিয়েছিল মুনিয়ার বাড়িতে—সিংহেশ্বর-থানের কাছে।

বোঝা গেল যে বাইরে যতই চালাক-চতুর ভাব দেখাক না কেন, কথার চটক তার যতই থাকুক না কেন, আসল কাজের বেলা তার বুদ্ধি ততটা খোলে না। খুব বেশী ব্যক্তিত্ব না থাকলে, একা একা সন্ন্যাসীগিরি করা পোষায় না—দলে ভিড়তে হয়। না হয় নিজের ব্যবসায় অভিজ্ঞ, কোন ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসীর চেলা হয়ে বেশ দিনকতক ঘুরতে হয়। কারও অধীনে শিক্ষানবিশি না করলে এ পেশার অন্ধিসন্ধিগুলো জানা দুরূহ। একা একা নিজের অভিজ্ঞতায় জানতে হলে যে ধৈর্যের দরকার তা রঘুয়ার নাই। সতীথানের পল্টনবাবাজীর আখড়ায় যাতায়াত করে, আর ছোট বেলা থেকে বাপের সঙ্গে 'মদ গাঁজা তাড়ি'র প্রসাদ পেয়ে, ভেবেছিল যে দরকারী সব জিনিস আয়ত্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়েই সব হিসাব গুলিয়ে গেল। দেখা গেল যে যেরকমটি ভাবা, ব্যাপার মোটেই সে রকমটি নয়। ভাল মক্কেল পাওয়া যায় দৈবাৎ। সন্ন্যাসী হয়েও কিছু কিছু গাঁটের পয়সা খরচ করতে হয়। কোথায় গেলে পুলিশে জ্বালাতন করে, কোন শ্রেণীর লোকে খেতে বলে, কারা ঠাট্টা করে বিয়ের কথা তোলে, কারা তাকে দেখবামাত্র বুঝে যায় যে সে এ 'লাইন'-এ নূতন লোক—এ সব জানা না থাকায় সন্ন্যাসীগিরি তার ঠিক জুতসই ঠেকছিল না। সঙ্গে নেওয়া টাকা কটা খরচ হয়ে এলে, তার মাথায় নূতন এক বুদ্ধি খেলে।··· বিশ্বাস করুন বাবু—সতীমা'র দিব্যি বলছি—এ বদবুদ্ধি আমার আগে থেকে ছিল না। বাড়ি থেকে বার হবার সময় আমি এ ভেবে বেরুইনি। ·সেই মেয়েমানুষটার উপর আমার রাগ হয়েছিল ঠিকই; আবার মনে মনে দেখবার ইচ্ছাও ছিল।···

মুনিয়াকে রঘু মা বলল না—বলল 'সেই মেয়েমানুষটা।'

কিছুদিন থেকে মুনিয়ার কথাটা বড় বেশী তার কানে আসতে আরম্ভ করেছিল; দ্বারভাঙ্গার সেই লাঠিওলা গুণ্ডাটা ওখানে উড়ে এসে জুড়ে বসবার সময় থেকেই। উপকার করবার জন্য কেউ এগিয়ে না আসুক, সলাপরামর্শ দেবার ছলে অনেকেই তাকে পুরনো ইতিহাসটা শুনিয়ে দিয়েছে। এসব যে

তার অজানা ছিল তা নয়; তবে সেইসব পুরনো কথা লোকে একরকম ভুলেই গিয়েছিল। দ্বারভাঙ্গা থেকে সম্পত্তির দাবিদার আসায়, আবার নূতন করে পুরনো কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ পেল পাড়ার লোকে। তার ইদানীংকার দুরদৃষ্টের জন্য রঘুও মনে মনে দায়ী করেছিল 'সেই মেয়েমানুষ'টাকে।

মনের ভিতর 'সেই মেয়েমানুষ'টাকে দেখবার একটা কৌতূহল তার চিরকালই ছিল। বছর দুই তিন আগে সে যখন গিয়েছিল সিংহেশ্বরথানের মেলায় তখন রামধনী বেঁচে। বাপ বলেছিল—কি হবে ও মেলায় গিয়ে, তার চেয়ে মিরজাচৌকির মেলায় যাস। রঘু জবাব দিয়েছিল—'কিসে আর কিসে। সিংহেশ্বরথানে হল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম—অতবড় তীর্থের জায়গা—শিবরাত্রির সময় মেলা—শিবজীব মাথায় জলও তো দেওয়া যাবে।' রামধনী আর বাধা দেয়নি—যদিও তার ইচ্ছা ছিল না যে ছেলেটা ও অঞ্চলে যায়। মনে মনে ধাবণা করে নিয়েছিল যে ছোঁড়াটা বোধহয় মুনিয়ার ঠিকানাটা সঠিক জানে না। সেবাব সিংহেশ্বরথানে যাবার সময়, 'সেই মেয়েমানুষ'দের বাড়িটা লোকদের জিজ্ঞাসা করে চিনে নিয়েছিল। সেই বাডির পাশ দিয়ে যাবার সময়, আডচোখে খানিক তাকিয়েছিল—যদি কোন মেয়েমানুষ দেখা যায়। কেমন দেখতে, জানতে ইচ্ছা করে—সুন্দব না কালো—মোটা না রোগা—মনে মনে একরকম চেহারা আঁচ করে রেখেছিল। কিন্তু সেবার কাউকে দেখতে পায়নি। তখন 'সেই মেয়েমানুষটা'র উপর এখনকার মত মন বিরূপ ছিল না—শুধু তাব সম্বন্ধে ছিল খানিকটা কৌতূহল, কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে এবার সে গিয়েছিল নিজের স্বার্থে। 'সেই বদ মেয়েমানুষটা'র কাছ থেকে মোচড দিয়ে কিছু টাকা আদায় করাই ছিল তার আসল মতলব এবারকার যাওয়ার। মনে মনে ভেবে রেখেছিল যে দিতে রাজী না হলে, শেষ পর্যন্ত সেই-মেয়েমানুষটার স্বামীব কাছে সব কথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবে।

মুনিয়ার স্বামীর অবস্থা খারাপ না। খেত খামার গোরু মোষ আছে বিস্তর। সাধু-সন্ন্যাসীর উপর ভক্তিও আছে বেশ—এ খবর সিংহেশ্বরথানের

মেলায় যেবার রঘু আসে, সেইবারও শুনে গিয়েছিল। মেলা উপলক্ষে যখন সাধু সমাগম হয়, তখন নাকি তারা সাধুসেবায় বেশ খরচ করে প্রতি বছর; এক একবার ভাণ্ডারাও দেয়।

রঘুর হিসাবে ভুল হয়নি। 'ব্যোম শঙ্কর!'—বলে গিয়ে দাঁড়াতেই গৃহস্থ প্রথমে একটু অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে—বোধহয় তার বয়স দেখে। এত গাঁজা খেয়েও রঘুর মুখ এখনও পাকাটে মেরে যায়নি। সন্ন্যাসীর বয়সটা কম হওয়াতেই বোধহয় কাজ হল বেশী। ভক্তিসহকারে তাকে বসবার জায়গা দেখিয়ে দিয়েই গেরস্থ ছুটে গেল পা ধোবার জল আনতে। বোঝা গেল যে ভিক্ষা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীকে বিদায় করে দেবার মতলব তার নাই। গেরস্থ দেখিয়ে দিয়েছিল গোয়াল ঘরের পাশের দোচালাটা।

······উঁহু!·· ধুনী জ্বালাতে হবে, ভক্তরা আসবে; খোলা জায়গাই ভাল।···বিশেষ কারণ না থাকলে দেবস্থান ছাড়া, অন্য কোথাও ছাতের নীচে শোয়া গুরুদেবের বারণ।·· ব্যোম শঙ্কর!···

গোয়ালঘরের সম্মুখের খোলা জায়গাটুকুতে দুটো বেশ ঝাঁকড়া নিমগাছ। দেখেই বোঝা যায় যে ছায়ার জন্য যত্ন করে পোঁতা। নিমগাছের ডাল থেকে দাঁড়িপাল্লা ঝুলছে প্রকাণ্ড। খেতখামারের লোকজনরা, পাইকার খদ্দেররা এখানে এসে বসে। চারিদিকে অনেকদূর পর্যন্ত গোবর দিয়ে নিকানো—খেতের ফসল ঝাড়া, বাছা, শুকানোর জন্য। সেইখানে ঝোলাঝুলি নামিয়ে ধুমুচিটা বসায়—জায়গাটাতে ধুনি জ্বেলে আস্তানা হবে বেশ কিছু দিনের।

"ব্যোম শঙ্কর!
দুশমনকো তং কর!"

হে শঙ্কর, আমার শত্রুদের জ্বালাতন করতে ভুল না! বেশ জোর গলায় চীৎকার করে বলা। এ আর গেরুয়া আলখেল্লা-পরা মিনমিনে ভিখারী সাধু পাওনি; এ হচ্ছে লাল-কাপড় পরা মেজাজী সন্ন্যাসী!···প্রথম থেকে তেড়ে তেড়ে কথা বলতে হবে সকলের সঙ্গে; গেরস্থকে হুকুম করতে

হবে জোর গলায়; লোকজনরা যারা সাধুসঙ্গ করতে আসবে তাদের একটার পর আর একটা ফরমাশ খাটাতে হবে; মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার ছেড়ে উঠতে হবে; সব সময় চটে লাল হয়ে থাকতে হবে; তবে না সন্ন্যাসী। গেরস্থ থাকবে ভয়ে ভয়ে; লোকজন থাকবে তটস্থ; রাগ করে হঠাৎ কাউকে এক ঘা বসিয়ে দিলে সে কৃতার্থ হয়ে যাবে; তবে না সন্ন্যাসী! নরম হয়েছ কি গিয়েছ; অমনি গেরস্থ বেজারমুখে এক মুঠো আকাঁড়া চাল দিয়ে বিদায় করে দেবে। পল্টন বাবাজীর আখড়ায় ছোট কলকের প্রসাদ পাবার ফাঁকে ফাঁকে এ জ্ঞানটুকু তার বিনা চেষ্টায় আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল। শুধু একটু জাঁদরেল গোছের চেহারা, আর দাড়িগোঁফের তার যা অভাব! তার আর কি করছ বলো! নকল দাড়িগোঁফ ব্যবহার করবার কথা সে যে একবারও ভাবেনি তা নয়, কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে, বাড়ি থেকে বার হবার সময় এ লোভ সম্বরণ করেছিল, ধরা পড়ে যাবার ভয়ে।

"হাঁ করে দেখছিস কি আমার মুখের দিকে! আমি কি খুব সুন্দর দেখতে! একটু আগুন আর ধুনো নিয়ে আসবে, তাও কি বলে দিতে হবে না কি গেরস্থকে! সাধুসেবা কখন করেছিস এর আগে? যা! জলদি!"

একেবারে হই হই পড়ে গেল বাড়িতে। দেখতে বাচ্চা হলে কি হয়— তেজ আছে—বিভূতি আছে—দেখছিস না। হেঁজিপেঁজি সন্ন্যাসী নয়। ধুনুচিতে ধুনো জ্বালাবার পর তবে সেখানে আসন গ্রহণ করেন এই বাচ্চা-সাধু। বহু ভাগ্যে এমন সাধু সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো পড়ে গেরস্থবাড়িতে।... কিন্তু পান থেকে চুন খসলেই আর নিস্তার নাই!...ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি— ছেলেবুড়ো, মেয়েপুরুষের ভিড় লেগে গেল নিমতলায়।

প্রতিবেশিনীরা এসে পৌঁছবার আগেই রঘু এ বাড়ির মেয়েদের একবার ভাল করে দেখে নিল। কোনটা সেই মেয়েমানুষ? চিনে নিতে চায় সে মুনিয়াকে। মনে মনে সে একটা চেহারা কল্পনা করে রেখেছিল কিন্তু তার সঙ্গে সধবা দুজনের একজনেরও মেলে না একটুও। দুজনেরই হাতের কাঁকন সোনার, এর থেকেই রঘু আন্দাজ করে নেয় যে এদের অবস্থা বেশ

ভাল। কেন না সাধারণ অবস্থার লোক হলে, এদের হাতের গহনা রুপোর হত।···কোনটা সে?···তারা যখন প্রণাম করতে এল তখন সে এই কথাই ভাবছে।

সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি থেকে বার হবার সময় সে মনে মনে ঠিক করেছিল যে পা ছুঁয়ে মেয়ে-লোকদের প্রণাম করতে দেবে না;—কোন মেয়েমানুষ পা ছুঁতে এলেই চীৎকার করে গালাগালি দিতে দিতে দূরে সরে যাবে; আর সেখান থেকে চলে যাবার ভয় দেখাবে। এতে সন্ন্যাসীর কদর বাড়ে লোকের চোখে একথা সে সাধারণ বুদ্ধিতে জানে। এই মেয়েমানুষ দুটো তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করবার সময়, তার সঙ্কল্পের কথাটা কেন যেন তার খেয়াল হয়নি। খেয়াল হল তারা দুজন প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াবার পর। দুজনে দুটো টাকা দিয়ে তাকে প্রণাম করেছিল।

"নিয়ে যা টাকা তুলে! টাকা দেখাতে এসেছে! বেকুফ কোথাকার!"

সকলে বুঝে গেল সন্ন্যাসী টাকা-পয়সা ছোঁন না; নইলে নিজ হাতে টাকা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন টান মেরে।···আজেবাজে সাধু নয়!···

ধুনুচির ধোঁয়ায় হাতের বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে বাচ্চা সন্ন্যাসী হুকুম করলেন—"এদিকে এগিয়ে আয়! তোদের দুজনকেই বলছি।"

তাদের কপালে ধোঁয়ার ফোটা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন সন্ন্যাসী। আশীর্বাদ পেয়ে দুই গিন্নীই কৃতার্থ। বুঝলেন যে টাকাটা ফিরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত সন্ন্যাসী তাঁর আশীর্বাদ দেওয়া স্থগিত রেখেছিলেন।·· যে সে সন্ন্যাসী নয়।···

বাড়ির একরাশ ছেলেমেয়ে ঢিপ ঢিপ করে সন্ন্যাসীর পায়ে প্রণাম করছে, মায়েদের নির্দেশে; কিন্তু তিনি নির্বিকার। মায়েরা হতাশ হলেন।···কেন এরা বঞ্চিত হল আশীর্বাদ থেকে? এরা তো কোন দোষ করেনি। ছেলেমেয়েদের মধ্যে একজন ছিল বেশ অসুস্থ। প্রণামের পালা সারা হবার পর, তাকে ধরে ধরে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন গিন্নীরা।

"জয় মহাদেব, টন্ গণেশ!"—হুঙ্কার ছাড়লেন সন্ন্যাসী।···দেখতে ছোট হলে কি হয়, গলার জোরে বাঘ সিংহকে হার মানান!··

'টন্ গণেশ !' কথাটার মানে নিয়ে এর আগে রঘু কখন মাথা ঘামায়নি। হাসিঠাট্টা করে অনেককে কথাটা বলতে শুনেছে মাত্র, এর আগে। বলেই সে বুঝতে পারে কথাটি বলা এখানে উচিত হয়নি। এখানে হালকা কথা খাপ খায় না। গণেশের নামটাও বোধহয় এখানে ওঠানো উচিত হয়নি। সকলের চোখমুখের দিকে সে একবার দেখে নিল।···না—কেউ কিছু মনে করেনি!···সকলেই সম্মোহিতের মত তাকিয়ে তার দিকে। সকলের চোখমুখে স্পষ্ট লেখা—এসব সন্ন্যাসী যা বলে তাই সাজে—যা করে তাই শোভা পায়—এদের বলা কওয়া আচার-ব্যবহার কি আর সাধারণ ভিখারী সাধুদের সঙ্গে মেলে!···

যাক! লক্ষণ খারাপ নয়! রঘুয়া মনে বল পেল।

এক দিনের মধ্যেই সে বেশ জমিয়ে নিল সেখানে। মুহুর্মুহু গাঁজা, থেকে থেকে চীৎকার, কখনও রাগ, কখনও খামখেয়ালী আচরণ, ধুনির আগুন, ধুনোর সুগন্ধ ধোঁয়া, সব মিলিয়ে একটা ভক্তিবিস্ময়ের জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্ট হয়েছে তাকে ঘিরে। লোকদের সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ করছে তার অল্প বয়সটা, সব চেয়ে বেশী অভিভূত করছে তার স্বতঃস্ফূর্ত যথেচ্ছ আচরণ; সব চেয়ে ভাল লাগছে তার ঢলঢলে মুখখানা। একজন বৃদ্ধা পার্শ্ববর্তিনীকে দেখিয়ে দিলেন, বাচ্চা-সন্ন্যাসীর মুখখানা থেকে কেমন একটা জ্যোতি ফুটে বার হচ্ছে।· সত্যিই তো! তিনিও তাই দেখতে পেলেন। মুহূর্তের মধ্যে সবাই জেনে গেল একথা। সবাই দেখতে পাচ্ছে।··পা ছুঁয়ে প্রণাম যে নেন না এই বাল-সন্ন্যাসী! যদি নিতেন!···তেমন ভাগ্য নিয়ে কি আর তাঁরা পৃথিবীতে এসেছেন!···যাক এমন সন্ন্যাসীর দর্শন যে হয়েছে, সে কি কম ভাগ্যের কথা!···

মুনিয়া আর তার সতীন বাড়ির ভিতর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে, তাদের উপর কৃপাদৃষ্টি আছে বাল-সন্ন্যাসীর—পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দিয়েছেন—সাধক ভক্তদের, সামান্য আঙুল নাড়ানোর পর্যন্ত একটা অর্থ আছে। কিন্তু তারা ঠিক করে, এই সৌভাগ্যের কথা বাইরের কারও কাছে বলবে না। একি টাকা পয়সা গয়নাগাঁটির কথা, যে অন্যের কাছে বলে বেড়াতে হবে!···

একেবারে আসর জমিয়ে বসেছেন বাচ্চা-সন্ন্যাসী। লাল-কাপড়-পরা সাধুসন্ন্যাসীরা অনেকে মদ খান; তাই দুই-একজন ভক্ত সেকথা তুলেছিল। কিন্তু মদ রঘুয়া খায়নি। একজন ভক্ত তাকে না জিজ্ঞাসা করে এনে দিতেই, সে বোতল উপুড় করে ধুনির আগুনে ঢেলে দিয়েছিল, 'স্বাহা' বলে। লোভ যে ছিল না তা নয়; তবে মদ তাড়ি বেশী খেলেই তার কান্না পায়, তা সে পূর্ব-অভিজ্ঞতায় জানে। কখন আবার কী বলে ফেলবে নেশার ঝোঁকে কাঁদতে কাঁদতে—তাই সে আগে থেকে এ বিষয়ে সতর্ক ছিল। এ পেশায় সে নতুন;—সেইজন্য একটু সাবধান হয়ে থাকতে চায়, এখানকার অপ্রত্যাশিত সাফল্যের মধ্যেও। এই সাফল্যের স্বাদ বেশ নতুন নতুন লাগে; নেশার মতনই মিষ্টি এর আমেজ। এতগুলি লোকের মন তার হাতের মুঠোর মধ্যে; এদের আশা নিরাশা, হাসি কান্না সব নির্ভর করছে তার মুখচোখের ভাবের সামান্যতম বৈলক্ষণ্যের উপর। তবু তার ভয় ভয় করে—এই বুঝি একটা কিছু বেফাঁস বলে ফেলে!…এই বুঝি কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!…কত রকমের প্রশ্ন করে ভক্তরা; কত রকমের প্রার্থনা; বিপদ, আপদ, গ্রহশান্তি, রোগের ওষুধ, সাংসারিক অশান্তি—কত বিষয়ে কত কথা লোকের বলবার আছে। কেউ বা তাকে দিয়ে যজ্ঞ করাতে চায়, কেউ বা শুধু চায় তার বাড়িতে একবার সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো পড়ুক। খেলো হয়ে যাবার ভয়ে এসব প্রার্থনায় সে আমল দিচ্ছে না মোটেই। কে কি বলছে সে সব যেন কানেও যাচ্ছে না।…সন্ন্যাসী আছেন আপন মনে; মাঝে মাঝে 'ব্যোমশঙ্কর' না হয় অন্য একটা কিছু বলে চীৎকার করে উঠছেন। নিজের অপছন্দ দেখাতে হলে কারও দেওয়া খাওয়ার জিনিস বা আগুনের মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন 'স্বাহা' বলে; কারও দেওয়া ফলমূল বা লোকজনদের মধ্যে ছিটিয়ে বিলিয়ে দিচ্ছেন, কাউকেও বা ধুনুচি থেকে একটু ছাই নিয়ে হাতে দিয়ে দিচ্ছেন। যার বরাতে যা। ভয়ে বুক দুর দুর করে ভক্ত সেবকদের। মনগড়া মানে করে নিচ্ছে তারা বাচ্চা-সন্ন্যাসীর কার্যকলাপের। এ সন্ন্যাসীর কাছে পক্ষপাত পাবে না; ফাঁকি চলবে না এখানে; যার কপালে যেমনটি লেখা তেমনটি পাবে; এর নড়চড় হবার জো

নাই।...তবু যদি একবার তার দিকে ফিরে তাকান, যদি ওঁর মন গলে, যদি উনি মত বদলান,—কত রকম করে তো ওঁরা পরীক্ষা করেন ভক্ত সেবকদের! যার দেওয়া আটা আর ঘি উনি ধুনির আগুনে 'স্বাহা' করে দিয়েছেন, বা যার দেওয়া গাঁজার মোড়কটা উনি ছুঁড়ে দিয়েছেন লোকজনদের মধ্যে, তারা পর্যন্ত আশার অবশেষটুকু জীইয়ে রেখে ঠায় বসে থাকে। যেটাকে মনে হচ্ছিল প্রার্থনা মঞ্জুর না হবার ব্যঞ্জনা, হতেও তো পারে যে সেটা দিয়ে বাল-সন্ন্যাসী তাদের পরীক্ষা করছিলেন মাত্র! এ রকম কত গল্প শুনেছে তারা। এঁরা যে কী ভেবে কী বলেন, কী করেন, সে সব কি তাদের মত সাধারণ পাপীতাপী মানুষে বুঝতে পারে। ওই যে, বালসন্ন্যাসী তাঁর গুরুদেবের একটা গল্প বলেছিলেন না আজ সকাল বেলাতে, সেটা মুখস্থ করে রাখবার মত ঘটনা।...তাঁর গুরুদেব তখন কথা বলেন না। তবু লোকে যায় তাঁকে জ্বালাতন করতে। একদিন দুজন লোক গিয়ে দাঁড়াতেই চিমটে ছুঁড়ে মারলেন, যাতে তারা পালায়। যেই না তারা সরে গিয়েছে একটু দূরে, অমনি পাশের উঁচু পুরনো পাঁচিলটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল—ঠিক যেখানে তারা দাঁড়িয়েছিল সেইখানে। আর এক মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলে দেওয়াল চাপা পড়ে বাছাধনের প্রাণটি যেত।...গালাগালটাই ভাল ভাল সাধুসন্ন্যাসীর আশীর্বাদ! কত অভাগার দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না, আবার কাউকে বা চিমটে দিয়ে মারেন। এর থেকেই বুঝে নাও!

বাচ্চা-সন্ন্যাসী সিগারেট খাচ্ছিলেন। বুড়ী হরখুর মা কাঁদতে কাঁদতে জানায় যে এক বছর থেকে তার সময়টা খুব খারাপ চলেছে। এর একটা বিহিত করতে। সন্ন্যাসী আধ-খাওয়া সিগারেটটা ফেলে দিলেন তার গায়ে। হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠেছে বুড়ী। সন্ন্যাসী চেঁচালেন—'ভাগো! দূর হয়ে যা আমার সম্মুখ থেকে! এখনই।' হতভম্ব বুড়ীকে হরখু টেনে বাইরে নিয়ে গেল। তার কাজ হয়ে গিয়েছে। তাদের সঙ্গে আরও কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল—ওই সিগারেটের টুকরোটা কবচে পুরে ধারণ করবার কথা বুড়ীকে মনে করিয়ে দিতে।

সন্ধ্যার দিকে সকলে বলাবলি করল—এক ঠোঙা জিলিপি বাল-সন্ন্যাসী কি করে যে এত লোকের হাতে হাতে দিলেন! আশ্চর্য! হোক ভেঙে ভেঙে; কিন্তু জিলিপি তো ওই এক ঠোঙা! সবাই পেয়েছে একটু একটু করে।...ঠোঙা খালিই হয় না, খালিই হয় না—যত দিচ্ছেন ততই যেন ভরে ভরে উঠেছে!...জয় হো! বাল-সন্ন্যাসীকা জয় হো!...ঔর ভী একবার বোলো বাল-সন্ন্যাসীকা জয়! ভয়, ভক্তি, বিস্ময়, রহস্যের ধোঁয়া, ধুনো ও ধুনির ধোঁয়াকেও ছাপিয়ে উঠেছে।

দিন দুয়েকের মধ্যে রঘুয়ার মনের জোর অনেক বেড়ে গেল। তৃতীয় দিনে সে হুঙ্কারের কথাটা বদলে ফেলে। ভোর রাত্রিতে জপে বসেছিলেন বাল-সন্ন্যাসী। সূর্যোদয়ের পর জপ সেরে উঠে কালো ছোট-কলকেটা আর খুঁজে পান না তিনি। গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত খেদোক্তি বেরিয়ে এল বাল-সন্ন্যাসীর মুখ থেকে—'চিলম ভী গয়া কঙ্কর ভী গয়া'!... 'কলকেও গেল, ঠিকরেও গেল!' খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল চতুর্দিকে। একেবারে হইহই রইরই কাণ্ড। কিন্তু যা একবার যায়, তা কি আর ফিরে আসে।...হায় হায়। এ কী কাণ্ড।...দেখ দিকি কিসে থেকে কী হয়ে গেল।...সাধুসন্ন্যাসীর জিনিস কে নেবে! কার এ দুর্মতি হল!...এখন দেখ কিসের ফলে কী হয়!...বাল-সন্ন্যাসীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছে; কী যে আছে কপালে!

তারপর কতগণ্ডা কলকে আনা হল; নূতন কলকেতে সন্ন্যাসীঠাকুর সেবাও নিলেন; কিন্তু মুখে ওই এক বুলি। 'কলকেও গেল ঠিকরেও গেল।' কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল যে এটা আর এখন একটা খেদোক্তি মাত্র নাই। কথাটা বলে সন্ন্যাসী হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছেন আসন থেকে বারবার। ভয়ে মরে সবাই।

সব চেয়ে বেশী ভয় পেল ছোট ছেলেমেয়েরা। অধিকাংশ সাধুসন্ন্যাসীই প্রসাদী ফলমূল বিতরণের সময় ছোটদের উপর উপর পক্ষপাত দেখান। কিন্তু এ সন্ন্যাসী গত দুদিনের মধ্যে ছোট ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরেও তাকান নি একবার।......'সমদর্শী' সাধুসন্তরা কি কখনও ছোট-বড়র মধ্যে

তফাত করেন!······ভয়ে ছেলেপিলেরা এ দুদিন একটু দূরে দূরেই ছিল। আর দূর থেকেই হতাশ নয়নে বড়দের গাঁজা, সিগারেট, কাঁচকলা পাকা ও জিলিপির হরির লুট কুড়নো দেখছিল। এখন কলকে আর ঠিকরে হারাবার পর ক্ষ্যাপা সন্ন্যাসীর রকম সকম দেখে, তারা এখানে থাকবার সাহসটুকুও হারায়।

'ব্যোমশঙ্কর!' প্রভৃতি যে সব হুঙ্কার এ দুইদিনে সকলের মকৃশ হয়ে গিয়েছিল, কলকে আর ঠিকরের গুরুভারে সে সব কোথায় তলিয়ে যায়।··· কলকেও গেল, ঠিকরেও গেল! কেবল এই চীৎকার। অগ্নিকুণ্ডে ঘি আটা ছুঁড়ে ফেলবার বেলাতেও তাই; আবার কাউকে শাঁখ-আলু ছুঁড়ে মারবার সময়ও তাই।···কথাটার নিশ্চয়ই অন্য কোন গূঢ় অর্থ আছে!···কিন্তু এর আধ্যাত্মিক মানেটা যে কী সেইটা শুধু ধরা যাচ্ছে না এখনও!···যাবে—বোঝা যাবে—পরে বোঝা যাবে—কতদিনে বোঝা যাবে কে জানে! মন মানে কই! কিন্তু কেন উনি এই ধাঁধায় কথা বলছেন? না বুঝতে পারবার অস্বস্তিটুকুর চোরা খাতে, নতুন-করে-আসা ভক্তির স্রোত বইতে আরম্ভ করে, বাচ্চা-সন্ন্যাসীটির উপর। সবাই নিঃসন্দেহে বুঝে গিয়েছে যে ইনি বড বড গোঁফদাঁড়িওয়ালা ভাল ভাল সন্ন্যাসীদের চেয়েও বহু 'অগ্রসর'। কলকে আর ঠিকরে দুটোই বোঝবার মত কথা— ভেবে দেখবার মত কথা! উনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, তাও দেখতে পাচ্ছে না কেউ। পাপী যে! চোখ থাকতেও অন্ধ, কান থাকতেও কালা যে তারা! সত্যিই কি আর কলকেটা চুরি গিয়েছে! তুমিও যেমন! ওঁর কলকে নেবার মত বুকের পাটা কার! অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে কলকেটা।—উনি অদৃশ্য করে দিয়েছেন—দৃষ্টান্ত দিয়ে কি একটা যেন বোঝাবার জন্য।···নশ্বর দেহ আর তার মধ্যের প্রাণটা চলে যাবার কথা নয়ত?···কলকেও গেল, ঠিকরেও গেল!···নম্বরী মাল কথাটা!··· সকলেই নিজের নিজের ধরনে মানে করে নেবার চেষ্টা করছে।

মুনিয়া কথাটার মধ্যে ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছে বাচ্চা-সন্ন্যাসীর এখান থেকে তল্পি-তল্পা গোটানোর।···সাধু সন্ন্যাসীরা এক জায়গায় বেশীদিন

থাকেন না তো। তবু তো ইনি তিন দিন থেকে রয়েছেন। সন্ন্যাসীর কৃপাদৃষ্টি আছে তার উপর, এ কথা মুনিয়া বুঝতে পেরেছে। কিন্তু সবাই যে তাঁকে ঘিরে বসে থাকে সারাদিন। একটু নিরিবিলিতে না পেলে কি করে সে জানাবে সন্ন্যাসীকে তার প্রার্থনা। একটু ধরিয়ে দিলেই এঁর মত 'অগ্রসর' সন্ন্যাসীরা বাকিটা বুঝে যাবেন। তিন দিন ধরে কত লোকজন তাঁর কাছে নিজের নিজের দুঃখের কথা বলছে সকলের সম্মুখেই। দেখছে তো; কিন্তু নিজের বেলায় এ জিনিস মুনিয়ার ভাল লাগে না। সকলের জন্য ঢালাও ভাবে ছিটিয়ে দেওয়া, বিলিয়ে দেওয়া আশীর্বাদে কখনও মন ভরে! না ওতে কাজ হয়! ও ধরনের পাইকারী আশীর্বাদে সাধারণভাবে সকলের মঙ্গল হতে পারে; কিন্তু কারও বিশেষ মনোবাঞ্ছা পুরণের জন্য সাধুসন্তদেরও একটু বিশেষ মনোযোগের দরকার হয়। ইনি বাল ব্রহ্মচারী বলেই এঁর আশীর্বাদ পাবার জন্য মুনিয়ার এত আকাঙ্ক্ষা; নইলে লাল-কাপড়-পরা, গাঁজা-মদ-খাওয়া সন্ন্যাসীদের সে খুব চেনে!···কলকেও গেল, ঠিকরেও গেল!···মানে হচ্ছে —এবার আমিও যাই। পালাই পালাই করছে বাল ব্রহ্মচারীর মন বোধ হয়! গেরস্ত আর পাড়ার মাতব্বররা রাত এগারটা বাজলেই লোকজন সকলকে সরিয়ে দেন জোর করে, সন্ন্যাসীর ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে ভেবে। সেই জন্য এ দুদিন মুনিয়া ওই সময়টায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সাহস পায় নি। আজ সে দেখা করবেই। হোক ঘুমের ব্যাঘাত। তার যে দরকার। ওই সময়টায় নিরিবিলি পাবে। ঠিক যখন সন্ন্যাসী শোবার জোগাড় করবেন তখন তাঁকে গিয়ে ধরবে।···

রঘুয়া এ তিনদিনের মধ্যে ঠিক করতে পারেনি, এ বাড়ির দুই গিন্নীর মধ্যে কোনটি মুনিয়া। দুবেলা খাওয়ার সময় সে ভাল করে দেখবার সুযোগ পায় গেরস্তর দুই-স্ত্রীকে। দুই বউয়ের মিলিয়ে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে গেরস্তর। বেশ সুখের সংসার। দুই সতীনে বেশ মিল। ছেলে পিলে রঘুয়া কোন কালেই ভালবাসে না; তাদের সম্বন্ধে তার কোন কৌতূহলও নাই। সে শুধু জানতে চায় কোন স্ত্রীলোকটি মুনিয়া। যে খবরটুকু সে আগে থেকে

জানে, তা হচ্ছে যে বড় গিন্নী—মুনিয়ারও ছেলেমেয়ে আছে। কিন্তু 'সেই মেয়েমানুষটা' দেখতে কেমন ছিল, কি রকম তার গায়ের রঙ, গড়ন-পেটন, মুখচোখ, এসব খবর কিছু জানা থাকলে আজ আর অসুবিধায় পড়তে হত না। জানবে কি করে; এক, রেণুকে জিজ্ঞাসা করলে হত। কিন্তু তা কি করা যায়? কারও কাছে কি ও কথা তোলা যায়? লজ্জা করে না?

সংসারের সারা দায়িত্ব যেটি রোগা ছিপছিপে গোছের চেহারা সেইটির উপর বলেই বোধহয়। সেইটিই বোধহয় ছোটবউ। জনমজুরদের খাওয়ানো, গোলা থেকে ধান বার করানো, তেলীবউকে সরষে মেপে দেওয়া, তেল ওজন করে ভঁাড়ারে তোলা—এসব কাজ তার। বাড়ির এত হইচই-এর মধ্যেও এসব কাজের একটুও নড়চড় হয়নি। পাড়ার লোকের চোখেও দুই গিন্নীর মধ্যে তারই খাতির বেশী। বোঝা তো যায়!

রঘুয়া মনে মনে আন্দাজ করে নিয়েছে যে অপেক্ষাকৃত মোটা স্ত্রীলোকটিই বয়সে বড়। বেশ শ্রী আছে মুখের; বাড়ির সর্বেসর্বা গিন্নী হলে ওকেই মানাত ভাল; কিন্তু শুঁটকী স্ত্রীলোকটাই হল এবাড়ির সুয়োরাণী! অথচ বেশ মিল দুজনের। ছেলেমেয়েগুলোর কোনটা কার বোঝবার উপায় নাই। সে দুচক্ষে দেখতে পারে না এই নেণ্ডিগেণ্ডিগুলোকে! গা জ্বালা করে এদের বায়না আবদার দেখে! ওই যেটা মায়ের কোলে চড়েও কেঁদে ঘরবাড়ি মাত করছে—ইচ্ছাকরে সেটার দুগালে ঠাসঠাস করে গোটা কয়েক চড় মেরে এখনই থামিয়ে দেয়!……

ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছে রঘুয়া। তার কাজ হলেই সে এখান থেকে চলে যেতে চায়। কিন্তু বাড়ির বড় গিন্নীকে এক মুহূর্তের জন্যও একা পাচ্ছে না যে!

রাত্রিতে সবে শুয়েছে কম্বলের উপর; চোখ বোঁজেনি তখনও; বাড়ির রোগা গিন্নীটি সাষ্টাঙ্গে ধুনুচিটার কাছের মাটিতে প্রণাম করে ডাকলেন—"বাবা!"

চোখমুখে বিরক্তি নিয়ে বাচ্চা সন্ন্যাসী উঠে বসলেন।

"ও! তুই! কি? আবার কি?"

…এটা না এসে বড়বউটা এলেও হত !……

"অপরাধ নেবেন না বাবা! আপনারা তো সবই জানতে পারেন। আপনারা বিমুখ হলে আমরা পাপী-তাপী যাই কার শরণে !"

রঘুয়া ভাবল, 'সেই-মেয়েমানুষটা' সংক্রান্ত সবরকম দরকারী খবর পাবার এ এক সুযোগ ভগবান বুঝি জুটিয়ে দিলেন। সেই-মেয়েমানুষটা কোন ঘরে শোয়—স্বামীর ঘরে কোন স্ত্রী শোয়—ছেলেমেয়েরা কোন মায়ের কাছে কে কে শোয়—এ সব খবর পেলে ভেবে দেখতে পারত, মুনিয়ার সঙ্গে রাত্রিতে একা দেখা করবার চেষ্টায় বিপদ কতখানি। মুনিয়ার নিজের ছেলেমেয়ে কী, এ সম্বন্ধেও একটা কৌতূহল হঠাৎ তার মনে জাগে। একটু স্বর নরম করে বলে—

"তা তুই একা এলি? তোর দিদিকেও সঙ্গে নিয়ে এলি না কেন?"

"…দিদি? কার কথা বলছেন সন্ন্যাসীঠাকুর! ওঁদের যে ধাঁধায় কথা বলা অভ্যাস। অপরাধীর মত অতি কুণ্ঠার সঙ্গে স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করে—"কার কথা বলছেন, বাবা?"

"তোর দিদি আবার এ বাড়িতে কটা? তোর সতীনের কথা বলছি।"

মুহূর্তের জন্য একটা সংশয়ের ঝিলিক খেয়ে গেল মুনিয়ার মনে।……তবে কি এঁর ভুল হল? এঁরা যে সব জানতে পারেন! হয়তো সন্ন্যাসীঠাকুরদের দেশে সতীন বয়সে ছোট হলেও তাকে দিদি বলে। দুজনেরই হয়তো দু-জনকে দিদি বলবার নিয়ম। না একথার কোন গূঢ় অর্থ আছে?……

"ও আমার ছোট কিনা, তাই ও আমাকেই দিদি বলে। সে বোধ হয় শুয়ে পড়েছে এতক্ষণে। ডেকে নিয়ে আসবো?"

হাওয়া-বাতাস, দেহের মধ্যের মনের মধ্যের, বাইরের জানা অজানা সব জিনিস হঠাৎ থেমে গেলে যেমন হয়, তেমনি মনে হল রঘুয়ার, মুহূর্তের জন্য। এত তার কথার বাঁধুনি, কথার পৃষ্ঠে জুতসই বুকনি ঝাড়বার এত তার ক্ষমতা, সাধারণ অবস্থায় সামান্য একটা বেফাঁস কথা সামলে নেওয়া তার কাছে ছেলে-খেলা। কিন্তু মুহূর্তের জন্য, কথা বলবার চেষ্টা করতে পর্যন্ত সে ভুলে গেল। চেষ্টা করলেও বোধ হয় কথা খুঁজে পেত না।……এইটাই তাহলে সেই মেয়েমানুষটা!……বাঁধে আটকানো কতকালের কত রকমের কত কথা, যেন

একটা হঠাৎ-পাওয়া ফাটলের মধ্যে দিয়ে হড়হড় করে মনের মধ্যে ঢুকে গেল। পাঁচমিশালী জটপাকানো চিন্তাগুলো; একটা থেকে আর একটাকে আলাদা করা যায় না।……সেই—মেয়েমানুষটা কি যেন একটা উত্তরের অপেক্ষা করছে। কি যেন জিজ্ঞাসা করেছিল!……কানে গেলেও, শোনেনি।…… মেয়েমানুষটার মুখে…ভক্তি……প্রশ্ন……ভয়।……একটা কিছু বলতে হয় এইবার।……

"বলতে চাস কী, তাই বল না!"

খুব জোরে বলতে চাইল, কিন্তু আওয়াজটা বার হল খুব আস্তে।… অনেক দূর থেকে আসছে যেন নিজের গলার ভাঙাভাঙা স্বরটা।…

"অপরাধ নেবেন না বাবা। পাপীতাপী মানুষ—কত কি বলে ফেলি—কত কি করে ফেলি। বিপদে পড়ে আপনার শরণে এসেছি বাবা। আমার মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন—আপনাদের তো কিছুই অজানা নয়।"… . .

পায়ের দিককার অসাড় ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে আসছে রঘুয়ার।… কত কি বলে চলেছে মেয়েমানুষটা।…একটু একটু করে কথাগুলোর মানে স্পষ্ট হয়ে আসছে। শুনতে পারছে, মানে বুঝতে পারছে কথাগুলোর। …মনের আর একটা খুপী এতক্ষণে খুলল রঘুয়ার। সাবেক রঘুয়ার।…এই মেয়েমানুষটার সঙ্গে দেখা করতেই তার এখানে আসা!…কি জন্য আসা সে কথা ভুললে চলবে না।·· নিজে থেকে এসে ধরা দিয়েছে! ··এই সুযোগই সে খুঁজছিল, আজ তিন দিন থেকে। খানিক আগে পর্যন্ত ভাবছিল যে মেয়েমানুষটা যদি ঘরে একা শোয়, তাহলে তার সঙ্গে রাত্রিতে সেখানে দেখা করলে কোন বিপদ আছে নাকি। সে সুযোগ তার হাতের মুঠোর মধ্যে এখন! গায়ে এর গহনা আছে।·· গহনার চেয়ে টাকার কথা বলাই ভাল।...অনেক টাকা। · যদি বলে যে টাকা তার নাই, টাকা থাকে স্বামীর কাছে।·· তা হলে?...তাহলে এক কাজ করলে হয়। অন্য কোথাও দেখা করবার কথা আজ ঠিক করে যেতে হয়।…সিংহেশ্বরথানের মন্দিরই সব চেয়ে ভাল জায়গা।…ওখানে না হলে, অন্য যেখানে ওর সুবিধা হয়,

সেইখানে।...আর ও যদি টাকা বা গয়না দিতে অস্বীকার করে?...তাহলে শুধু ভয় দেখানো নয়, সব কথা সে সত্যসত্যই ফাঁস করে দেবে বাড়ির কর্তাকে ডেকে। অত সাহস মেয়েমানুষটার কখনই হবে না।...কী বলে আরম্ভ করা যায় কথাটা? ..

রঘু মনে মনে কথাগুলোকে একটু গুছিয়ে নিচ্ছে।...মেয়েমানুষটা কত কি বলে চলেছে। তার দুঃখের কথা।...এ কি! ফোঁস ফোঁস করে নাক মোছবার শব্দ। চোখে জল মেয়েমানুষটার! কান্না চাপতে চাপতে বলছে চাপা গলায়—যত টাকা লাগে খরচ করতে সে রাজী—যাগযজ্ঞ শান্তি স্বস্ত্যয়ন যা করতে হয় সব খরচ সে সন্ন্যাসীকে দিতে রাজী—তার বড ছেলেটার মঙ্গলের জন্য কিছু একটা করতে বলছে সন্ন্যাসীকে।

একবার কেঁপে উঠে দপ করে পৃথিবীটা নিভে গেল! সব মুছে গিয়েছে। জানা জগতের পরশ হারিয়ে ফেলেছে বাল-সন্ন্যাসী।...

আবার যখন চেনা জগতে ফিরে এল, তখন বোঝে সেই মেয়েমানুষটা তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, সম্মোহিতের মত। ভাবছে বাল-সন্ন্যাসীর কি আবাব হল? তার এত কথার কিছুতে জবাব দিলেন না। তবে কি, তার প্রার্থনা নামঞ্জুর হয়ে গেল? সেই জন্যই কি তিনি নির্বাক? নইলে, চোগের পাতাটা ফেলেও তো আশ্বাস দিতে পারতেন। ওই যে ..

কোন কথা বলার সাধ্য রঘুয়াব নাই। প্রাণপণ চেষ্টায় সে তার হাতের আঙুল নাড়াতে পেরেছে। আঙুলেব ইশারায় সে চলে যেতে বলে মেয়েমানুষটাকে। মেয়েমানুষটার চোখদুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। আর মিনতি জানাতে সাহস পেল না মুনিয়া। অস্পষ্টভাবে রঘুয়া দেখল যে মেয়েমানুষটা টলতে টলতে বাডির ভিতব চলে গেল। পরিষ্কার দেখবে কি করে—তখন যে তার চোখের মণি তিরতির করে কাঁপছে।...সে তার ঝুলি আর কম্বল তুলে নিল। ধুনুচির গনগনে আগুনটা ফেলে দিলেও ওটা ঠাণ্ডা হতে সময় লাগবে।...থাকগে।...তাবপর রঘুয়া আর সেখানে এক মুহূর্তও দাঁড়ায়নি। পালিয়েছিল রাতারাতি। সারারাত সারাদিন হেঁটে রেণুদের বাড়িতে পৌঁছেছিল। মুনিয়াদের বাড়িতে যাবার কথাটা চেপে গিয়েছিল

রেণুর কাছেও। কারও কাছে বলে নি। আজ প্রথম বলল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আরম্ভ করেছিল; কিন্তু বলতে পেয়ে যেন বাঁচে।

আমি তখন চূড়ান্ত মুহূর্তগুলোর খোঁজে মশগুল। জিজ্ঞাসা করি—"হ্যারে রঘু, সেই মেয়েমানুষটাকে মা বলতে ইচ্ছা করছিল তোর?"

"খেপেছেন! সেটাকে মা বলতে যাব কোন দুঃখে!"

"মুনিয়াকে যখন টলতে টলতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতে দেখলি, তখন তার কাছ থেকে টাকা চাইবার কথাটা তোর আর মনে এসেছিল?"

"তখন আবার টাকা! হেঃ! কোথায় আছেন আপনি!"

"তোর মনের ভিতরটা কেমন লাগছিল রে, ঠিক তার আগেই?"

"সাড়ই নাই, তার আবার কেমন লাগবে?"

"একটা কিছু মনের মধ্যে হচ্ছিল তো?"

"হবে আবার কি! সব ভোঁ ভোঁ! কেবল খালি, কেবল খালি!"

"আচ্ছা কিছু মনে করিস না—একটা কথা বলবি?"

"এই রে সেরেছে! এত কথা বলছি, তাতেও মন ভরল না বাবুর?"

"মুনিয়ার ছেলে কটা?"

"জানি না।"

"বাড়িতে যে ছেলেটার অসুখ, সেটা মুনিয়ার ছেলে নাকি রে?"

"জানি না।"

"আচ্ছা, তোর মনের ওই ভোঁ ভোঁ অবস্থাটা আরম্ভ হল ঠিক কখন—মনে করে দেখ তো। ঠিক যেই বলল বড় ছেলের কথাটা, অমনি,—নারে?"

"মনে নাই।"

"বড় ছেলের মঙ্গল কামনা করতেই তুই ভাবলি বুঝি যে ওটা তোর অন্যও হতে পারে—নারে?"

"এমন এমন ফন্দি বার করেন বাবু আপনি! এত কথাও কি আপনার মাথায় খেলে! সতীথানের সতীমার দিব্যি বলছি—সে কথা ভাবতে আমার বয়ে গিয়েছে। কোন শালা মিছে কথা বলে!"

"তা চটছিস কেন?"

"চটলাম আবার কোথায়। তবে জিজ্ঞাসা করবার মধ্যেও তো একটা ইয়ে আছে···। আমি কি সব আগাগোড়া লিখে রেখেছি?"

"আচ্ছা, তা তুই পালালি কেন?"

"ইচ্ছা হল, তাই পালালাম!"

"না না—আমি বলছি যে, তখনই না পালিয়ে, পরের দিন সকালে সকলকে বলে কয়েও তো যেতে পারতিস। কে তোকে ধরে রাখত?"

রঘু নিরুত্তর: সতর্ক হয়ে গিয়েছে সে। জিজ্ঞাসা করলে বিরক্ত হয়। বহু খোশামোদের পর সে বলে যে কেমন যেন একটা ভয় ভয় করছিল তার, সেই জন্য সে তখনই পালায়।

"কিসের ভয়, কেন ভয়, তা ঠিক জানি না বাবু। মারধরেরও ভয় না, আবার ভূত দেখার গা ছমছমানিও না। অন্য কি রকম একটা যেন—অত বেবাক কি আমরা বলতে পারি বাবু?"

*　　　　*　　　　*

রেণু স্বাগত সম্ভাষণ জানাল—"কাকা আমাদের কথা রেখেছেন দেখছি। যাক, এলেন বলেই দেখা হল।"

"যা নাছোড়বান্দা পেয়াদা পাঠিয়েছিলি। না এসে কি উপায় আছে! সন্ন্যাসী মানুষ—পায়ের উপর প্রাণত্যাগ করবে ভয় দেখালে।…"

"সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার গল্প, এরই মধ্যে করা হয়ে গিয়েছে দেখছি আপনার কাছে।"

"আবার তোর জিনিস সেখানে ফেলে এসেছে, সে কথাও শুনলাম।"

"আমার জিনিস! কোন জিনিস? কোথায় ফেলে এসেছে?"

"তোর সেই পুরনো ধুনুচিটার কথা বলছি। তোর হিসাব নেই বুঝি?"

"না তো! কোন ধুনুচি?"

"ওই যেটা তোদের বড রাস্তার দিককার ঘরের কুলুঙ্গির মধ্যে ছিল।"

"ও আমার কপাল! সেটার কথা তো একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম! যাকগে বালাই গিয়েছে! ও জিনিস আবার কার দেওয়া জানেন তো? ওর মায়ের। ওর নিজের মায়ের। এখন তো দিব্যি আবার ঘর সংসার করছে, ছেলেমেয়ে, বাডবাডন্ত সংসার; রামধনী থাকতে তার মুখেই শুনেছিলাম কিনা সে সব খবর। কি মেয়েই ছিল! অদ্ভুত! এমন মজার মজার কাণ্ড করত! আমার বিয়ের সময় কি করেছিল জানেন?"

দেখলাম যে মুনিয়ার কাছে যাবার কথাটা রঘু এখানে চেপে গিয়েছে। তাই সে কথা আর তুললাম না রেণুর কাছে। মুনিয়ার ছেলেমেয়ে, বাড়বাড়ন্ত সংসারের কথাটা বলবার সুরে, রেণুর নিভৃত মনের আকাঙ্ক্ষাই ফুটে বেরুল যেন।…সেও তো এতকাল পর আবার স্বামীর ঘর করতে চলেছে।…

*　　　　*　　　　*

আলুপটলের পাহাড়ের আড়াল থেকে মেয়েদের হাসিগল্প শোনা যাচ্ছে।

"দেখ! দেখ মুনিয়ার মায়ের কাণ্ড একবার! এঁটো হাতেই মাথার কাপড় টেনে দিল।"

"অঘোরপন্থীর শিষ্য কি না।"

"কী ঘোমটার বহর! একেবারে লজ্জায় মরে গেলুম বাবা!"

"হ্যাঁ। এদিকে তো……!"

"সে সব আর বলে দরকার কি। এবার দোলের দিন দেখি—পুলিস লাইন-এর কনস্টেবলের দল ওর গায়ে রঙ দিয়েছিল বুঝি—তাদেরই একটাকে ধরে তার মাথাটা নিয়েছে বগলের মধ্যে। অমনি ভাবে চেপে ধরে নজ্জাবতী মুখচোখে কাদা নেপছেন লোকটার। সে কী হাসি!"

"কনস্টেবলদের শুনি রাতে ওরই ওখানে আড্ডা।"

"এদের ভাবও বুঝি না, আড়িও বুঝি না। আবার সেদিন ওর বাড়ি থানাতল্লাশ হল না? চোরাই মাল না কিসের জন্য যেন? সেও তো শুনি ওই পুলিসগুলোই করিয়েছিল, মিছামিছি।"

"মিছামিছি, না আরও কত। চোরছ্যাঁচড়দের নিয়েই তো ওদের কারবার মুনিয়ার বাপের সময় থেকেই। দেখ না, মা মেয়ে দুজনেরই গা ভরা রূপোর গয়না? মুনিয়াটাকে কেউ কোনদিন একখানা খারাপ শাড়ি পরতে দেখেছে?"

রেণুর বাবা, দাড়িওলা-মহাত্মাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে ঢুকছিলেন, কি যেন একটা কাজে, এঁটো বাসনের বোঝা হাতে মুনিয়ার-মা একগলা ঘোমটা টেনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে তাঁদের দেখে। রেণুর মা ছিলেন ভাঁড়ারঘরের দোরগোড়ায়। বিয়েবাড়ি। কর্তাগিন্নী দুজনেই কাজে ব্যস্ত। সেই জন্য দৈবাৎ দেখা হয়ে গেলে কথাবার্তাগুলো একটু ছুঁড়ে-মারা-গোছের হয়ে যায়।

"আবার এটাকে জুটোলে কেন?"

"এত বাছবিচার করতে গেলে কি কাজের বাড়িতে চলে? অত লোক পারে কোথায়?"

"আচ্ছা! কিছু হলে তখন বলতে এস না যেন আমাকে!"

"হবে আবার কী! আমি কি ওকে ভাঁড়ারের ভার দিচ্ছি?"

রেণুর বাবা ব্যস্ত হয়ে নিজের কাজে গেলেন। মা দরকারের চেয়েও অনেক বেশী শব্দ করে ভাঁড়ারঘরের শিকল তুলে দিতে দিতে, মুনিয়ার মায়ের উদ্দেশে চীৎকার করে বললেন—"তোমার ওই এঁটোকাঁটার কাপড় নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকো না যেন মুনিয়ার মা!"

"না তা কেন ঢুকতে যাব। আমার কি আর সেটুকু বুঝ নেই। তবে কিনা মা ঠাকরুন—এই বিয়েবাড়িতে কত দিক থেকে এঁটোকাঁটা আপনি ঠেকাবেন?"

মুনিয়ার মা বেরিয়ে গেল বাসন নিয়ে। রেণুর মা ভাবলেন যে কথাটার এইখানেই শেষ। কিন্তু বিয়েবাড়িতে কি কোন কথা পড়তে পায়? তরকারি কুটতে কুটতে বঁটির ধারের সঙ্গে সঙ্গে জিভের ধারও বাড়ে।

"উনি বলেছেন ঠিকই। একটু চোখে চোখে রাখাই ভাল ওদের।"

"হ্যাঁ, বিয়েবাড়ির এত লোকের জিনিসপত্র, গয়নাগাঁটি, তেল রে, সাবান রে, গামছা রে, তোয়ালে রে—চতুর্দিকে টুকিটাকি জিনিস ছড়ানো পড়ে রয়েছে।"

"এখান দিয়ে মুনিয়ার মা গেল যখন গন্ধ পেলে না? গন্ধতেল না হলে ওদেব চলে না। তেল-সাবানের উপরই ওদের ঝোঁক বেশী।"

"ও যে, লোকের-বাড়ি কাজ করে কেন বুঝি না। অবস্থা তো বেশ। সেই লোকটা মারা যাবার সময় শুনি টাকাকড়ি কিছু রেখে গিয়েছে। নিজের বাড়ির উঠনে ইঁদারা আছে, গোরু-মোষ আছে, আমকাঁঠালের বাগান আছে। ওর বাগানের ক্ষীরকুষি কাঁঠাল খেয়েছ তো? অমন কাঁঠাল এখানে আর কারও নেই।"...

"ও কাজ করে জাতে উঠবার জন্য, ভাবে যে ভদ্রলোকদের বাড়িতে কাজ করলে ওর দুর্নাম একটু কমবে। বাঁধা কাজ তো করে না কোথাও;

শুধু ভোজে কাজে পুজা-পার্বণে লোকের বাড়ি কাজ করতে যায়। জিজ্ঞাসা করলে বলে মেয়েটার জন্য কিছু জমিয়ে রেখে যেতে হবে তো।"...

"মেয়ে মেয়ে করেই মরে! আহা, ওই একটিমাত্র তো মেয়ে ওর। জামাই সোনার দুল গড়িয়ে নিয়ে এসেছিল মুনিয়ার জন্য—এবার যখন মেয়েটাকে নিতে আসে। দেখাতে এনেছিল আমার কাছে। প্রণাম করে গেল মা মেয়েতে। মুনিয়ার কথাবার্তাব বেশ পরিপাটি।"

"এমনি তো বেশ—তবে ওই একধারা ওদের গুষ্টির!"

কথার মোড ঘুরছে প্রশংসাব দিকে, তাই মুনিয়ার মায়ের গল্প আব ঠিকমতো জমছে না।

"মুনিয়াটা গেল কোথায়? সেটাকে তো দেখছি না। মায়ের সঙ্গে আসতে তো দেখেছিলাম সাজগোজ করে।"

"খোঁজ নিয়ে দেখ—শোবার ঘরে ঘুরঘুব করছে হয়তো।"

রেণুর পিসিমাব তরকারি কোটা বন্ধ হল। তিনি রেণুর মাকে বললেন—"বউঠাকরুন, তুমি একবার শোবাব ঘর দেখে এস। কার মনে যে কি আছে, জানেন শুধু এক ভগবান।"

"কত দিক আমি একা সামলাই ঠাকুরঝি।"

তবু তাঁকে যেতেই হয়।

· ঠিক যা ভেবেছেন। যে ছোট ঘরটায় ছেলেদেব জামাকাপড় টাঙানো থাকে আলনায়, সেটা বেশ নিরিবিলি। তাই বেণুর সমবয়সীর দল সেই ঘরখানাকে বেছেছে আজ, জটলা করবাব জন্য।

·· তারই মধ্যে বসে রয়েছেন! কে আবাব—মুনিয়া।

মুনিয়া রেণুকে বলছে—"রেণুদি মন খারাপ কোরো না। ভাবনা কি, সব ঠিক হয়ে যাবে সতীমায়ের আশীর্বাদে। এমন চাকরিও তো দেখিনি। এক বছরের মধ্যে, আর ছুটি পাবে না নতুন বর? সেই এক বছর গেলে, তবে বিয়ের কনে আসবে, বরের সঙ্গে?"...

মুনিয়া বুঝতে পারছে না, তার কথা শুনে সকলে এত হাসছে কেন।

"এত হাসি কিসের রে তোদের?"

"গল্প শুনছি মুনিয়ার।"

"গল্প শোনাবার লোক জুটেছে ভাল দেখছি। রেণুর খুব তেষ্টা পেয়েছে? ওরে মুনিয়া, তুই একটু জলটল খেয়েছিস তো?"

"আমি বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি। মা কি না খাইয়ে বাড়ি থেকে বেরতে দেয়।"

"সে কি কথা! বিয়েবাড়িতে আসছিস—বাড়ি থেকে জলখাবার খেয়ে আসবি? সে কি কখনও হয়? কাজের বাড়ি—কখন ভাত খাওয়া তার কি ঠিক আছে? চল। ভাঁড়ার থেকে দুটো মিষ্টি বার করে দিই তোকে। দাঁড়িয়ে থাকলি কেন সঙের মতো? তুই এগো, আমি আসছি।"

মুনিয়া ঘরের বার হতেই, রেণুর মা চাপা গলায় বলে গেলেন—"এর সঙ্গে তোদের এত কি! ঘরের জিনিসপত্রের উপর একটু নজর রাখিস। সবাইকে বলছি—বুঝলি। আরে রেণু, তোকে একটু মিছরির সরবত করে এনে দেবো? না খেয়ে যদি থাকতে পারিস, তাহলে থাক।"

মুনিয়ার উপর নজর রাখবার কথা এত স্পষ্ট করে বলবার দরকার ছিল না। তাকে আগে বাইরে যেতে বলতেই—সকলে বুঝে গিয়েছিল ব্যাপারটা। বড়দের এই সন্দেহ-বাতিক দেখে, ছোটর দল নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। আসলে মুনিয়াকে খারাপ লাগে না তাদের কারও—রসের কথা বলে একেবারে হাসিয়ে হাসিয়ে মারে।

খওয়া-খওয়া গোছের চেহারা মুনিয়ার—কে বলবে যে বাইশ বছর বয়স হয়েছে তার। দেখে মনে হয় যেন চৌদ্দ-পনর বছরের মেয়েটি। পূর্ণ যৌবনের লাবণ্য ও আবেগ তার দেহে কোনদিনই আসেনি, কিন্তু প্রসাধন দিয়ে সে অভাবটুকু পুষিয়ে নেবার চেষ্টা আছে। না করলে মা বকে। একমাত্র সন্তান, তাই তার মায়ের সাধ, সব সময় মেয়েকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে রাখে।

মুনিয়া একটার বেশী মিষ্টি কিছুতেই নিল না। ওর কথাবার্তা, ব্যবহার চিরকাল রেণুর মাকে অবাক করে। ঠিক ঝি-চাকরদের সঙ্গে বসিয়ে একে

খেতে দেওয়া যায় না, নিজেরই লজ্জা-লজ্জা করে। অথচ নিজেদের সমান সমান ভাবতেও বাধে। ঠিক বোঝা যায় না এদের! মুনিয়ার-মাকেই দেখ না। এদিকে তো এত দুর্নাম। অথচ সেই লোকটা—কুষ্ঠরোগী—শেষদিন পর্যন্ত কি সেবাটাই না করছে। লোকে বলত টাকার লোভে করছে—আরে টাকার লোভে করার মধ্যেও কথা আছে তো!··

মেয়েটা এসেছে মায়েব সঙ্গে বিয়েবাড়িতে বেড়াতে। ঠিক ঝি-চাকরের কাজ করতে বলা যায় না তাকে।··

দাড়িওলা-মহাত্মার উপর বিয়েবাড়িব সারা কাজ তদাবকেব ভার। সে তরকারি কোটার জায়গায় এসে একবাব জোর তাগাদা দিয়ে গেল—"হাত চালিয়ে। হাত চালিয়ে।"

রেণুর মা আর তাঁব ঠাকুরঝিব চোখে চোখে ইশাবা খেলে গেল একটা।

"এ আলু-পটলের পাহাড আজ আব শেষ হবে না দেখছি। মুনিয়া, এঁদেব সঙ্গে বসে তুইও একটু তরকাবি কুটে দে তো মা।"

এ কাজে মুনিয়ার আগ্রহ মোটেই নাই। সে ফিবে যেতে চায় শোবার-ঘরে—রেণুদের কাছে। কিন্তু রেণুব মায়ের অনুবোধ ঠেলতে পারে না।

"কই, দেন দেখি একখানা বঁটি আমাকে। সে কী। আব বঁটি নেই?"

"আমি বরঞ্চ উঠি, তুই আমার বঁটিখানা নে মুনিয়া।"

"সে কি হয়, পিসিমা। তাহলে আর তবকাবি কোটার কাজ এগবে কি করে? আমি বরঞ্চ এক দৌড়ে আমাদেব বাড়ি থেকে বঁটিখানা নিয়ে আসি।"

উত্তর বা সমর্থনেব অপেক্ষা না করে, প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল মুনিয়া।

হাতে বঁটি, মুখে একমুখ হাসি নিয়ে ফিবল ঘণ্টা দুয়েক পর। তখন তরকারি কোটাব পর্ব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

"কি রে, বঁটি আনতে তোব এতক্ষণ লাগল?"

এ-কথার জবাব না দিয়ে, মুনিয়া গল্প আরম্ভ করল চাপা গলায়—যেন একটা অতি গোপন কথা বলছে।

"বরযাত্রীদের ওখানে গিয়েছিলাম। বর দেখে এলাম। একটা কথা বলি? লোক ভাল বলে মনে হল না। বুড়ো বরযাত্রীদের পিছন দিয়ে, নেঙিগেঙিদের ডিঙিয়ে পাশের ঘরে গেলাম বর দেখতে। দেখি বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে। আমাকে দেখেই বন্ধুরা ফিকফিক করে হাসে। জিজ্ঞাসা করে—কি? কি মনে করে? বঁটি হাতে যে? কাটবে নাকি তোমাদের নতুন বরকে? শোন একবার কথা! এই কি ভাল লোকের উপযুক্ত কথা? আমি এই বলে দিলাম পিসিমা—রেণুদির বররা লোক ভাল হবে না। দেখে রাখবেন। বর মাথা নীচু করে থাকে—আমার দিকে তাকাল না একবার—পারে না তাকাতে—চোখ নামিয়ে নেয়। ও কি! ওই যেসব মেনীমুখোগুলো মেয়েমানুষের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না, তারা মনখোলা লোক হয় না কিছুতেই!"

এতগুলো বঁটিতে তরকারি কোটা থেমে গেল এক সঙ্গে। সকলের চোখে কৌতুকের আভাস—মুখে চাপা হাসি। এক শুধু পিসিমার মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তিনিই এ বিয়ে ঠিক করেছেন। চেনা ছেলে, চেনা পরিবার। এসব খবর জানা না থাকায়, মুনিয়া অজানতে একরকম পিসিমার নিন্দাই করে ফেলেছে। তাই এই বিপত্তি।

পিসিমা কড়া মানুষ; বাজে কথাকে আশকারা দেন না।

"তরকারি কোটা তো শেষ হল, মুনিয়া ওই মাটির গ্লাসগুলো তুই ততক্ষণ ধুয়ে রাখ তো!"

পিসিমা এই হুকুমের মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁদের সঙ্গে বসে তরকারি কোটার যোগ্য মুনিয়ারা নয়; গ্লাস ধোয়া, জল আনা, এই সব তাদের কাজ—নেহাত বিনাপয়সার লোক বলে এঁটো বাসন মাজতে বলা হচ্ছে না মুনিয়াকে।···

"ওরে মুনিয়া, তোর মা কোথায় রে?"

"ওমা! আমি কেমন করে জানব সে কথা? আমি তো এই আসছি বাড়ি থেকে।"

কোথায় আবার গেল সে। অনেকক্ষণ থেকে দেখছি না তাকে। এই সব লোক দিয়ে কি বিয়েবাড়ির কাজ চলে। একটু যদি দায়িত্বজ্ঞান থাকে এদের! ও দাড়িওলা-মহাত্মা, তুমি একবার বাইরে হাঁক পেড়ে দেখ তো, মুনিয়ার মা ইঁদারাতলায় আছে কি। জ্বালাতন!"

মুনিয়ার মা তখন গোয়ালঘরে বিড়ি খেতে গিয়েছে। উরতের ঘায়ে গ্যাকড়া জড়াতে জড়াতে রামধনীর সঙ্গে গল্প চলছে তার।···

"তোরা তো কেবল আমার টাকাই দেখিস। টাকা থাকলে কি আর এই বিয়েবাড়িতে দিন একটাকায় কাজ করতে আসি। মেয়ের জন্য যে কত চিন্তা মায়ের, সে কথা যার একটিমাত্র মেয়ে সেই বুঝবে। অন্য লোকে বুঝবে না। জিজ্ঞাসা করিস রেণুদির মাকে—তাঁরও তো ওই একটিমাত্র মেয়ে। তোরা আমার টাকাটাই দেখিস, খরচা তো দেখিস না। গত বছর বিষহরির পুজোতে আমার খরচ হল, এককুড়ি সাতটাকা। অঘোরীবাবাকে হরিণ-মার্কা বোতল কিনে দিয়েছিলাম বারো টাকার। তুই পেসাদ পাবার জন্য যেতিস না রামধনী? বল, তুই বুকে হাত দিয়ে বল।"···

অঘোরীবাবার প্রসাদ পাবার কথা রামধনী অস্বীকাব করতে পারল না, কিন্তু বলল একেবারে অন্য কথা।

"অঘোরীবাবার মন্তরের ধক আছে।"

কথাটা কানে না তুলে মুনিয়ার মা বলে—"টাকাই দেখে লোকে আমার। প্রতি বছর যে সূর্যিঠাকুরের পুজো করি, তাতেও খরচ হয় এক কুড়ি টাকা। সেই লোকটা বেঁচে থাকতেই সূর্যিপুজো আরম্ভ করেছিলাম। করেছিলাম তারই জন্য। আজও দেখিস না রবিবার করি?"

"অঘোরীবাবার মন্তরের ধক আছে।"

কথাটার পুনরাবৃত্তি করে রামধনী জানিয়ে দিল সাটে যে সে মুনিয়ার মায়ের কথা একটুও বিশ্বাস করছে না। দুজনেই কথা

বলছে আভাসে ইঙ্গিতে। বাইরের লোক ধরতে পারবে না এসব কথার অন্তর্নিহিত অর্থ ; কিন্তু পাড়ার প্রত্যেকেই পারবে। মুনিয়ার মা বোঝাতে চায় যে, সে সবরকম পূজা করে, কুষ্ঠরোগের ভয়ে—অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। রামধনী জানিয়ে দেয় যে, সে ছেলেমানুষ না—সব বোঝে ; কেন মুনিয়ার মার এত সব তাক-তুক তন্ত্র-মন্ত্র, সে কথা সে জানে।

…"টাকাই দেখিস তোরা আমার। খরচ দেখিস না? জামাই যখন নিতে এসেছিল মেয়েকে এবার, তখন কত খরচ হল তার হিসাব রাখিস? জামাই যতবার মেয়ে নিতে আসে ততবার বিশ টাকা করে খরচ হয়। বছরে বছরে এ আমার লেগে আছে, সেই যবে থেকে মেয়ের আমার বিয়ে হয়েছে তবে থেকে।"

বিড়িতে সুখটান মেরে রামধনী আবার বলে—"অঘোরীবাবার মন্ত্রের ধক আছে।"

"ফের ওই কথা! এক কথা বারবার বলবি না বলছি! আমি যেটা বলছি সেটা কথাই না, তোর মনগড়া ধারণাটাই ঠিক—না?"

বিলক্ষণ চটে উঠেছে মুনিয়ার মা।

"আচ্ছা বাবা, ঘাট হয়েছে, আর বলব না। এ কি আমার নিজের ভাবা কথা? পাড়সুদ্ধ সবাই বলে।"

"পাড়ার লোকের খুরে খুরে দণ্ডবৎ। অঘোরীবাবাকে দিয়ে আমি তুক করাই? মায়ে কি কখন চায় যে মেয়ে স্বামীর ঘর না করুক? একমাত্র মেয়ে। কাছে থাকলে ভাল লাগে সে কথা ঠিক। কিন্তু তাই বলে তাকে স্বামীর কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনাবার জন্য তন্ত্র-মন্ত্র করাব! কি যে ভাবিস! বলিহারি তোদের বলায়! পাগল যত সব!"

রামধনী মুনিয়ার মাকে বেশী ঘাঁটাতে চায় না—চেনে তো তাকে। সেইজন্য অঘোরীবাবার মন্ত্রের কথাটা আর না তুলে অন্য কথা পাড়ে।

"যেতে দে ওকথা। তোর জামাইএর বিয়েতে খাওয়াচ্ছিস কবে?"

"দেখ ফের ফাজলামি করবি না বলছি, রামধনী! দেবো এমন এক থাবড়া!"

"তুই বেশী টাকার কথায় চটিস, অঘোরীবাবার মন্তরের কথায় চটিস, মেয়ে কাছে আনবার কথায় চটিস, জামাই-এর কথা উঠলে চটিস—তবে তোর সঙ্গে কোন কথা বলি বল! এই আমি চুপ করলাম।"

"না না আমি কি তাই বলছি! জামাইএর কথাই যদি তুললি তবে বলি শোন। জামাই আমার হীরের টুকরা। কী নরম স্বভাব! মিছরির মত মিষ্টি কথা। জামাইএর আমার কোন দোষ নেই। ভাল বাড়ির ছেলে। সিংহেশ্বরথানের কাছে কুশীর দহের কাছে তাদের মস্ত চৌচালা। সম্পন্ন গেরস্ত। দিন দশবিশখানা পাতা পড়ে; ভাতের সঙ্গে দু তরকারির কম চলে না ওদের বাড়িতে, গোরু, মোষ, খেত, খামার, এস জন বস জন সব আছে। মেয়েটা পড়েছিল ভাল ঘরে। ওর কপালে নেই, তার কি হবে। পালিয়ে পালিয়ে আসে। কত বোঝাই; কিছুতেই থাকবে না সেখানে। এবার তো গেলই না স্বামীর সঙ্গে। কি ঠাণ্ডা স্বভাব দেখেছিস তো জামাইএর? জোর করে কিছু বলতে পারে না মুনিয়াকে। শুধু আমার কাছে মেয়েমানুষের মত কান্নাকাটি করে বলে—আপনার মেয়েকে একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলুন। আরে, আমি কি আর বোঝাই না? কিন্তু মেয়ে যে শোনে না। হোক আমার মেয়ে, কিন্তু জামাই যদি সত্যি সত্যি আর একটা বিয়ে করে, তাহলে তাকে তো দোষ দিতে পারি না।"

"একটা গরিব ছেলের সঙ্গে তোর মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাকে ঘর-জামাই করে রাখতিস, তাহলে তোর সব দিক দিয়ে ঠিক হত।"

"আমিও এক এক সময় তাই ভাবি। আবার ভাবি, কী হত কে জানে। এবার জামাই ওকে নিতে এসে যে কদিন থাকল, ও মেয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কাছে ঘেঁষবে না জামাইএর। রাতেও আমার কাছে শোয়। আমি কত বোঝাই, পাড়ার মেয়েরা কত বোঝায়; তা কি শুনবে! কী করি আমি বল। আমার দোষ বল, যা বল, তা হচ্ছে এই যে আমি মেয়েকে বকতে পারি না। সে মানুষ যত দিন বেঁচে ছিল, মেয়েকে বকলে রাগ করত, তাই না-বকা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।"···

"রামধনী! রামধনী!"

কাজের-মানুষ দাড়িওলা-মহাত্মার চীৎকার। সেরেছে! এই দিকেই আসছেন! মুনিয়ার মা উঠে দাঁড়াল। রামধনী ছুটে বার হল গোয়ালঘর থেকে।

"আচ্ছা!...ও তুই ও আছিস বুঝি? মুনিয়ার মা নিজে তো কাজ করবিই না, কোন চাকর-বাকরকেও কাজ করতে দিবি না দেখছি।"

"সতীমায়ের দিব্যি বলছি দাড়িওলাদা, আমি এখনই এসেছি একটা বিড়ি খেতে। এই তো এক ডাঁই পোডাবাসন মেজে আনলাম বাইরের ইঁদারাতলা থেকে। তেমন পাওনি আমাকে। পয়স নেবো, আবার গেরস্তর কাজে ফাঁকি দেবো, তেমন মানুষ আমি না।"..

একবার আরম্ভ করলে, থামতে জানে না মুনিয়ার মা।

"আচ্ছা বাবা, থাম! কলাপাতাগুলো ধুয়ে রেখে দে!"

দাড়িওলা-মহাত্মা চলে গেল অন্য কাজে।

বিয়েবাড়িতে সকলেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত—কে কাকে চোখে চোখে রাখে। মুনিয়ার মায়ের উপর পড়েছিল বাসন মাজার ভার, সে থাকল বাইরে বাইরে। মুনিয়াকে কিন্তু কিছুতেই কাজে আটকে রাখা গেল না। ফাঁক পেলেই সে শোবার ঘরে রেণুদের দলে গিয়ে বসে, রেণুর কাছে ঘেঁষে বসতে চায়। বেণুর মা মাঝে একবার দেখতে পেয়ে তার উপর বাদামের খোসা ছাডাবার, আর কিসমিস বাছবার ডিউটি দিলেন। সে নিজেদের বাড়ি থেকে গা ধুয়ে আসবাব নাম করে বেরিয়ে গেল। ফিরে এল সেই সন্ধ্যার সময়।

রেণুর পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন—"কি রে মুনিয়া, তুই যে আবার নতুন করে সাজগোজ করে এলি দেখছি। কাগজে জড়ানো ওটা কিরে তোর হাতে?"

"একখান গায়ে দেবার চাদর নিয়ে এলাম সঙ্গে করে। আজ এখানে রাত কাটাতে হবে তো মশার কামড়ের মধ্যে। সারারাত জেগে থাকতে আমি পারি না। শেষরাত্রে চাদরখান মুড়ি দিয়ে কোথাও শুয়ে থাকব।"

"বেশ গোছালো তো তুই।"

"গোছালো আমি মোটেই নই পিসিমা। মা তো আমায় উঠতে বসতে খোঁটা দেয় অগোছালো বলে! শুধু মশার কামড় সহ্য করতে পারি না বলেই চাদরের কথাটা মনে পড়েছে।"

পিসিমা আবার পাছে তাকে কোন নতুন কাজ করতে বলেন সেই ভয়ে মুনিয়া তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

বিয়ের পর অনেক রাত্রে পুরুষরা যখন খেতে বসেছে, তখন রেণুর পিসিমা দোতলায় একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজতে গেলেন। খুব মাথা ধরেছে তাঁর। মাথা ধরার আর দোষ কি—যা ধকল গিয়েছে শরীরের উপর দিয়ে সারাদিন। ছোট-ঘরখান অন্ধকার আর নিরিবিলি দেখে ঠিক করলেন, সেখানেই একটু গড়িয়ে নেবেন। ঘরে ঢুকতেই মনে হল কে যেন ছেলেদের জামাকাপড়ের আলনা হাতড়াচ্ছে।······ছেলেরাই কেউ হবে বোধ হয়। কিন্তু আলো নিয়ে খোঁজে না কেন?·········

"কে রে?"

কোন উত্তর এল না।

"কে রে তুই? সাড়া দিচ্ছিস না কেন?"

"আজ্ঞে আমি মেজবাবুর চাকর।"

অচেনা গলা! মেজবাবু তো এ বাড়িতে কেউ নাই! তবে কি বরযাত্রীদের দলে কেউ মেজবাবু আছে? না তো। বরযাত্রীরাও তো সবাই তাঁর চেনা। খটকা লাগল পিসিমার। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। তবু তাঁর মনের জোর খুব। বাইরে থেকে দরজায় শিকল টেনে দিয়ে তিনি চীৎকার করলেন—"চোর! চোর!" একেবারে হুলস্থুল বেধে গেল বিয়েবাড়িতে। চোর ধরা পড়ল বামাল। মেলা বসে গেল তাকে ঘিরে। চাঁদা করে প্রহার দেবার ঘটা, খানিক আগের বিয়ের জাঁকজমককেও কানা করে দিল। চোরের নাক মুখ ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড, তবু প্রহারের বিরাম নাই।

"অনেক হয়েছে, আর মের না। এবার মরে যাবে লোকটা।"

কে? ভিড়ের মধ্যে থেকে কে বলল কথাটা? মুনিয়ার মায়ের গলার মত মনে হল না? সহস্রজোড়া মৃত্যুসন্ধানী চোখ খুঁজে বার করল মুনিয়ার মাকে। সে দিকে তাকিয়ে রেণুর বাবা তাড়া দিয়ে উঠলেন—"থাম থাম। বেশী বকিস না।"

বরকর্তা বিরক্তির স্বরে রেণুর বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ওটা আবার কে?"

দাড়িওলা-মহাত্মা প্রতিবাদ জানাল—"আর মারলে সত্যিই মরে যাবে লোকটা।"

মুনিয়া দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। কথাটা শুনে সে তার পার্শ্ববর্তিনীকে বলল—"বরের গুষ্টির লোকরা ভাল না। কথার ধরন দেখলেন না?"

প্রচুর জেরা করেও চোরের মুখ থেকে আর একটা কথাও বার করা গেল না। দাড়িওলা-মহাত্মার সনির্বন্ধ অনুরোধে পুলিসে না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল লোকটাকে।

চোরের পর্ব শেষ হল বটে, কিন্তু বাড়ির লোকদের মনে একটু খটকা লেগে রইল, মুনিয়া আর মুনিয়ার মায়ের সম্বন্ধে।.........চোরের উপর দরদ দরকারের চেয়েও যেন একটু বেশী মনে হল মুনিয়ার মায়ের।...... মুনিয়াটাও ছিল সারাদিন রেণুদের সঙ্গে ওই ছোট ঘরখানায়; ছুতোর নাতায় বাড়িও গিয়েছে বার কয়েক, কোথায় কোন জিনিস থাকে খবর দিয়ে আসেনি তো সেই সময়?..... কিছু বিশ্বাস নাই ও গুষ্টিকে।......

এর পর বাসরঘর আর ভাল জমল না।

পরের দিন সবই তাড়াতাড়ি; বাসি বিয়ের পর আড়াইটার গাড়িতে বরকনে যাবে; কত ব্যবস্থা করতে হবে; কত গোছগাছ বাকি; সময় পাওয়া যাচ্ছে না মোটে। তার উপর সকাল থেকে একটু বাদলা বাদলা করায় অব্যবস্থা আরও বেড়েছে।

মুনিয়া দোতলা থেকে নীচে নামেনি। ঘুরঘুর করছে এ-ঘর ও-ঘর সকাল থেকে! তার গায়ের চাদরখানা সকলেরই নজরে পড়ে।...বাদলা

হাওয়া দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু তাই বলে চাদর গায়ে দেবার মত ঠাণ্ডা পড়েনি। এত লোক বিয়েবাড়িতে, কই আর কেউ তো দেয়নি চাদর গায়ে। ·

"ওরে ও মুনিয়া, তোব কি শরীর খারাপ হল নাকি?"

"বাসরে রাত জেগে একটু যেন সিবসির করছে গা। রাত জাগলে আমার তাই হয়—যতক্ষণ না স্নান করছি ততক্ষণ।"

"তা স্নান কবে নে না কেন।"

"রেণুদিরা চলে যাক। একেবারে তারপর বাড়ি ফিরে স্নান করে ঘুম দেওয়া যাবে। বিয়েবাড়ি—কোথায় কাপড—কোথায় গামছা—কোথায় ভিজে কাপড শুকতে দেবো—নানান লেঠা। তার উপর এই বাদলা। কাল রাতে তো আকাশ দিব্যি পরিষ্কার ছিল—কোথা থেকে যে এত মেঘ এল। প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাবার দিনে হঠাৎ বাদলা নামলে শুনেছি—মেয়েকে চোখেব জল ফেলতে হয় সেখানে সাবাজীবন ধবে।"—

পিসিমা এক তাডায় মুনিয়াকে থামিয়ে দিলেন। যত সব অলক্ষুণে কথা। একটুও কি বুঝ আছে এদেব। এদেব মা মেয়েকে বিয়েবাড়িতে ঢুকতে দেওয়াই ভুল হয়েছে। আমরা তো এসব কখনও শুনিনি।

নতুন জামাই-বাড়ির নিন্দা করলে পিসিমার গায়ে লাগে।

পিসিমার তাডা খেয়ে মুনিয়া গিয়ে বসে যেখানে বেণুব বাক্স-পেটরা গুছানো হচ্ছে, তাবই কাছে। সেখানে অনেক লোক। ছেলেপিলের ভিড। এ কাজে সকলেবই উৎসাহ প্রচুর। বডদের বকুনি উপেক্ষা করে, নিজেদের বুদ্ধিমত যে যেমন পাবছে, বাক্সে তুলে রাখছে। বাড়িব একমাত্র মেয়ে রেণু—বিয়েতে কাপডচোপড হয়েছে প্রচুব। লোকে দিয়েওছে অনেক। তার উপর অনেক দিন আসা হবে না—জামাইএর সব ছুটি খরচ হয়ে গিয়েছে—বিয়ের জন্য অতি কষ্টে দুদিনেব ছুটি পেয়েছে—তাই জিনিস-পত্র গোছগাছের দবকার আরও বেশী।·· যাক, এখন তো আর সেকালকার মত ছোটতে বিয়ে হয় না—রেণু গোছালো মেয়ে—গুছিয়ে সংসার করতে পারবে—কিছুকাল করুক স্বামীর ঘর, বিয়ের কনে গিয়েই।

এরই মধ্যে মুনিয়া বড়-বাক্সটার মধ্যে ঝুঁকে পড়ে কাপড়-চোপড় সাজাতে আরম্ভ করে।

"এমনি করে চেপে চেপে না দিলে কখনও এত জিনিস আঁটে।"

"আচ্ছা, সর তুই একটু মুনিয়া। যদি আঁটাতে না পারি তখন বলিস।"

বড়রা আড়চোখে একবার মুনিয়াব হাতের দিকে তাকাল। কিছু সরিয়ে ফেলল না তো এই মুহূর্তে?

বোঝা যায় না কিছু। ওব হাত তো চাদবের মধ্যে লুকনো নয়। গয়নাগাঁটি হলেও না হয় হত, কিন্তু শাড়ি জামা এমন জিনিস নয় যে, শেমিজের মধ্যে লুকিয়ে নেবে।...

খোলা বাক্সব দিকেও সবাই তাকিয়ে নিল একবাব। উপবের জামা-কাপড়গুলো সব ঠিক আছে, কিছু কমেছে বলে বোঝা গেল না।

"আব বাখা যাচ্ছে না গায়ে চাদবখানা। গবম লাগছে। এই গরম, এই ঠাণ্ডা। আমার অমনিই হয়। কোন বোগই নাকি কে জানে। এই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে শীতে, এই দেখবেন বিনকুড়ি বিনকুড়ি ঘামে ভিজে উঠেছে সাবা গা। তখন স্নান না কবে আব থাকতে পাবি না।"

মুনিয়া চাদবখানা গা থেকে খুলে মেঝেতে রাখে। যারা চাদব মুড়ি দেওয়ার জন্য মুনিযাব উপব সন্দেহ কবছিল এতক্ষণ, তাবা অপ্রতিভ হয়ে, এ ওব মুখ চাওয়া-চাওয়ি কবে। তাদের এতক্ষণকার সব হিসাব গুলিয়ে দিয়েছে মুনিয়া। তবে?

"তা তুই এখনই স্নান কবতে যাবি নাকি মুনিয়া?"

"দেখি এই চাদবখানাকে ভিজিয়েই স্নানটা এখানে সেরে নেওয়া যায় কি না।"

...নিজেদেব বাড়িতে স্নান করতে গেলে তবু যেন কিছুটা হিসাবে মিলত।

এর কিছুক্ষণ পবের কথা। রেণু স্নানেব ঘর থেকে বাব হচ্ছে। দরজা খুলতেই দেখে সম্মুখে মুনিয়া দাঁড়িয়ে। তারই জন্য অপেক্ষা করছে, একটা

হাওয়া দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু তাই বলে চাদর গায়ে দেবার মত ঠাণ্ডা পড়েনি। এত লোক বিয়েবাড়িতে, কই আর কেউ তো দেয়নি চাদর গায়ে!···

"ওরে ও মুনিয়া, তোর কি শরীর খারাপ হল নাকি?"

"বাসরে রাত জেগে একটু যেন সিরসির করছে গা। রাত জাগলে আমার তাই হয়—যতক্ষণ না স্নান করছি ততক্ষণ।"

"তা স্নান করে নে না কেন।"

"রেণুদিরা চলে যাক। একেবারে তারপর বাড়ি ফিরে স্নান করে ঘুম দেওয়া যাবে। বিয়েবাড়ি—কোথায় কাপড—কোথায় গামছা—কোথায় ভিজে কাপড় শুকতে দেবো—নানান লেঠা! তার উপর এই বাদলা! কাল রাতে তো আকাশ দিব্যি পরিষ্কার ছিল—কোথা থেকে যে এত মেঘ এল! প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাবার দিনে হঠাৎ বাদলা নামলে শুনেছি—মেয়েকে চোখের জল ফেলতে হয় সেখানে সারাজীবন ধরে।"—

পিসিমা এক তাড়ায় মুনিয়াকে থামিয়ে দিলেন।···যত সব অলক্ষুণে কথা!···একটুও কি বুঝ আছে এদের! এদের মা মেয়েকে বিয়েবাড়িতে ঢুকতে দেওয়াই ভুল হয়েছে। আমরা তো এসব কখনও শুনিনি।···

নতুন জামাই-বাড়ির নিন্দা করলে পিসিমার গায়ে লাগে।

পিসিমার তাড়া খেয়ে মুনিয়া গিয়ে বসে যেখানে রেণুর বাক্স-পেঁটরা গুছানো হচ্ছে, তারই কাছে। সেখানে অনেক লোক। ছেলেপিলের ভিড়। এ কাজে সকলেরই উৎসাহ প্রচুর। বড়দের বকুনি উপেক্ষা করে, নিজেদের বুদ্ধিমত যে যেমন পারছে, বাক্সে তুলে রাখছে। বাড়ির একমাত্র মেয়ে রেণু—বিয়েতে কাপড়চোপড় হয়েছে প্রচুর। লোকে দিয়েওছে অনেক। তার উপর অনেক দিন আসা হবে না—জামাইএর সব ছুটি খরচ হয়ে গিয়েছে—বিয়ের জন্য অতি কষ্টে দুদিনের ছুটি পেয়েছে—তাই জিনিস-পত্র গোছগাছের দরকার আরও বেশী।···যাক, এখন তো আর সেকালকার মত ছোটতে বিয়ে হয় না—রেণু গোছালো মেয়ে—গুছিয়ে সংসার করতে পারবে—কিছুকাল করুক স্বামীর ঘর, বিয়ের কনে গিয়েই।

এরই মধ্যে মুনিয়া বড়-বাক্সটার মধ্যে ঝুঁকে পড়ে কাপড়-চোপড় সাজাতে আরম্ভ করে।

"এমনি করে চেপে চেপে না দিলে কখনও এত জিনিস আঁটে।"

"আচ্ছা, সর তুই একটু মুনিয়া। যদি আঁটাতে না পারি তখন বলিস।"

বডরা আডচোখে একবাব মুনিয়াব হাতেব দিকে তাকাল। কিছু সরিয়ে ফেলল না তো এই মুহূর্তে?

বোঝা যায় না কিছু। ওর হাত তো চাদরের মধ্যে লুকনো নয়। গয়নাগাঁটি হলেও না হয় হত, কিন্তু শাড়ি জামা এমন জিনিস নয় যে, শেমিজের মধ্যে লুকিয়ে নেবে।···

খোলা বাক্সব দিকেও সবাই তাকিয়ে নিল একবাব। উপরের জামা-কাপডগুলো সব ঠিক আছে, কিছু কমেছে বলে বোঝা গেল না।

"আব বাখা যাচ্ছে না গায়ে চাদবখানা। গরম লাগছে। এই গবম, এই ঠাণ্ডা। আমার অমনিই হয়। কোন বোগই নাকি কে জানে। এই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে শীতে, এই দেখবেন বিনকুডি বিনকুডি ঘামে ভিজে উঠেছে সাবা গা। তখন স্নান না কবে আর থাকতে পাবি না।"

মুনিয়া চাদবখানা গা থেকে খুলে মেঝেতে রাখে। যাবা চাদর মুড়ি দেওয়ার জন্য মুনিয়াব উপব সন্দেহ করছিল এতক্ষণ, তারা অপ্রতিভ হয়ে, এ ওব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তাদের এতক্ষণকার সব হিসাব গুলিয়ে দিয়েছে মুনিয়া। তবে?

"তা তুই এখনই স্নান কবতে যাবি নাকি মুনিয়া?"

'দেখি এই চাদবখানাকে ভিজিয়েই স্নানটা এখানে সেরে নেওয়া যায় কি না।"

···নিজেদেব বাডিতে স্নান করতে গেলে তবু যেন কিছুটা হিসাবে মিলত।

এব কিছুক্ষণ পরেব কথা। রেণু স্নানের ঘর থেকে বাব হচ্ছে। দরজা খুলতেই দেখে সম্মুখে মুনিয়া দাঁড়িয়ে। তারই জন্য অপেক্ষা করছে, একটা

বিশেষ জরুরী কথা বলবার আছে। ফিসফিস করে বলে—"রেণুদি, কালকে থেকে কত চেষ্টা করছি; তোমায় একা আর কিছুতেই পাচ্ছি না। এখনই আবার কে এসে পড়বে! তোমার বড়-বাক্সে কাপড়চোপড়গুলোর নীচে, আমার দুতিনবার ব্যবহার করা, পয়মন্ত ধুনুচিটা, আর খানিকটা ধুনোগুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি। সেখানে কেউ জিজ্ঞাসা করলে বোলো—মা দিয়েছেন পুজার জন্য।"

রেণু অবাক হয়ে গিয়েছে।

"ধুনুচি কি হবে?"

"চুপ! আস্তে। বলছি শোন। ও ধুনুচির আর আমার দরকার নাই; আর আমার শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে না। শুনছি আমার বর আবার বিয়ে করছে শীগগিরই। ধুনুচিতে, ঘুঁটে কিংবা কাঠকয়লার গুলের আগুন জেলে, মাথায় নিয়ে রাত্রে হাঁটতে হয়। মাঝে মাঝে এক খাবলা করে ধুনোগুঁড়ো দেবে, আর দপ্ করে আগুন জলে উঠবে। মনে মনে রাম নাম জপো। দত্যি-দানোর কথা বাদ দাও, কোন মানুষও তোমার পিছু নিতে সাহস করবে না। চোর, ডাকাত, আছে তো আরও কত রকমের বদলোক পৃথিবীতে। দূর থেকে সবাই ভাববে আলেয়া-ভূত। কুশীর দহের ধার দিয়ে রাত দুপুরে আসবার সময়, এ সব আমার দুতিনবার করে দেখা। একটুও ভেব না তুমি রেণুদি—এক বছর তোমাকে সেখানে থাকতে হবে না। যখন ইচ্ছা পালিয়ে এস। এই রে! কে যেন আসছে! পালাই।"

* * *

শুনে প্রাণখুলে হাসি। তখন কি ছাই বুঝেছি যে ওই হাসির ব্যাপারের মধ্যে শুভাকাঙ্ক্ষিনী ও শুভাস্পদার জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত লুকিয়ে

থাকতে পারে! মুহূর্তটা হালকা-হাসির পোশাকে এসেছিল! কোন বেশে যে কখন আসে বহুরূপী!...ঠিক, শত্রুকে গুলি করে মারবার মুহূর্তে, মনে কী হয়?...জানতে ইচ্ছা করে!...

"হাঁ রে রেণু, তোর শাশুড়ী স্বর্গে যাবার সময়, ভাশুরকে তোর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে, কী মনে হয়েছিল রে তোর?"

"অত দিনের কথা কি মনে থাকে? ভাশুর স্বর্গে গিয়েছেন শুনেছেন তো?"

"হাঁ, সে খবর বৌদি চিঠিতে লিখেছিলেন। ভাশুর বেঁচে থাকলে কি আজ আবার যেতে পারতিস সেখানে?"

"সেকথা বলতে পারি না। ভাশুর থাকলে হয়তো সেখানকার লোকদের আমাকে নিয়ে যাবার সাহস হত না। বলতে পারি না ঠিক। তবে তার সঙ্গে আমার এখানে থাকবার কোন সম্বন্ধ নাই। শুনুন তাহলে একটা কথা। যে কথা এতদিন বলবার সাহস আমার ছিল না। মাকেও বলেছি কিছুদিন আগে। সেখানেও চিঠি লিখে জানিয়েছি।"

এই সূত্রে রেণুর এখানে এসে থাকবার কারণ যা শুনলাম, তা যেমন অদ্ভুত তেমনি অবিশ্বাস্য। এত বোকাও হয় মেয়েরা! আজকালকার দিনেও! আর মণি? সেটার মনের আঁচ পেয়েছিলাম আগেই; কিন্তু এতদূর তা ভাবতে পারিনি।

রেণুর, এখানে চলে আসবার কারণ সম্বন্ধে পরিষ্কার আলোচনা হয়নি, দাদা বউদি বা রেণুর সঙ্গে কোনদিন। ও কথা কি আলোচনা করা যায়? মণিকে আবার সদরে বদলি করে দিয়েছিল, তারপরই

রেণু এখানে চলে আসে। এর থেকেই আমরা মোটামুটি একটা ধারণা করে নিয়েছিলাম, যে ভাশুরের ভয়েই ও এখানে এসে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

রেণু যখন প্রথম আসে তখন ওর বাবার খুব অসুখ। সে দিনরাত বাবার শুশ্রূষা করেছে; পাড়ার লোকে ধন্য ধন্য করেছে। এই প্রতি-বেশিনীরাই আবার বছর খানেক পর থেকে প্রয়োজন ও শোভনের চেয়ে অতিরিক্ত কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, তার এখানে থাকবার কারণটা জানবার জন্য।

…"থাকুক এখানে এখন যতদিন পারে।…যতদিন ওর স্বামী ছাড়ে। বিয়ের পরই তো মেয়েরা পরের ধন হয়ে যায়।…এত বুঝে কটা জামাই কাজ করে। মেয়ে এখন থাকলে তোমাব মনটা তবু একটু ভাল থাকবে রেণুর মা! তোমাব তো ওই একটিই!

…তবে হ্যাঁ, জামাই এর আব এখন হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হবে না, রেণু না থাকুক, রেণুর জা আছে। কিন্তু কি যে চাকরি বুঝি না! লাটসাহেবের চাকরিতেও তো শুনেছি ছুটি আছে।· হ্যাঁ রেণুর মা, জামাই চিঠিপত্র দেয় তো?"…

প্রতিবেশিনীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন—"কি চাপা! কোন দিন কি এদের মুখ থেকে একটা কথা কেউ বার করতে পেরেছে!"

'এদের' মানে, রেণু আর রেণুর মা। বেণুর মা নিজেই ব্যাপাবটা ঠিক জানেন না, ওই আন্দাজে যেটুকু বুঝেছেন। রেণু নিজে কিছু বলেনি। রেণুর পিসিমা পর্যন্ত সুনিশ্চিত কিছু বলেননি···শুধু নাক-কান মলেছেন যে আর জীবনে কোনদিন তিনি কারও বিয়ের ঘটকালির মধ্যে থাকবেন না।

তবে রেণুর বাবার মত চাপা লোকও, ওই অসুখের মধ্যে, জামাই-এর সম্বন্ধে একটা কথা বলেছিলেন আমার কাছে।—"মণিটা কি ছোটলোক দেখেছ? রেণুর গয়নাগাঁটিগুলো পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে! রেণু কিছু বলেনি এসম্বন্ধে এখানে। ওর মা একদিন গয়নার কথা জিজ্ঞাসা করাতে কেঁদে

ফেলেছিল। সেই থেকে আর কোনদিন কেউ সে কথা তোলে না ওর কাছে।"

এ নিয়ে কত কথা, কত জল্পনা কল্পনা।

কিছুকাল পরে বউদি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন—"রেণুকে গুরুদেবের কাছে দীক্ষা দিইয়ে দিলে কেমন হয়? একটা কিছু নিয়ে তাহলে তবু থাকতে পারে—সারাজীবন যে মেয়েটার সম্মুখে পড়ে। পুজো-আচ্চার উপর ওর ঝোঁক চিরকালের।

...কী যে করি ওকে নিয়ে ভেবেও পাই না।...তুমি কী বলো ঠাকুরপো? কথা বলছ না যে?"...

চোখে জল এসে গিয়েছিল বউদির এ কথা বলবার সময়। আমি হ্যাঁ না কিছু বলিনি।...

এখন রেণুর মুখে আগাগোড়া ব্যাপারটা শুনে, হাসব কি কাঁদব ঠিক করতে পারি না। এ বিষয়ে আমাদের সকলেরই অনুমান ছিল ভুল।

*　　　*　　　*

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। গাঢ় ঘুম আসেনি। জেগেই ছিল মণি অনেক রাত পর্যন্ত, দুশ্চিন্তায়। রেণু অসুস্থ।...হ্যাঁ অসুস্থ ছাড়া আর কী বলা যায়। অফিস থেকে এসে দেখে যে সে কাঁদছে। জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেয় না; চোখে আরও জল আসে।...শরীর খারাপ হয়েছে? না। বাড়ি থেকে কোন খারাপ খবর এসেছে? না। মাথা ধরেছে? না। পাড়ার কেউ কিছু বলেছে? না। তবে হল কি?

রেণু নিরুত্তর। আমাকে বলবে তবে তো বুঝব! না না তোমাকে জানতে হবে না—তুমি অমন করে জিজ্ঞাসা কোরো না আর আমাকে! ভুকরে ভুকরে কাঁদতে লাগল সে।

তাকে প্রশ্ন করা ছাড়তে হল মণিকে।…হিষ্টিরিয়া নয়ত? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? না, তা কি করে হবে; লোক চিনতে পারছে; উনুন ধরিয়ে চায়ের জল চড়াচ্ছে স্বামীর জন্য!…মন একটু দুর্বল রেণুর চিরদিনই। চোখের জল হাতধরা। বাতিক আছে নানা-রকম। একটুতেই ব্যস্ত হয়। বিয়ের রাত্রিতে বাসরঘরে তার মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল, বাড়িতে চোর আসবার খবর শুনে, এ-জিনিস মণির নজর এড়ায়নি।…তার অত্যধিক উদ্বেগ সে বিয়ের সময় থেকেই লক্ষ্য করেছে। বিয়ের কনেকে নিয়ে আসবার সময়, সঙ্গের লটবহরের জন্য 'চেকার' ধরতে পারে ভেবে, প্রতি জংশন স্টেশনে রেণুর কী দুশ্চিন্তা!…এসব মানুষের মনের ব্যারাম হওয়া বিচিত্র নয়।…অযথা ভেবে মরা অভ্যাস রেণুর। বাড়ি থেকে বার হবার সময় স্বামী ছাতা না নিয়ে বেরুলে ভেবে আকুল হয়। অফিসের ছুটির সময় জোরে মেঘ ডাকলে বা ঝড়বৃষ্টি এলে ঘরের দেয়ালে টাঙানো মাকালীর ছবিতে পয়সা ঠেকিয়ে রেখে দেয়—পরে পুজো দেবার জন্য।…অদ্ভুত মেয়ে! মুখ ফুটে বলবে না তার অসুখের কথা পরিষ্কার করে! কিসের কষ্ট—কোথায় ব্যথা বললেও তো একটা কিছু ব্যবস্থা হতে পারে!…লেডী ডাক্তারকে ডাকার দরকার নাকি? …ভেবে ঠিক করতে পারে না মণি।…রেণু কি কথা শোনে!…আজকের দিনটা না হয় নাই রাঁধলে—একটু বিশ্রাম করলে বোধহয় শরীর আর মন দুই-ই ভাল হয়ে যাবে।…কে কার কথা শুনছে।…এত কান্নাকাটির মধ্যেও নিজের জিদ বজায় আছে সাবেক দস্তুর।…নরম স্বভাব; কথা কম বলে, কিন্তু একবার যদি মুখ থেকে 'না' বার হল, তবে আবার ওকে হাঁ বলাও তো। মাথা কুটে মরে গেলেও পারবে না।…আজ রুটি বেলা শিখব—এই বলে সে গিয়েছিল রান্নাঘরে স্ত্রীকে একটু সাহায্য করতে। তাতেও রেণু 'না' করে দিয়েছে।…আর কিছু বলতে ভরসা পায়নি মণি।…চুপ করে

থাকাই ভাল।…প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় সেরিস্তাদারবাবুর বাড়িতে আদালতের আমলাদের একটা আড্ডা বসে। সেখানে মুনসিফ আর সাবজজের আধুনিকতম খেয়ালের সম্বন্ধে খোশগল্প না করলে, মন খুঁতখুঁত করে, প্রাত্যহিক বরাদ্দ তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার একটা অভাববোধ মনকে পীড়া দেয়। তবু আজ সে বাড়িতেই ছিল—স্ত্রীর কথা ভেবে। আড্ডায় না যাওয়ার জন্য কাল অফিসে নিশ্চয়ই জবাবদিহি করতে হবে সহকর্মীদের কাছে।—স্ত্রীর অসুখের কথা বললে, আবার নানা কৈফিয়ত দিতে হবে। কি অসুখ? কেমন অসুখ?—একেই তো তাকে একটু স্ত্রৈণ বলে হাসি-মস্করা করে তারা, কিন্তু এই অবস্থায় স্ত্রীকে ফেলে কখন যাওয়া যায়?

মণি ঠিক করেছিল সারারাত জেগে থাকবে—রেণুর উপর একটু নজর রাখবার জন্য—অসুস্থ শরীর—কখন কি দরকার হয় বলা তো যায় না! খাওয়া দাওয়ার পর লণ্ঠন আর বই নিয়ে বসেছিল। কিছুক্ষণ পর থেকে, আর কিছুতেই পড়ায় মন বসে না। রেণু মশারির মধ্যে, বুঝতে পারা যাচ্ছে যে সে ঘুময়নি। একবার রেণু জিজ্ঞাসাও করেছিল—"তুমি ঘুমলে না আজ?" "এই শুচ্ছি।"…কথার সুরে বোঝা যায় যে সে জেগে বসে থাকায়, স্ত্রী অস্বস্তি বোধ করছে—নিজেকে দোষী মনে করছে।…সে রাত জাগতে পারে না একথা যে স্ত্রীর জানা।…মশার জ্বালায় সুস্থির হয়ে মশারির বাইরে বসবারও জো নাই!…রাত প্রায় বারোটার সময় সে মশারির ভিতর এসে শোয়।… কিন্তু সে ঘুমবে না কিছুতেই। শোবার সময় চিরকালের অভ্যাসমত চাবির রিংটা জামার পকেট থেকে বার করে বালিশের নীচে রাখে।… বোঝা যাচ্ছে যে রেণু জেগে। উশখুশ করছে। কোন কষ্ট হচ্ছে বুঝি! একবার উঠে বাইরেও গেল। আবার এসে শুল।… সরকারী কাছারির ঘড়িতে একটা বাজবার ঘণ্টা সে শুনেছে।

"রেণু, জেগে নাকি?"

মনে হচ্ছে জেগে আছে, কিন্তু সে কোন জবাব দিল না। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দতেও মনে হয় জেগে আছে সে। রেণু এতক্ষণের মধ্যে বহুবার এপাশ ওপাশ করেছে। অবশ্য ঘুমের মধ্যেও লোকে পাশ ফেরে! কিন্তু সে জেগে

আছে কিনা জিজ্ঞাসা করবার পর থেকে তার পাশ ফেরাও বন্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ একই কাতে শুয়ে থেকে, সে বোধহয় বোঝাতে চেষ্টা করছে যে সে ঘুমিয়ে আছে! বোধহয় কোন কথা বলতে ইচ্ছা করছে না, অসুস্থতার জন্য! কিংবা হয়ত ভাবছে যে তাকে ঘুমতে দেখলে স্বামীও একটু নিরুদ্বেগ হয়ে ঘুমতে পারে। নিজের কষ্ট যতই হোক, বুঝছে তো যে তারই জন্য আজ স্বামী রাত জাগছে, আজ রাত জাগলে কাল অফিস করবে কি করে?...বিছানায় শুয়ে শুয়ে এইভাবে স্ত্রীর আচরণের ব্যাখ্যা করতেই মণির ভাল লাগছিল আজ।...কপালে হাত দিয়ে গা গরম কিনা দেখবার অছিলায়, রেণুর চোখের পাতার উপর দিয়ে, বলিশের উপর দিয়ে একটু আঙুল বুলিয়ে নিল মণি।... বালিশ ভিজে নয়। চোখের কোনা ভিজে নয়। কাঁদছে না এখন। চোখের পাতা যেন একটু কেঁপেছিল আঙুলের ছোঁয়া লেগে!...ঘুমন্ত লোকের চোখ ছুঁলে চোখের পাতা কাঁপে নাকি?...কে জানে! মণি আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে আরম্ভ করে।...রেণু ঘামছে। গরম লাগছে।... হাতপাখাটা তুলে নেয় মণি।...ঢং ঢং করে দুটো বাজল। চোখ ভারী হয়ে এসেছে অনেকক্ষণ আগেই। পাখা করতে করতে বার বার পাখাখানা রেণুর গায়ে লেগে যাচ্ছে। প্রতিবার সে পাখাখানাকে একবার বিছানায় ঠুকে নিচ্ছে—স্ত্রীর কথা ভেবেই। স্ত্রী এসব বড্ডো মানে; প্রতি রাত্রে পাখা করবার সময় স্বামীর গায়ে পাখা লাগলে, 'আহা' বলে পাখাখানাকে ঠুকে নেয়। এ নিয়ে ঠাট্টা করলে, বোঝায় গম্ভীর হয়ে যে এতে অমঙ্গল হয়।... এখন সে জেগে রয়েছে, পাখা না ঠুকে নিলে আবার হয়ত ভাবতে পারে যে স্বামী আমার অমঙ্গলের জন্য একটুও চিন্তিত নয়! আসলে স্ত্রীর অমঙ্গলের আশঙ্কায় সে নিজেই চিন্তিত, কিন্তু স্ত্রীকে এতদিন এ নিয়ে ঠাট্টা করবার পর, নিজের আচরণ নিজের চোখেই অসঙ্গত ঠেকছে, তাই সে একটা অছিলা খুঁজছে, তার পাখা ঠুকবার ব্যাখ্যায়।...একবার রেণু নিজেই তার গা থেকে পাখাখানাকে সরিয়ে দিতে, মণি বোঝে যে তার বেশ ঘুম এসে গিয়েছে— তন্দ্রার ঘোরে পাখাখানা পড়েছিল স্ত্রীর গায়ে। রেণু সরিয়ে দিল সন্তর্পণে— পাছে স্বামীর ঘুম ভেঙে যায়, সেই জন্যই তার এই সতর্কতা।

এর পর আর মণির মনে নাই।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানে না। মানসিক উদ্বেগ থাকলে ঘুম গভীর হয় না। তাই জন্যই কি হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল? ঘুমের ঘোরে মনে হল যেন খাটখানা হঠাৎ নড়ে উঠল—ভূমিকম্পের সময়ের মত। ঘুমে জড়ানো চোখে সে বুঝতে চেষ্টা করে ব্যাপারটা।…ও তাই বলো! রেণু খাটে এসে শুল। তাহলে উঠে বাইরে গিয়েছিল। কখন গিয়েছিল সে জানে না। মণি বাঁ কাতে শুয়ে আছে।…বালিশের সেই দিকটা একটু নড়ল যেন!… রেলগাড়িতে ঘুমবার সময় মৃদু ঝাঁকানিতে কখন কখন এইরকম টলে যাবার ভাব হয়। কাত হয়ে শুলে বালিশে ঘষটানির সামান্য শব্দও খুব জোরে মনে হয়!…কাপড় ছিঁড়বার সময় যেরকম শব্দ হয়, সেইরকম একটা শব্দ বলে ভুল হয়, এই ঘষটানির আওয়াজটা।…তেমনি শব্দ এল বালিশের নীচ থেকে। তারপর চাবির গোছার রিনিঠিনি আওয়াজ। ভারী-চোখের পাতা খুলতে ইচ্ছা আর করছে না।—রেণুর হাতখানা আস্তে আস্তে বালিশের নীচ থেকে সরে গেল।—হাতের তেলো জ্বালা করছিল হয়ত। হাতের তেলো গরম হলে বালিশের তলায় হাত দিলে একটু আরাম পাওয়া যায়—বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে—ওই যতক্ষণ বালিশটা গরম না হয়ে উঠছে কেবল ততক্ষণ।— হাতের তেলো গরম হলে চাবির রিং, ডিবের বাটি, বা অন্য যে কোন ধাতব জিনিসে হাত দিয়ে ধরতে বেশ আরাম লাগে। সেই আরামই বোধহয় সে নিচ্ছিল একটু!—

রেণু হাতখানা রাখল স্বামীর গায়ের উপর।·· ঠাণ্ডা! ঠাণ্ডা হাতখানা কাঁপছে!·· কেঁপে কেঁপে উঠছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।…এখনও কাঁদছে!

"ঘুম আসছে না রেণু?"

কোন জবাব নাই। ঘুমিয়ে পড়ার জন্য মণি বুঝি একটু লজ্জিত বোধ করে। ঘুমে জড়ানো চোখদুটোকে সে জোর করে খোলে।…

ঘরে আলো নাই! মশারির ভিতর অন্ধকার আরও বেশী, কিন্তু জমাট অন্ধকারের মধ্যেও যেন একটু ফাঁক—অপেক্ষাকৃত কম অন্ধকারের খানিকটা

জায়গা—চৌকোনা! সে ঠাহর করে দেখবার চেষ্টা করে।...দরজা! দরজা খোলা? দেখ রেণুর কাণ্ড! দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছে! আজ কি ওর মাথার ঠিক আছে? ক'টা বাজল? সকাল হতে আর কত দেরি? ঘরের আলোটা নিভল কখন? আজ তো সে নিজেই কেরোসিন তেল ভরেছিল লণ্ঠনে, রেণুর শরীর খারাপ বলে। তেল ফুরিয়ে যাবার কথা তো নয়। পাছে নিভে যায় সেই ভয়ে সে ভরে তেল দিয়েছিল।...রেণু কি অন্ধকারেই বাইরে গিয়েছিল না কি? পোকামাকড়ের সময়, এখন কি কখনও অন্ধকারে চলাফেরা করতে আছে।...মণি মশারির বাইরে এসে দেশালাই জ্বালে, লণ্ঠনটা কোথায় খুঁজবার জন্য। না, আলোতে তেল তো ফুরিয়ে যায়নি। তবে কি রেণুই নিভিয়ে দিয়েছে? আলোতে বোধহয় ওর ঘুমের অসুবিধা হচ্ছিল। যাক, আলোটা জ্বেলে বাইরে বারান্দায় রেখে, দরজা বন্ধ করে দিলেই হবে।

লণ্ঠন জ্বালতেই চোখে এসে লাগল একটা ঝিকিমিকি। লণ্ঠনের আলো পড়ে চকমক করে উঠেছে কাঁসার একখানা রেকাবি। রেকাবখানা দাঁড় করানো ছিল আলমারির নীচের তাকে। এ কি! আলমারি খোলা। কেন? ভয়ের শিহর খেলে গেল সারা দেহে। চোর এসেছিল নাকি? কখন? নিশ্চয়ই তা হলে সব নিয়েছে। প্রথমেই নজর যায় উপরের তাকের পিতলের ছোট বাক্সটার উপর। আলো ফেলে দেখল। গহনার বাক্স খোলা। ছোট কুলুপটাও পড়ে রয়েছে পাশে।

"রেণু! রেণু! চোর! চোর! যথাসর্বস্ব নিয়েছে।"

হাতের কাছে লাঠি খুঁজে পাওয়া গেল না—হাতে লণ্ঠন—ছুটে বাইরে গেল—উঠনে—সদর দরজাও হাট করে খোলা। দোরগোড়ায় বেরিয়ে একবার দেখে। অন্ধকার। মিউনিসিপ্যালিটির আলো রাত দশটার পর জ্বলে না। জনমানবশূন্য পথের ধারের ঝোপঝাড়ের একটুখানি মাত্র দেখা গেল লণ্ঠনের আলো পড়ায়।—আবার ছুটে এল মণি ঘরে।

"রেণু! রেণু!"

রেণু তখনও মশারির ভিতর থেকে বার হয়নি। যা ভীতু মানুষ!—

মশারি ঠেলে বার হয়ে আসতেই আলো পড়ল রেণুর মুখে।—ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে তার মুখ, তাকানো যায় না সেদিকে। কি করবে ঠিক করতে পারছে না সে।

"রেণু তুমি যখন উঠলে, ঘরের দরজা খোলা ছিল নাকি তখন? সদর দরজা? তাকিয়ে দেখেছিলে নাকি? আলমারি? লণ্ঠন কি আগে থেকে নিভানো ছিল? না তুমি নিভিয়েছ?"

কোন কথার জবাব নাই।—ভয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে, তার কথা বলবে কি করে?—ঘাড় নেড়ে কি যেন বলল—ঠিক বোঝা গেল না।

এতক্ষণে মণির মনে পড়ে যে চীৎকার করে পাড়ার লোক জাগাতে সে ভুলে গিয়েছে।

"চোর। চোর।"

একটা লাঠিও বাড়িতে নাই। পুরনো ছাতাটা সে টেনে নেয় ঘরের কোনা থেকে; তারপর খাটের তলা, স্নানের ঘর সম্ভব অসম্ভব সব জায়গা আলো নিয়ে দেখে। গুছিয়ে ভাববার ক্ষমতা থাকলে সে বুঝত যে এ খোঁজবার কোন অর্থ হয় না—চোর এতক্ষণ বসে থাকতে পারে না নিজে থেকে ধরা দেবার জন্য।...কালই একটা টর্চ লাইট কিনতে হবে!... পাড়ার লোকে সাড়া দিচ্ছে।...রেণু এখনও ঠিক সেই রকম ভাবে আড়ষ্ট হয়েই বসে রয়েছে! কাঁদছে।...

"ভয় কি রেণু? চোরকে ভয় কিসের! চোর কি এখনও বাড়িতে আছে যে ভয় পাচ্ছ?"

মণির হঠাৎ মনে পড়ে যে নিভানো আলোটা রাখা ছিল আলমারির ঠিক সম্মুখেই।...রেণু আলো নিভালে নিশ্চয়ই চোখে পড়ত খোলা আলমারিটা।

"রেণু আলো কি তুমি নিভিয়েছিলে?"

তার বিবর্ণ মুখখানা কি রকম যেন হয়ে গেল; যেন সে তৈরী ছিল না এই প্রশ্নের জন্য; যেন ভেবে বলতে হল।...কেন?...

রেণু খুব আস্তে আস্তে একবার মাথা নাড়ল স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে।

"বলো না পরিষ্কার করে, হ্যাঁ কি না কী বলছ। ছুটো কথা না হয় খরচই হল। কারও পায়ের শব্দ-টব্দ শুনেছিলে?"

রেণু নিরুত্তর। কাঁদছে। মণির মত লোকেরও মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে। নির্দয় ভাবে জেরা করতে ইচ্ছা করছে রেণুকে।...সঙের মত বসে রয়েছে হাত পা গুটিয়ে, খাটের উপর।...একবার নেমে দেখবেও তো, আলমারি থেকে কি কি জিনিস চুরি গেল।...আরও অন্য কোন জিনিস নিল কি না।...এও কি বলে দিতে হবে। না তার শাড়ি ব্লাউসের হিসাবটাও অন্য লোকে মিলিয়ে দেবে?...যত সব...

কথাটা খেয়াল হওয়ায় মণি এতক্ষণে চারিদিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখে নিল একবার—নতুন জুতো জোড়া—আলনার কাপডচোপড বারান্দার বালতি ঘটি—সব ঠিক আছে।...বোঝা যাচ্ছে না, চোর আর কিছু নিয়েছে কিনা।...

"কি ব্যাপার মণিবাবু।"

লাঠি, টর্চ নিয়ে প্রতিবেশীরা এসে পড়েছে। হই হই লেগে গেল কিছুক্ষণের জন্য। পায়ের দাগ নিরীক্ষণ ও বাড়ির আনাচ কানাচ পরিদর্শনের পর আরম্ভ হল অযাচিত উপদেশের স্রোত!

"কি কি জিনিস গিয়েছে, তার একটা হিসাব করবেন মণিবাবু। বাসন-কোসনগুলো ভাল করে দেখুন।"

'পায়খানার গাড়ুটা নেয়নি তো?' 'চোরদের অভ্যাস জান তো? দরজার কাছটাতে একটু ভাল করে টর্চ ফেলে দেখেশুনে হাঁটবে।' 'একটা সুটকেস পর্যন্ত নেয়নি; এ ছিঁচকে চোর নয়—শুধু গয়নাগাঁটির উপর এদের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।' 'বাকি রাতটুকুও জেগেই থাকবেন মণিবাবু; কিছু বলা যায় না।' 'জানল কি করে যে আলমারির মধ্যের পিতলের বাক্সটাতে গহনা থাকে?' 'শশীর মা আপনাদের বাড়ির ঠিকে ঝি না, মণিবাবু?' 'আদালতে কাজ করেন, ফৌজদারী আইনের খবর রাখেন তো? সকাল হলেই থানায় খবর দিতে ভুলবেন না যেন।' 'আশ্চর্য যে, তালা ভাঙেনি —খুলেছে।'...সকলে চলে যেতে যেতে প্রায় ভোর হয়ে এল।

"আচ্ছা রেণু, কোন রকম শব্দটব্দ তুমি পাওনি—পায়ের শব্দ, খিল খুলবার শব্দ, আলমারি খুলবার শব্দ, পিতলের বাক্সটা খুলবার শব্দ ?"

রেণু তাকিয়ে রয়েছে মেঝের দিকে। অতি ধীরে ঘাড় নাড়িয়ে জানাল—"না।"

"আচ্ছা রেণু, তুমি উঠে কি দরজা খোলা দেখেছিলে ?···আঃ কথা বল না। তুমি কি বোবা ? তোমার ওই ঘাড নাড়ানো উত্তর আমার চোদ্দ পুরুষেরও সাধ্য নেই যে বোঝে।··মনে নেই ?···আলো জ্বালা ছিল নাকি ?···মনে থাকে নাই বা কি করে ? আলমারি খোলা ছিল কিনা তাও মনে নেই ?·কিছুই মনে নেই। মনে না থাকারও তো একটা সীমা আছে।···উঠে বাইরে গিয়েছিলে কিনা সে কথা মনে আছে তো ? না তাও ভুলে গিয়েছ ? আচ্ছা, এখন একটু চোখের জল থামিয়ে, দয়া করে বল তো দেখি কি কি গহনা গিয়েছে—কত কত তার ওজন—পুলিশের কাছে দেবার জন্য একটা ফিরিস্তি তয়ের করতে হবে।"

জলভরা চোখেব মধ্যে দিয়ে ফুটে বার হল ভয় পাবার ভাব। পুলিসের নামে ভয় পেয়েছে রেণু।

"আর ন্যাকামি করতে হবে না। খুঁজে পেতে দেখ এক এক করে, কি কি চুরি গিয়েছে। কী ? পারবে না ? ····আচ্ছা পাল্লায় পড়া গিয়েছে ! পুলিসকে কিছু বলতে হবে তো।··"

রেণু কথা বলে না। শুধু কাঁদে। এত কড়া কথা সে স্বামীর মুখে এর আগে কখন শোনেনি। সাধারণভাবে বলতে গেলে তার স্বামী ধীর প্রকৃতির লোক—কম কথার মানুষ—অপরের দুঃখ দরদ বোঝে। স্বামী, তার জানলার কাছে দাঁড়ানো পছন্দ করে না, অন্য বেটাছেলের সঙ্গে কথা বলা অপছন্দ করে, কিন্তু এসব নিয়েও কখন এরকম রূঢ়ভাবে বিরক্তি প্রকাশ করেনি। যা কিছু বলবার বলেছে মৃদুভাবে, আকারে ইঙ্গিতে।

তাই আজ রেণুর চোখে বেশী করে জল আসে।

তদারক করতে এসে দারোগাবাবু প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তোলেন।

···কার উপর সন্দেহ হয় ? চোর এল কোথা দিয়ে ?...পাঁচিল ডিঙিয়ে

গেরস্তবাড়ির উঠনে ঢুকতে তো চোররা যখন তখন পায়ে—শুধু ঢোকে না এই রক্ষা—নইলে গেরস্ত পুলিশ দুইএরই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হত; কিন্তু কথা হচ্ছে যে, এ চোরটা ঘরের মধ্যে ঢুকল কি করে? দরজার খিল খুলল কি করে? সিঁধকেটে বা জানলার গরাদের শিক বেঁকিয়ে ঢুকত, তাহলেও বুঝতাম। ও ব্যাটা নিশ্চয় আগে থেকে খাটের তলায়, বা ঘরের মধ্যে অন্য কোথাও লুকিয়ে ছিল। তারপর আলমারি খুলেছে, গহনার বাক্স খুলেছে। আশ্চর্য! এমন খোলন্দাজ চোরও তো কখন দেখিনি! -একটা তালাও ভাঙেনি!··· আপনাদের চাবি ঠিক আছে তো? ডুপ্লিকেট চাবি চুরি যায়নি তো? জানল কি করে কোথায় কোন জিনিস থাকে।···দাঁড়ান, দেখি আপনাদের ঠিকে-ঝির ছেলেটাকে থানায় নিয়ে গিয়ে, দুঘা দিয়ে, কিছু বার হয় কিনা।"···

দারোগা চলে গেলেও, এর জের যায় না। পরিচিত অপরিচিত বহু লোক আসে, চুরির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুনতে। একজনের পর আর একজন।··· এর কি শেষ নাই?···শেষ পর্যন্ত রাগ করে মণি নিজের শোবার ঘরের একখান নক্সা এঁকে, নীচে চোরের যাতায়াতের সম্ভাব্য পথ ও চুরির জিনিসের লিস্ট দিয়ে—বাড়ির বাইরে টাঙিয়ে দিল—প্রশ্নকর্তাদের বিদ্রূপ করবার জন্য। কেউ জিজ্ঞাসা করলে দেখিয়ে দেয় সেই নোটিশখানা, একটাও কথা না বলে। এত রূঢ় সে বোধ হয় এর আগে জীবনে হয়নি। তেতো বিষ হয়ে উঠেছে হঠাৎ, সারা পৃথিবীটা। হবারই কথা। অফিস কামাই হল; রান্নাবাড়া বন্ধ— বাজার থেকে মুড়ি কিনে এনে চালাতে হল, রাতের এঁটো বাসন অমনিই পড়ে রয়েছে, স্ত্রী বসে বসে কাঁদছে, দিকদারির শেষ নাই। শশীর-মা চীৎকার করে পাড়া মাথায় করছে······এমন ঝাঁটা-মারা চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিলাম—ভগবান উপর থেকে সব দেখছেন—যারা একজন গরিব লোককে আর তার ছেলেকে মিছামিছি জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে, তাদের কখন মঙ্গল হবে না—তাদের সংসার ছারখার হয়ে যাবে যদি পাপপুণ্যের বিচার কিছু কলিযুগেও থাকে।···

দপ করে আগুন জ্বলে উঠল মণির মাথায়।

"বেরো! বেরো বলছি আমার বাড়ি থেকে।"

"দেখবো, আর কোন ঝি চাকর থাকে এই বাড়িতে।"

"খবরদার! থাবড়ে মুখ ভেঙে দেবো।"

একরকম ধাক্কা দিয়েই মণি তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিল।

রেণুর কানে গিয়েছে শশীর মা'র কথাটা। আতঙ্কে শিউরে উঠে সে কানে আঙুল দেয়...তার সংসার ছারখার হয়ে যাবে...চরম আঘাত দিয়ে গেল শশীর মা যাবার আগে। ইচ্ছা করে ছুটে যায় তার কাছে—তার কাছে ক্ষমা চায়—তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে—তার দেওয়া শাপ ফিরিয়ে নিতে বলে।

...কি করবে ভেবে পায় না।...হঠাৎ মনে পড়ল ...আঁকড়ে ধরবার মত একটা কুটো।...দেয়ালে মা কালীর ছবি।...রক্ষা কর মা বিপত্তারিণী!

দেয়ালের ফ্রেমে বাঁধানো ছবির কাঁচের উপর দিকটা, এক প্রতিবেশিনীর ছেলে ঘরের মধ্যে বল খেলতে খেলতে ভেঙে ফেলেছিল। এর আগে রেণু দুই একদিন স্বামীকে বলেছিল কাচখানা বদলে আনতে। হচ্ছে হবে করে এতদিন হয়ে ওঠেনি।

আলনায় টাঙানো মণির জামার পকেট থেকে রেণু তাড়াতাড়ি পাঁচটা পয়সা বার করে নেয়। কপালে ঠেকিয়ে পয়সা কটাকে কাঁচের ভাঙা জায়গাটার মধ্যে দিয়ে ছবির ফ্রেমের মধ্যে ফেলে দেয়।...আমার মুখ রেখো মা! স্বামীর যেন কোন রকম অমঙ্গল না হয়! শশীর মার কথা যেন মিথ্যা হয়! মা তুমি তো সবই জান।...ছবির নীচে মাথা কোটা শেষ হলে, সে আবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল, মা কালীর মুখের দিকে।...অভয়-হাত তুলে রয়েছেন মা...তারই দিকে তাকিয়ে। এ কি! একটা পয়সা মা কালীর ডান পায়ের আঙুলগুলোর উপর গিয়ে থেমে গিয়েছে—'ফ্রেম'এর নীচের কাঠটা পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই!...তবে বুঝি মা অভাগীর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন! আশ্বাসের ইঙ্গিত দিয়ে বলছেন—ও মেয়ে, তুই কেঁদে মরিস কেন—তোর প্রণামী যে আমি গ্রহণ করেছি—আর কেমন করে বোঝাব তোকে?...

তবু তার কান্না থামে না। আশ্বাস পাচ্ছে তবু তার প্রণাম করা শেষ হয়

না। মণি যখন ঘরে এসে ঢুকল তখনও তার প্রণাম চলছে।…যাক তবু উঠেছেন দেখছি এতক্ষণে!…ছবির ফ্রেমের মধ্যের পয়সা কটাও তার নজরে পড়ে!…ভাঙা কাচের একটা ছোট টুকরো ছবির নীচে থেকে গিয়েছিল; তারই উপর বুঝি ওই পয়সাটা আটকে গিয়েছে।…এর প্রণাম কি শেষ হতে জানে না?…সব জিনিসে বাড়াবাড়ি! কী ভাবে, কী করে, কোন চালে যে চলে তা ওই জানে। যত সব 'নিউরটিক'দের নিয়ে হয়েছে কারবার। সব আপদ কি জোটে তারই কপালে!… শুধু কি ক্ষতি আর ঝামেলার ঝাঁজে রেণুর উপর স্বাভাবিক দরদটুকু উবে গেল মণির? না। আছে—আছে এর মধ্যে আরও অন্য জিনিস মেশানো। মনের নীচের থিতানো পাঁক ঘেঁটে উঠেছে। ওটা আরম্ভ হতেই যা দেরি। তারপর সেটা চলে আপন গতিতে, মনের গোপন অন্ধিসন্ধিগুলোর মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে।…দারোগাবাবুর সেই কথাটার থেকেই হয়েছিল এর আরম্ভ।…"ও ব্যাটা নিশ্চয় আগে থেকেই খাটের তলায় বা ঘরের মধ্যে অন্য কোথাও লুকিয়ে ছিল"।…ছোট্ট কথাটা। রোগের বীজাণু ছোটই হয়।…যত সময় যায় তত কথাটা মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দিতে আরম্ভ করে। এর স্বপক্ষ ও বিপক্ষের যুক্তিগুলো পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।…

…চাবি পেল কি করে? লোকটা জানল কি করে যে ওই বাক্সের মধ্যে গহনা থাকে? এবার থেকে সে প্রত্যহ রাতে শোবার আগে খাটের তলাটা দেখে নেবে একবার। কালকে তার বালিশের তলায় রাখা চাবিতে রেণু হাত দিয়েছিল—কেন? তার হাতের তেলো ঠাণ্ডা ছিল—বেশ মনে আছে—তবুও কেন?, সে নিজে না হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, রেণু তো এক মিনিটও ঘুময় নি। কেন তবে সে কারও পায়ের শব্দ, আলমারি খোলার শব্দ, বাক্স খোলার শব্দ, কিছুই শুনতে পেল না? কি করে এ জিনিস সম্ভব হয়? উঠে বাইরে যাওয়া সত্ত্বেও হাট-করে-খোলা সদর-দরজা লক্ষ্য না করা, শোবার ঘরের দরজা না বন্ধ করা, আলো নিভানোর কথা মনে না থাকা, খোলা আলমারির দিকে নজর না পড়া, কোন বিষয়ে কথা না-বলা—এতগুলো প্রমাণের যোগাযোগ কি কাকতালীয় হতে পারে। এতক্ষণ

বাধছিল ; এবার তাহলে সে পরিষ্কার করেই বলবে, ছোট ছোট ভুলগুলোর সূচীমুখ রেণুরই দিকে। একটা যোগ-সাজসের গন্ধ আগাগোড়া ব্যাপারটার মধ্যে। 'চোরটা' কখন থেকে যেন মণির অজ্ঞানতে 'লোকটা' হয়ে গিয়েছে। কে ? রেণুর সঙ্গে এত জানাশোনা কবে থেকে ? কি করে ? শেষ পর্যন্ত ভাবা যায় না।

সন্দেহ জিনিসটাই অমনি। যত চাপতে যাও, তত মাথা ঠেলে ওঠে। আনুষঙ্গিক কৌতূহলটুকু ব্যথাবিদ্বেষে ভরা।

এই ঘটনার পর থেকেই চলল। যত দিন যায় তত এব ব্যথা বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে গাম্ভীর্য। স্ত্রীব সঙ্গে কথা কমিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে রেণুকে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করতে, নির্দয়ভাবে, রূঢ়ভাবে, কিন্তু কোথায় যেন বাধে। না না, এ একটা সামান্য সংশয় মাত্র। তাব চেয়ে বেশী কিছু নয়। তাই যেন হয়। তাই বলুক রেণু। নিজে থেকে জিজ্ঞাসা করলে যে, স্ত্রীর কাছে ছোট হযে যেতে হয়। স্বামীব মনেব অবস্থা বুঝে, রেণু নিজেই কি বলতে পারে না সব কথাটা খুলে ? কিংবা যদি নিজের অজ্ঞাতে এমন কোন কথা বলে ফেলে, যাব থেকে সমস্ত ব্যাপাবটা বোঝা যায় ।

কিছুদিন পর অবস্থাটা যা দাঁড়ায় তাতে মনের ব্যবধান বাড়া সত্ত্বেও কথাকাটাকাটি নাই, চেঁচামেচি নাই, পাবস্পরিক আচরণে রূঢ়তা নাই। বাইবের লোকে বুঝতে পাববে না , কিন্তু নিকট আত্মীয়বা অনায়াসে ধরতে পাববে, পবস্পরেব সান্নিধ্যে মণি আর রেণুর অসহায় আড়ষ্টতা। সহজ প্রাণখোলা আচবণেব অভাব পদে পদে নজরে পড়ে। কথা কম, মানে সত্যি করেই কম। যেটুকু না বললে নয়। বাজাব থেকে কি কি জিনিস আনতে হবে সে কথাও স্ত্রী বলত না স্বামীব কাছে—এমনি অবস্থা।

প্রথমের দিকে উভয় পক্ষের জেদাজেদি রাগারাগিব প্রশ্ন ছিল না এব মধ্যে। রেণুর দিক থেকে ছিল অসহায় কুণ্ঠা , মণির দিক থেকে ছিল ক্ষোভ বিরক্তি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো রূপ বদলায়। সঙ্কোচ বাড়ে সহনশীলতা কমে, অন্য পক্ষের দিক থেকে বিষয়টাকে ভাববার চেষ্টা আদৌ থাকে না। রেণুর অসহায়তার মধ্যে এসে মেশে খানিক দৃঢ়তা , বিহ্বলতার স্থান নিতে

আরম্ভ করে জিদ। তুমি আমায় গ্রাহ্যের মধ্যে আনো না তো আমিও তোমায় কেয়ার করি না! মণির রুক্ষতা ও বিরক্তির স্থান নেয়, একটা উদাসীনতার ভাব। নির্লিপ্ত, নির্বিকার উদাসীনতা নয়; এ একরকম নিষ্ক্রিয় বিরোধের মনোভাব। অপর পক্ষ থেকে সহানুভূতি চাইবার স্তর পার হয়ে গিয়েছে—দরদের আশাও কেউ রাখে না—ক্রমে সহানুভূতি পাবার আকাঙ্ক্ষাও চলে যায়। দুজনেই ভাবে যে তার উপর অন্যায় করা হচ্ছে, অবিচার করা হচ্ছে। গোড়ার দিকে যেটাকে মনে হত সামান্য একটা ধৈর্যের পরীক্ষা মাত্র—কে প্রথম এগিয়ে আসে, যা হয়েছে যেতে দাও বলে—শুধু যেন এরই প্রতিযোগিতা—সেইটা পরে দাঁড়িয়ে গেল পাকাপাকি গরমিলে। দিনের পর দিন একই ঘরে দুইজন লোকের এই অবস্থায় কাটানো যে কী ব্যাপার, যাঁর ঘটেছে তিনিই জানেন।... প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষাটাই সব চেয়ে বড় কথা হয়ে ওঠে জীবনের।—যে কোন উপায়ে। ফাটল জোড়া লাগবার নয়—একটা কিছু হবার দরকার এখন—একথা দুজনেই বোঝে। শুধু একটা কথা—এ নিয়ে লোক-হাসাহাসি কম হলেই যেন ভাল হয়!...

কতদিনের কত কথা!...অফিসের চাপরাশী হয়তো কিছু বলে গেল রেণুর কাছে, বাবুকে বলবার জন্য।...মণির বন্ধুর ছেলে হয়তো তাদের স্বামীস্ত্রীকে নেমন্তন্ন করে গেল—স্বামীর অনুপস্থিতিতে। পটলার বিয়ে ঠিক করেছে মণি, পাড়ার সেই চেনা মেয়েটির সঙ্গে; কিন্তু রেণু এ-খবর জানতে পারল যেদিন দেওর তাকে নিতে এল বিয়ের জন্য!...

সেই সময় দেওরের কাছেই সে প্রথম শোনে যে মণির আবার সদরে বদলি হবার কথা হচ্ছে। অর্থাৎ মণি আবার সদরে ফিরে যাবার চেষ্টা করছে। দেওর কি মনে করে যেন আশ্বাস দিয়েছিল—তার এখনও দেরি আছে—হরেন পেশকার মাস তিনেক পর পেনশন নিলে, তবে। এ আশ্বাসের দরকার ছিল না রেণুর। স্বামী নিজেদের বাড়িতে ফিরে যেতে চায়, নিজের ভাইদের সঙ্গে থাকতে চায়—এর মধ্যে অন্যায় তো

কিছু নাই! কিন্তু এই খবরটা শুনবার পর, রাস্তার দিকের জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাসি-গল্প করল সেদিন। মণি বাড়িতে থাকল তো কি হল! সেদিন স্বামীকে শুনিয়ে দেওরকে বলে—"শনি রবিবার রাত্রিতে একা থাকতে হয়; তোমার দাদা চলে যান বাড়িতে; বড় ভয় ভয় করে। এবার ভাবছি, অফিসের চাপরাশী-টাপরাশী কাউকে শুতে বলব বারান্দায়। গত শনিবারে যা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছিল! ভয়ে মরি।"

গায়ের ঝাল না হয় একটু মিটল তখনকার মত। তবু কেন চোখে জল আসে তার? পুরুষ মানুষে বুঝতে পারবে না সেসব কথা। মেয়েমানুষরা হয়তো পারবে। কিন্তু তার মুখ যে বন্ধ। লোকে তাকে ভুল বুঝবে কেন? লোক মানে মণি।

এখানকার এ অবস্থার কথা রেণু মা-বাবার কাছে লেখেনি। এসব কি কাউকে বলবার কথা! কিন্তু পিসিমা কি করে যেন আঁচ পেয়েছিলেন, দেওরের কাছ থেকে শুনেই হবে হয়তো। তিনি রেণুর মা-বাবার কাছে কিছু আভাস দিয়ে বোধহয় চিঠি লিখেছিলেন। তারপর মণি চিঠি পায় শাশুড়ির। শ্বশুরের অসুখ। হার্টের ব্যারাম, শয্যাগত। তিনি একা পেরে ওঠেন না। রেণুকে পাঠাতে পারলে ভাল হয়।

মণি হাঁ-ও বলেনি না-ও বলেনি; শুধু চিঠিখানা রেণুর হাতে দিয়ে দিয়েছিল। দেওরের বিয়ে সম্মুখে। রেণু নিজেই চিঠির উত্তর দিয়েছিল—দেওরের বিয়ের পর সে যাবে।

বিয়েবাড়িতে পিসিমা কত বুঝিয়েছিলেন—দুজনকে আলাদা আলাদা। কিসের ঝগড়া জানতে চেয়েছিলেন। নির্বাক রেণুর চোখে জল এসেছিল। নির্বাক মণি ঢালু মেঝের উপরের একটা জলের ধারাকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বারবার আঙুল দিয়ে উঁচুর দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। কিছুই বুঝতে পারেননি পিসিমা।...হবে না কেন; একসঙ্গে থাকতে গেলে সংসারের ঝগড়াঝাটি হতেই পারে। হল, আবার মিটে গেল! তোদের আজকালকার সবই আলাদা। আমরা সেকেলে মানুষ,

অত সূক্ষ্ম কি বুঝি। সায়েব মেমদের মত তালাক দিয়ে, আবার আর একটা করে বিয়ে করে নে! তাহলে ষোলকলা পূর্ণ হয়। যাক, যা ভাল বোঝ করো তোমরা। না বলেও যে পারি না।...

বুঝতে না পেরে সবাই এক-একটা মনগড়া কারণ ঠিক করে নেয়। পটলার ধারণা—মা স্বর্গে যাবার পর থেকে মণির অনুশোচনা হয়েছে, এখান থেকে চলে যাবার জন্য; তাই সে আবার এখানে ফিরে আসতে চায়; এই নিয়েই মণি রেণুতে চটাচটি। এমনি করেই অপরের মনের জটিলতা ছেলেমানুষের মত সরল করে নিয়ে ভাবতে চায় লোকে নিজের নিজের খেয়ালখুশিমত।

নতুন বউকে সংসারে এনে বসিয়ে, রেণু চলে এসেছিল বাপের বাড়িতে। দেওরই পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। মণি দোরগোড়ায় এগিয়ে দিতেও আসেনি। রেণুও পিছন ফিরে তাকায়নি। ক্ষোভ ছিল; অভিমান ছিল; মুহূর্তের জন্য ভাবতে ভাল লেগেছিল যে মণি হয়তো লুকিয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখছে তাকে। অনেক দিন থেকে সে ভেবে রেখেছিল যে চলে যাবার সময় স্বামীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলে যাবে—আবার তুমি বিয়ে করে সুখী হও। বইতে যেমন বলে, সেই রকম। যাবার মুহূর্তে না পারল প্রণাম করতে, না পারল কোন কথা বলতে। কানে এসেছিল পিসিমার—'দুর্গা, দুর্গা'।

আসল কথাটাই বলা হয়নি এখনও—যা নিয়ে এত কাণ্ড। সেই যেদিন রেণু কান্না আরম্ভ করেছিল প্রথম, সেই দিনকার কথা। মণি

অফিসে। রেণু মেঝেতে পাটি পেতে একটু গড়িয়ে নিচ্ছে। রাস্তার দিককার জানালার দিকে নজর পড়তেই দেখে কখন যেন একজন সন্ন্যাসী এসে দাঁড়িয়েছেন। লম্বা-চওড়া চেহারা—দাড়ি-গোঁফ-জটায় আরও বিশাল-কায় বলে মনে হচ্ছে। গায়ে ছাই মাখা, এক হাতে বাঁকানো লাঠি, আর এক হাতে ভিক্ষাপাত্র। দেখলেই ভয় ভয় করে। রেণু তাকাতেই তিনি হিন্দীতে বললেন—'ভাল হোক।'—বলেই ভিক্ষাপাত্র এগিয়ে ধরলেন, জানলার গরাদ ঠেকিয়ে। রেণু একমুঠো চাল দিতেই বললেন "শুধু চাল?"

"একমুঠো ডাল দিই দাঁড়ান।"

"কি চাল ডাল দেখাচ্ছিস।"

এবার সন্ন্যাসীর কথা বেশ রুক্ষ।

"তবে? এই নিতে হয় নাও, না নিতে হয় চলে যাও। পয়সা-টয়সা বাবুর কাছে থাকে।"

এতক্ষণ পর্যন্ত রেণুর মনের জোর ছিল, বেশ স্পষ্ট মনে আছে। সন্ন্যাসী ভিক্ষাপাত্রে দেওয়া চালগুলো, ছিটিয়ে জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে ফেলে দিল। একেবারে অন্য মূর্তি।

"এক মুঠো চাল দেখাতে এসেছিস! যেমন পোড়াকপাল নিয়ে এসেছিস, তেমনি পোড়া মন। পেটের সন্তানকে খেয়েছিস, সেটা জন্ম নেবার আগেই— এবার যাবে তোর স্বামী।"

এই মুহূর্তে পৃথিবী মুছে গিয়েছিল তার চোখের সম্মুখ থেকে। কি করেছে, কি বলেছে, অত কথা খুঁটিয়ে মনেও নাই। হতে পারে যে সে কোন কথাই বলেনি আর। যা বলবার বলেছে সন্ন্যাসী। সে শুধু শুনেছে, আর সন্ন্যাসী যা বলেছে তাতেই সম্মতি জানিয়েছে। সন্ন্যাসীর সব কথা বিশ্বাস করেছে; অবিশ্বাস করবাব কথা একবাব মনেও ওঠেনি। তখন কি তার জ্ঞান ছিল? যে সন্ন্যাসী তার পেটের ছেলে মারা যাবার খবর বলতে পারে, তাঁর মুখের অন্য ভবিষ্যবাণীকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় কি করে? এতদিন পর, আজকে না হয় সে কথা মনে করে হাসি আসতে পারে, কিন্তু তখন? তখন যে তাব সব যাচ্ছে। উপায়? রক্ষা পাবার একমাত্র উপায়, সন্ন্যাসী ওই যে কি একটা

বললেন না, তাই করা। তাঁর এতে কোন স্বার্থ নাই ; কথাটা তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও। কপালের লেখা খণ্ডাবার একমাত্র জানা উপায়! হাতের কাছে পেয়ে কি সে জিনিস ছাড়া যায়?

মন গলেছে বুঝি সন্ন্যাসীর! রুক্ষ গলার স্বর নরম হয়ে এসেছে, কঠোর, নিস্পৃহ চাউনিতে সহানুভূতির পরশ লেগেছে।

"কিন্তু বেটি, তুই কি তাই পারবি? তাতে যে অনেক টাকা খরচ। সে সব হচ্ছে জমিদার, শেঠ, রাজারাজড়ার ব্যাপার ; তোরা হলি গরিব মানুষ; অত টাকা পাবি কোথায়।"

সব কথা মনেও নাই রেণুর। গহনার কথা সন্ন্যাসী প্রথম তুলেছিলেন, না সে নিজেই তুলেছিল সে কথা মনে নাই। তবে সন্ন্যাসীর অকপট সারল্য তাকে মুগ্ধ করেছিল। অত বড় একজন ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসী অসঙ্কোচে স্বীকার করলেন যে তিনি অতি সাধারণ ব্যক্তি—সাধন ভজন নিয়ে পড়ে আছেন—এই মাত্র। কিন্তু তাঁর গুরুদেব, যিনি গঙ্গোত্রীর কাছের এক গুহায় থাকেন, তিনি অসামান্য মহাপুরুষ। তাঁর এই দীন অধম শিষ্য গিয়ে ধরে পড়লে, তিনি না করতে পারবেন না বলেই সন্ন্যাসীর বিশ্বাস। একবার কোথাকার কোন রাজমাতার গ্রহশান্তির জন্য, সন্ন্যাসীর সনির্বন্ধ অনুরোধে, গুরুদেব সেই যজ্ঞ করেছিলেন। তবে বলে দিয়েছিলেন যে আর যেন কখনও ভবিষ্যতে এইরকম ছেলেমানুষি অনুরোধ নিয়ে তাঁর কাছে না আসে।..."দয়ামায়ার অতীত থাকাই ভাল সাধু সন্ন্যাসীর ; তাই লোকজনের সঙ্গে বেশী কথা বলতে নাই ; এক জায়গায় বেশীদিন থাকতে নাই ; কথায় কথা বাড়ে, 'বেটির' সঙ্গে দরকারের চেয়ে বেশী কথা বলেই ভুল করেছি।.. টাকাপয়সা নাই? তবেই তো মুশকিল ; সে কথা তো আগেই বলে দিয়েছিলাম, নাই যখন তখন আর উপায় কি!...না না, গয়নাগাঁটি ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার! ..আঃ কী মুশকিল! .. আচ্ছা নিয়ে আয় দেখি। বেটির চোখের জল যখন পড়েছে।..ও!...তাও এখন পারবি না? তোর মনের খিচ এখনও যায়নি দেখছি! তাঁকে ফাঁকি দিতে গেলে, নিজেই ফাঁকিতে পড়বি, সেকথা ভুলিস না! স্বামীর কাছে চাবি থাকে? বড় কড়া হিসাবী দেখছি তোর স্বামী! তোর কথা আমি

বুঝতে পারছি না; কী বলছিস ভাল করে বল! তিন চারদিন পরে আসবো কি করে? তখন কি আমি এখানে থাকব? আমি বলে চলেছি গঙ্গোত্রীতে গুরুদেবের কাছে!…"

তবে উপায়?

শেষ পর্যন্ত উপায় ঠিক হয় রেণুর আগ্রহে। রাত দুটোর সময় সে সন্ন্যাসীকে বার কার দেবে গহনাগুলো। 'বেটির' পক্ষে এই দেওয়ার পর্বটা নির্বিঘ্ন করবার জন্য সন্ন্যাসী কয়েকটি খুঁটিনাটি নির্দেশ দিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় তাঁর মনে পড়ল, ভুলে-যাওয়া আর একটা কথা। এ কথাটা ভুললেই, হয়েছিল আর কি! ত্রিকালজ্ঞ লোকদেরও অনেক সময় এরকম ছোট ছোট ভুল হয়ে যায়। বলে গেলেন—'বেটি' যেন এসব সংক্রান্ত কোন কথা কারও কাছে ঘৃণাক্ষরে প্রকাশ না করে। কোনও লোকের কাছে নয়! সে যতই আপনার হোক না কেন! উপর থেকে, যিনি মানুষের কপালের লেখা লেখেন, তিনি নিজের লেখা নিষ্ফল হবার উপক্রম দেখে, 'বেটি'কে লোভ দেখাতে আসবেন —যাতে সে অপরের কাছে বলে ফেলে কথাটা। কিন্তু খবরদার! বললে তোর স্বামীকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। আমার গুরুদেব পর্যন্ত না।

*　　*　　*　　*

রেণু ঠিক গল্প বলার মতন করে তো বলেনি। প্রশ্ন, উত্তর, স্বীকারোক্তি, হাসি, ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে তার সমস্ত ব্যাপারটা সে জানিয়েছিল। বউদিও মাঝে মাঝে এসে ফোড়ন দিয়ে গিয়েছেন এর মধ্যে।

আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম—"আচ্ছা, সন্ন্যাসী যে তোর গয়না বেচে যাগযজ্ঞ করায়নি, তার প্রমাণ কি?"

"করে থাকলে, করেছে!"

এত বছর পর সে কথার আর কোন গুরুত্ব নাই রেণুর কাছে। সন্ন্যাসীর বারণ সত্ত্বেও, এ গল্প করবার মনের জোর সে পেল ঠিক কোন সময় থেকে, সেইটা জানতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তার সঙ্গে মণির পরমায়ু-সংক্রান্ত ব্যাপারটা জড়ানো আছে বলে, জিজ্ঞাসা করতে বাধে। একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করি—"হ্যাঁরে রেণু, সন্ন্যাসীটাকে এতকাল পর হঠাৎ বুজরুক বলে বুঝতে পারলি ঠিক কবে থেকে রে?"

"কে জানে!"

রেণু ঠিক বুঝতে পারেনি আমার প্রশ্নটা।

"সেখানে যাবার জন্য তুই প্রথম চিঠি লিখলি কবে?"

"আমি কেন প্রথম চিঠি লিখতে যাব! সেখানকার চিঠি এসেছে, তবে আমি তার জবাব দিয়েছি।"

এর চেয়ে পরিষ্কার করে আর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারিনি।

রঘুয়ার জমি জিরেতের কোন লেখাপড়া হয়েছিল কিনা সে খবর এখানে কেউ জানে না। সেই সংক্রান্ত বিষয়গুলো সঠিক জানবার জন্য নিরাপদবাবু এবং এখানকার অন্যান্য প্রাচীন লোকদের রায় হল যে একবার মুনিয়ার মায়ের সঙ্গে দেখা করা দরকার—অবশ্য যদি সে এখনও বেঁচে থাকে। যদি মামলা মোকদ্দমাই হয় তবে তার কথাই সব চেয়ে কাজের হবে। কিন্তু সে কি দরকার হলে এসব কথা কোর্টে বলতে রাজী হবে? সম্ভবত হবে না। না হওয়াই উচিত—মেয়ে জামাই-এর দিকে চেয়ে। তবে ওদের ব্যাপার তো! বলা যায় না কিছুই! আর কোর্টে না বলুক আসল খবরটা তো জানা যাবে। ...নিরাপদবাবুর ঠিক স্মরণ নাই—অনেক দিনের কথা হল—তবে মনে হচ্ছে

যেন, এইসব লেখাপড়ার কথা বলবার জন্য মুনিয়ার মাকে সঙ্গে করে দাড়িওলা-মহাত্মা এসেছিল তাঁর কাছে। দাড়িওলা-মহাত্মা এখানে থাকলে সব খবর জানা যেত! তবে নিরাপদবাবুর ধারণা মামলা মোকদ্দমা বোধহয় করতে হবে না। তাঁর শরীর খুব খারাপ; বাড়ি থেকে বার হতে পারেন না আর; সেইজন্যই দ্বারভাঙ্গার সেই লোকচুটোর কাছে যেতে পারেন নি নিজে।

মুনিয়ার মা এখন কোথায়, সেকথা এখানকার কেউ জানে না। এক রামধনীই বোধহয় জানত, এখানকার লোকদের মধ্যে। তাকে দেবার পর, যে জমি বাগান বেঁচেছিল, সেইটা বিক্রি করে মুনিয়ার মা কিছু টাকা পায়। সেই টাকা নিয়ে সে এখান থেকে চলে যায়। একটা কানাঘুষো শোনা গিয়েছিল সে সময় কনেস্টবলদের মহলে, যে মুনিয়ার মায়ের গায়ে নাকি কুষ্ঠ বার হচ্ছিল। এখানে থাকা আর চলে না; কুষ্ঠ সারাবার জন্য অঘোরীবাবার পেছু ছাড়তে পারে না। লোক যত খারাপই হোক, ক্ষমতা আছে অঘোরীবাবার—একথা রামধনীও স্বীকার করত। তার নিজের চোখে দেখা যে! পতন হলেও ওসব তন্ত্রমন্ত্রওলা সাধু সন্ন্যাসীর ধক মরে না! প্রাণের দায়ে তাই মুনিয়ার মা অঘোরীবাবাটাকে আঁকড়ে পড়ে আছে।

কিন্তু মুনিয়ার মা এখন কোথায়?

মুনিয়া হয়তো জানতে পারে। সকলেই তাই বলল। এই জন্যই আমার মুনিয়ার কাছে যাওয়া।

মুনিয়ার স্বামী তো অবাক। বিশ্বাসজী যেচে তার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন; এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কী হতে পারে! তারা তো ভেবেছিল

যে সমাজসেবার কাজ ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসজী গ্রামের লোকদের একেবারে ভুলেই গিয়েছেন। সেই রকমই তো বলে জেলাশুদ্ধ লোকে।

মুনিয়া এক কথায় স্বামীকে চুপ করিয়ে দিল—"নিজের মেয়ে-জামাইকে লোকে কতদিন ঠেলে রাখবে?" ও টেনে নিয়ে আসে বাপের-বাড়ি সুবাদে কুটুম্বিতার সম্বন্ধ। ছুটোছুটি, চেঁচামেচি করে সে অস্থির। কি করবে ভেবে পায় না। কথাবার্তায় চটপটে ভাব সেই আগেকার মতই আছে। চেহারাও রোগা-রোগা, তবে আগেকার থেকে গায়ে একটু মাংস লেগেছে যেন।

সেখানে দিনকয়েক থেকে যেতে হয়েছিল। তাদের অনুরোধ তো ছিলই। তাকে একা পাবার দরকারও ছিল।

আমার তার কাছে আসবার উদ্দেশ্য শুনে একেবারে চুপ হয়ে গেল অত কথার মানুষটা। শুধু চোখভরা প্রশ্ন। কথা বলল পরের দিন। ফিসফিস করে। তাদের বাড়ির সেই বাচ্চা-সন্ন্যাসীই রঘু একথা শুনে কেঁদে কেটে অস্থির। পরে তিন চারদিন ধরে, সুযোগ পেলেই কিছু কিছু করে এ সম্বন্ধে কথা তার সঙ্গে হয়। প্রাথমিক সঙ্কোচটা একবার কাটবার পর, সে আব তাব মনের কথা চাপাবার চেষ্টা করেনি আমার কাছে। শুনে বোঝাতো যায়।

বাল-সন্ন্যাসীর ফেলে-যাওয়া ধুনুচিটা নিমগাছ তলায় ঠিক সেইরকমই পড়ে আছে, একরাশ শুকনো ফুল বিল্বপত্রের তলায় চাপা, শুধু মাথাটা দেখা যাচ্ছে। ধুনির ছাই, পোড়া কাঠ, সব সেইরকম আছে। ওরা কিছুতে হাত দেয়নি, খুব ধর্মভীরু লোক মুনিয়ার স্বামী।…সন্ন্যাসী হঠাৎ চলে গিয়েছেন নিজের দরকারী জিনিস ফেলে! ওঁদের খেয়াল-খুশি তো সাধারণ লোকের বোঝবার কথা নয়! কে জানে আবার কিসে থেকে কী হয়ে যাবে।…ওসব জিনিসে ছোঁয়াছুঁয়ি হবার ভয়ে, নিমতলা থেকে ওজন করবার বড় দাঁড়িপাল্লাটাকে পর্যন্ত সরানো হয়েছে। মুনিয়া প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে প্রদীপ দিয়েছে এতদিন।

"ছি! ছি! ছি!"

চাপা গলা মুনিয়ার।

বাচ্চা-সন্ন্যাসীর কাছে ধুনুচিটা দেখেই অনেক দিনের পুরনো একটা কথা তার মনে পড়েছিল ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে এটা সেই

জিনিসটাই। তারপর ভুলে গিয়েছিল সেকথা একেবারে। রেণুর ধুনুচিটা নিয়ে রঘু এসেছিল, একথা শুনে এখন চিনতে পারে।

"ছি! ছি! ছি!

টান মেরে ফেলে দিতে ইচ্ছা করছে জিনিসটাকে! বিশ্বাসজী, মায়ের খোঁজে আপনাকে তো গঙ্গার ধারের বাকিয়া-ভবানীপুরে অঘোরীবাবার কাছে যেতেই হবে। নিয়ে যাবেন এটাকে—যার জিনিস তাকেই দিয়ে দেবেন। আপদের শান্তি! মনে করলেও গায়ের মধ্যে রি রি করে ওঠে! কি জাদুই করেছিল মাকে শয়তানটা। মাকেই বা দোষ দিই কি করে। আমি নিজেই তো..."

তখনকার মত মুনিয়ার কথা শেষ হয়। আবার অন্য সময়। এমনি করে টুকরো টুকরো মনের কথা সে বলে।...বিশ্বাসজীর মত লোকের কাছেই এসব কথা তবু বলা যায়। যে বলছে তার দিক থেকে বুঝতে কি আর কেউ পারে—বিশ্বাসজীর মত লোকেরা ছাড়া!...এতদিন থেকে চেপে চেপে বুকের উপর পাথর হয়ে জমে বসেছিল কথাগুলো। বলতে পারলে একটু হালকা হালকা লাগে। যে ছোঁড়াটার কথা এতকাল ভাবেনি তার জন্যও একটু মনের মধ্যে খচখচ করে।...

রঘুয়া কি মতলবে এখানে এসেছিল, সে কথা আমি মুনিয়ার কাছে ইচ্ছা করেই খুলে বলিনি। অনর্থক দুঃখ পেত।..."আপনার কাছে মিছে কথা বলবনা বিশ্বাসজী ভয়ভয় করত অঘোরীটাকে দেখে—অথচ আবার টানতও কেন যেন। আমাদের বাড়িতে কতরকম চোর ছ্যাঁচড়ের আনাগোনা চিরকাল—জানেনই তো সে সব আপনি। কিন্তু কেউ বলুক! বেটাছেলে দেখলে ঢলে-পড়া অভ্যাস আমার কোন কালে ছিল না। ওই লম্বা-চওড়া জোয়ান—বড়বড় দাড়ি গোঁফ জটা—লাল কাপড়—লাল চোখ—রুদ্রাক্ষের মালা—মারণ উচাটন বাণ ছাড়তে জানে—তন্ত্রমন্ত্র জানে—অমাবস্যার রাত্রিতে শ্মশানে মড়ার উপর বসে থাকে—সব মিলিয়ে ভয়ও করে, আবার টানেও। গল্প শুনতাম যে ভীমরুল-বাণ লাগিয়ে কোন শত্রুকে যেন ঘায়েল করেছিল একবার। মা তাই ছিল তার বড় ভক্ত। আমাদের বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে

আসত মায়ের পুজো করে দেবার জন্য। তার পুজোতে হলও তো ছাই! যে রোগের জন্য পুজো করা, সে রোগের হাত থেকে বাঁচল কই!...তবু মায়ের বিশ্বাস যায়নি আজও ওই বদ লোকটার উপর।...নামেই সন্ন্যাসী!...চোরাই-মালের কারবার করে। রাতে সিঁধ কাটতে বার হয় কিনা, ঠিক বলতে পারি না। মা সব জানে—তবু...!...ওই এক রকম!...কি আর বলি! বলবার মুখ নাই।...কিন্তু সত্যি বলছি বিশ্বাসজী, লোকটা যে অত বদ, তা প্রথমটায় আমি জানতাম না।...যখন জানতে পারলাম তখনও যদি সাবধান হই।...যাক। কপালের লেখা—যা হবার তা হবেই।"...

"তুই সতীথানে অঘোরীবাবার মাথায় একঘা বসিয়ে দিলি না কেন, হাতের সামাটটাকে দিয়ে?"

"তখন মনেই হয়নি ওকথা।"

"সতীথানে ছুটে যাবার সময় তোর কি মনে হচ্ছিল রে?"

"ছুটছি তো ছুটছিই! মনে আবার কি হবে?"

সে বুঝতে পারল না আমার কথা।...আর-এক জগতের নিয়ম মেনে চলছিল নাকি সে তখন?..

আবার আর এক সময় মুনিয়া বলে—"বুঝলেন বিশ্বাসজী, সেই বদমাশটা প্রথম আমাকে ধুনুচিটা দেয় কোথায় জানেন তো? এইখানে।"

"এখানে!"

"হ্যাঁ ঠিক এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে। এখানে পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে। তীর্থের জায়গা, সিংহেশ্বরথান কাছেই; সেই জন্য এই গ্রামের সব বাড়িতেই সাধুসন্ন্যাসীর অবারিত দ্বার। ওই বদমাশটাই আমাকে শিখিয়ে যায়,—অমাবস্যার রাত্রিতে ধুনুচিটা মাথায় রেখে কুশীনদীর দহ দিয়ে পালালে ঠিক মায়ের কাছে পৌঁছে যাবি—মাঝে মাঝে ধুনোর আগুন জ্বালবি—দত্যি-দানো কারও বাবারও সাধ্যি নেই, পথে তোকে ধরে।...ওর কথা অনুযায়ী কাজ করে ফলও পেলাম।...একবার নয়, দুবার। দুবারই যখন আবার মা ধরেবেঁধে পাঠিয়ে দিয়েছে, তখন আসবার সময় ওটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। এখনও মাঝে মাঝে আসে শয়তানটা এখানে। আমি পারত-

পক্ষে দেখা করি না। ভয় ভয় করে লোকটাকে—বাড়ির কর্তাকেই আবার কি না কি বলে দেবে আমার বিরুদ্ধে—শয়তানটা সব পারে।...মায়ের নাম করে আমার কাছ থেকে টাকা চায়, একা দেখতে পেলেই।...মায়ের কাছ থেকে কম টাকা হাতিয়েছে ও! মায়ের কত রকমের রোজগার ছিল—সে সব তো আপনাদের জানা। যথাসর্বস্ব নিয়েছে—এই আমি বলে রেখে দিলাম। চিনি তো ওকে! জানি তো সব আগে থেকেই। সেই সময়ই শুনেছিলাম কনস্টেবলদের কাছ থেকে, যে চোরাই মালের কারবার নিয়েই মায়ের সঙ্গে ওর প্রথম জানাশোনা। সে সব অভ্যাস কি এখনও ছেড়েছে? ...যার যা রীত, না যায় কদাচিৎ!..কনস্টেবলরা বলত যে ও ফেরারী আসামী—দেশে নাকি স্ত্রীপুত্র আছে—পাকাবাড়ি করেছে সেখানে—সব টাকা নাকি সেখানে পাঠায়।...কে জানে!...সব জেনেও যে মা কি করে ওর খপ্পরে পড়েছিল জানি না।"...

"তোর মা এখন কোথায়?"

"কে জানে—বেঁচে আছে কি মরে গিয়েছে! আপনার জামাই তো জানে যে মরে গিয়েছে অনেককাল আগে। অঘোরী তো টাকা চাইবার সময় বলে যে বেঁচে আছে। সেই জন্যই আমার বিশ্বাস যে বেঁচে নাই। ও যদি বলে পুবে যাচ্ছি, আমি ধরে নিই, ও যাচ্ছে পশ্চিমে। টাকার জন্য ও মরা লোককে বাঁচিয়ে তুলতে পারে। হাড়ে হাড়ে চিনি বজ্জাতটাকে! কিন্তু যাই বলুন, লোকটার ক্ষমতা আছে। যেখানে যায়, বেশ গুছিয়ে নেয়। বাকিয়া-ভবানীপুরের থানেও নিশ্চয় বেশ জাঁকিয়ে বসেছে।...খাঁই মেটে না লোকটার,—আশ্চর্য!"

এমনি করে ঘুরিয়ে অঘোরীবাবার কথাই তোলে মুনিয়া। তার মা আর পেটের ছেলে রঘুকে নিয়েই হওয়া উচিত কথা, কিন্তু বলবার সময় তারা কোথায় যেন তলিয়ে যায়। রামধনীকে জমি আর ঘর দেবার খুঁটিনাটি বিবরণ সে কিছুই জানে না—সে সব জানে ওর মা।

নিজে থেকে মায়ের কথা তুলেছিল সে শুধু একবার।

"আচ্ছা আপনার কি মনে হয়—বেঁচে আছে আমার মা? আরে

মরলেও মরেছে, বেঁচে থাকলেও মরেছে। অঘোরীসন্ন্যাসী তো বলেছিল যে ওর আঙুল-টাঙুলগুলো খসে গিয়েছে। জানেন বিশ্বাসজী—আমার মনের মধ্যে একটা ভয় আছে—মা যদি কোন দিন এখানে এসে হাজির হয়! তাহলে আমি মুখ দেখাতে পারব না এদের কাছে!—আমার মায়ের যত দোষই থাকুক, সেদিক দিয়ে আমি তার প্রশংসা করি।...অবুঝ না।.. আমার বড ভয় ভয় করে রোগটাকে। মা বাবা, দুজনেরই দেখলাম তো।.. মা বোধ হয় নিজের রোগের কথা আগেই বুঝেছিল। আমি বুঝিনি। উরতে ঘা তো উরতে ঘা।. একে সেই কাণ্ড, তার উপর এই রোগের ভয়; এখানে চলে আসতে পেরে তখন বেঁচেছিলাম।"..

শেষের দিন, রঘুকে দেবার জন্য সতরটা টাকা দিয়েছিল আমার কাছে; আর বোধহয় হাতে ছিল না। অনুযোগের সুরে চুপি চুপি বলেছিল—"ছোঁড়াটা এই বয়সে এত নেশা ভাঙ করে—বারণ করতে পারেন না ওকে?"

মুনিয়ার মায়ের খোঁজে যেতে হবে গঙ্গার ধারের বাকিয়া-ভবানীপুরে। রওনা হবার সময় গোরুর গাড়ির কাছে সবাই এসে দাঁড়িয়েছে।...বিশ্বাসজী 'সাধু' মানুষ, সিংহেশ্বরথানে কুশীনদীতে স্নান সেরে এইবার চলেছেন বাকিয়া-ভবানীপুরে গঙ্গাস্নান করতে।...বাড়িসুদ্ধ সবাই তাঁর পায়ের ধুলো নেয়।

দরকারের চেয়েও জোরে মুনিয়া বলে—"বাচ্চা সন্ন্যাসীর এ ধুনুচিটাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান বিশ্বাসজী। তিনি তো এলেন না নিজের জিনিস নিতে। বাইরে পড়ে থাকে ওটা, আমরা সব সময় তটস্থ হয়ে থাকি; লোকজন ছোঁয়াছুঁয়ি, কুকুব বিড়াল কত কিছু আছে তো। ওটাকে মা গঙ্গাকে দিয়ে দেওয়াই আপনার মত লোকের হাত দিয়ে।"

ন্যাকড়া-জড়ানো পুলিন্দাটাকে সে দিল আমাব হাতে। নেবার সময় তাকাতে পারলাম না মুনিয়ার দিকে।

পুলিন্দাটাকে সুটকেসে ভরে নিয়ে গোরুর গাড়িতে উঠি।

*　　　　　　　*　　　　　　　*

বাকিয়া-ভবানীপুরে গঙ্গার ধারের শিবালয়টাতে দেখলাম অঘোরী বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। চেহারাটাতে বেশ একটা মহন্ত মহন্ত ভাব এসেছে। করিত-কর্মা লোক। তার সঙ্গে বেশী কথা হয়নি। বেশীক্ষণ সেখানে থাকি নি।...ইনি আবার কেন এখানে—এমনি একটা ভাব দেখলাম তার মুখ-চোখে। তার গাম্ভীর্যের মুখোশ আমার কাছে খুলবে না, একথা সে প্রথম নজরেই সংকল্প করে নিয়েছে।...সতীথানের সেই প্রহারের কথা সে বোধহয় ভোলেনি। কি উদ্দেশ্যে এখানে আমার আসা, সে কথা বললাম। রঘুয়ার পরিচয়টা ভাল করে না দিয়ে দিলে, ও বোধহয় আমাকে মুনিয়ার মায়ের বর্তমান ঠিকানা দিত না। মুনিয়ার মা থাকে লবটুলিয়ার হাটে। সরকার বাহাদুরেব হাট।

লবটুলিয়া আমার জানা গ্রাম। এ জেলাব কোন গ্রামই বা আমার না জানা। সরকার বাহাদুর অনেক টাকা খরচ করে একসময় যাযাবর মঘইয়া-ডোমদের একটা দলকে এই নতুন জায়গায় বসবাস করিয়েছিল। আমাকে বারকয়েক সেখানে যেতে হয়েছিল, কার্যসূত্রে। বহুদিন অবশ্য যাওয়া হয়নি; কিন্তু আমি যখন গিয়েছি তখন সে গ্রামে কোন হাট ছিল না। অঘোরী বলল যে বছর কয়েক আগে সবকারবাহাদুর গ্রামের মধ্যে হাট বসিয়েছে। মঘইয়া-ডোমরা কুষ্ঠরোগীদের ঘেন্না করে না, খেতে টেতে দেয়; তাই সে ওখানে থাকে।

অঘোরী আমাকে বসতে পর্যন্ত বলেনি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তার সঙ্গে কথা। পত্রপাঠ আমাকে বিদায় না করতে পারলে সে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না দেখে, আমিও কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে গোরুগাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম।

সারা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছি মুনিয়ার মায়ের কথা। তার লবটুলিয়ায় থাকবার কারণটা যা অঘোরী বলল তা আমার মনে বসেনি। অঘোরীকেও চিনি, মুনিয়ার মাকেও চিনি ; চোরছ্যাচড় নিয়েই এদের কারবার চিরকাল। মঘইয়া-ডোমদেরও পেশা ছিল চুরি করা। ওই সংক্রান্ত কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে মুনিয়ার মা লবটুলিয়ায় থাকে না তো ? সম্ভবতঃ মঘইয়া-ডোমদের চুরিকরা জিনিসগুলো বিক্রির সঙ্গে এদের দুজনেরই সম্বন্ধ আছে। বলা যায় না কিছুই। চোরাইমালের কারবারে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগের জন্য এমন সব লোকের দরকার হয়, যাদের উপর হঠাৎ সন্দেহ যেন না পড়ে। যাকগে মরুকগে। ও নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার কি। তবে অঘোরী যেন গায়ে পড়ে বলল কথাটা। পথে শুনলাম, সেদিন লবটুলিয়ার হাটবার। হাটের চালার স্থায়ী বাসিন্দারা সরকারী ঠিকেদারের ভয়ে সেদিন ওখানে থাকবে না, তাই মোড়লের বাড়িতে গিয়ে ওঠাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলাম। মোড়লের বাড়ি আমার চেনা—সেই প্রকাণ্ড অশথগাছটার সম্মুখেই—বহুবার গিয়েছি মোড়লের বাড়িতে। নামটা ঠিক মনে পড়ছে না।

"মোড়ল বাড়িতে আছ নাকি ?"

"কে ?"

সম্মুখের অশথতলা থেকে একজন বুড়ী এগিয়ে এল।

"কাকে খুঁজছিস ? কী দরকার ? আজকালকার মোড়লের বাড়ি ওই ওদিকে। এখন কি আর পাবি বাড়িতে—এখন যে পুরুষরা হাটে গিয়েছে। এ বাড়িও পাঁচ বছর আগে মোড়লেরই বাড়ি ছিল। গুজরাতীর বাপ ছিল মোড়ল। আমি গুজরাতীর মা।…ও মা! বিশ্বাসজী! দূর থেকে চিনতে পারিনি! অনেকদিন এদিকে আসিসনি তো। এদিকে কোথায় এসেছিলি ?"

"বাকিয়া-ভবানীপুর।"

"সেখানে আবার কিসের গণ্ডগোল ? গণ্ডগোল না হলে তো তোরা কোথাও আসিস না।"

"থানের অঘোরীবাবার সঙ্গে একটা কাজ ছিল।"

বুড়ির মুখের স্বাগত-সম্ভাষণের হাসিটা মিলিয়ে গেল নিমেষের মধ্যে। গম্ভীর মুখখানায় ফুটে ওঠে, অবিশ্বাস আর সন্দেহ। সে প্রতীক্ষা করছে আমার কথার। বিশ্বাসজী কি কাজে এসেছে, সেটা তার আগে জানা দরকার।

লবটুলিয়ার লোকরা বাকিয়া-ভবানীপুরের অঘোরীকে চেনে দেখে, আমার আগেকার সন্দেহ বদ্ধমূল হল।

"বসবি নাকি ?"

"না না। আমার কাজ আছে একটু মুনিয়ার মায়ের সঙ্গে—ওই যে তোমাদের গ্রামে একজন কুষ্ঠরুগী থাকে না ?"...

বুড়ীর চোখ দুটোতে কোন ব্যঞ্জনা নাই—যেন পাথরের চোখ। সতর্ক হয়ে গিয়েছে সে—পুলিস হঠাৎ খানাতল্লাসী করতে এলে যেমন হয়ে যায় তারা ঠিক তেমনি।

"মুনিয়ার মায়ের কাছে এসেছি তার মেয়ের একটা কাজে। আর অন্য কিছু না।"

শেষের অর্থপূর্ণ কথাটা একটু স্পষ্ট করেই বললাম। ঠিক ধরতে পেরেছে সে। মুখের হাসি ফিরে আসে।

"ওমা! তা বললেই হয়। মুনিয়াব মা তো এখানেই রয়েছে। হাটবারে ও এই গাছতলাতে এসেই বসে। ওরে ও মুনিয়ার মা, দেখ তোর কাছে কে এসেছে।"

আমি নিজেই গেলাম তার কাছে। প্রথমটায় চিনতে পারিনি। এত দিনের কুষ্ঠরোগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি যে রকম জখম হওয়া আশা করেছিলাম, সে রকম কিছু হয়নি। দগদগে গোছের ঘা কোথাও নেই।

ফোলা ফোলা সিংহ সিংহ গোছের মুখ, উঁচু ভুরু দুটোতে চুল নাই, চোখ লাল, পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে গভীর রেখায় চিহ্নিত মুখের রঙ।

কি জন্য এখানে আসা, সেকথা জানাতেই বলে যে একটা কাগজে সে টিপসই করে দিয়েছিল সাক্ষীদের সম্মুখে। তবে দলিলখানা রেজেস্টারি করা

হয়েছিল কিনা তা তার মনে নাই।…ওই ব্যাপার নিয়ে সে আর রামধনী নিরাপদবাবুর কাছেও গিয়েছিল। দাড়িওলা-মহাত্মা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল।…স্পষ্ট মনে আছে দাড়িওলা-মহাত্মা সেই দলিলে সাক্ষী।—তাকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন। সে কি! দাড়িওলা-মহাত্মা নেই ওখানে? ·· বড় ভাল লোক ছিল!…গায়ের জোর দেখাতে এসেছে দ্বারভাঙ্গা জেলা থেকে রামধনীর ভাইপো! কাছারির সেপাইগিরি ফলাতে এসেছে!…আরে কনস্টেবল পুলিস আমার ভাতডাল।…সেখানে থাকলে পরে মোচ উপড়ে নিতাম! এ চেহারা নিজের পাড়ার লোকদের আর দেখাবার স্পৃহা নাই, নইলে আজও গিয়ে ঠেঙিয়ে বার করে দিতে পারি ঘর থেকে, দ্বারভাঙ্গার সেপাইটাকে। এই শরীর নিয়েও!…

এই ধরনের সব কথা মুনিয়ার মায়ের। কাজের কথা বেশী নয়। রঘুর ভালমন্দ নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছা তার নাই, একথাও সে বুঝিয়ে দিল। দূরত্বে, আর দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে 'কোথাকার কোন একটা ছোঁড়ার' স্মৃতিও তার মন থেকে প্রায় মুছে গিয়েছে। মুনিয়ার খবর জিজ্ঞাসা করল বটে, কিন্তু তার মধ্যেও যেন আন্তরিকতার অভাব। শুধু নিজের দেশের, নিজের পাড়ার লোকজনদের খবরের জন্য এখনও তার কৌতূহল কমেনি।

—সতীথানের এখনকার সন্ন্যাসীর নাম পল্টনবাবাজী? সে আবার কি নাম? তার মন্ত্র পুজোর ধক্ কেমন?—রামধনী লোকটা বড় ভাল ছিল। কিসে মল?—লাইনের পুলিসরা নতুন ঠাকুরবাড়ি তয়ের করিয়েছে? সেখানেই তাদের সাঁঝের আড্ডা আজকাল? ওই ছোঁড়াটার চেহারা মিচকে শয়তানের মত হয়েছে না?—রঘুয়ার কথা বলছি।—রেণুদির বাবা স্বর্গে গিয়েছেন? রেণুদির মা এখনও বেশ শক্ত সমর্থ আছেন তো? রেণুদি মধুগঞ্জেই আছে তো? বড় সাদা মন মেয়েটির!—

কত প্রশ্ন, কত উত্তর। কোনটায় খুশী, কোনটায় বিরক্ত, কোনটায় আশ্চর্য হয় সে। কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগে যে, ও রেণুর মধুগঞ্জে থাকবার কথাটা মনে করে রেখেছে কি করে এতদিন। কোন দূরদেশের একটা ছোট্ট মহকুমা শহর মধুগঞ্জ, এ তো মুনিয়ার মায়ের মত লোকের জানবার

এবং এতকাল পরেও মনে রাখবার কথা নয়! যে সন্ন্যাসী রেণুকে বোকা-বানিয়ে তার গয়নাগাঁটি নিয়েছিল সেটার সঙ্গে এর যোগসাজশ ছিল না তো? লোকটা অঘোরীবাবাই নয়ত? কিংবা মুনিয়ার মায়ের জানা অন্য কোন ঠগজোচ্চোরও হতে পারে। এই বোধহয় রেণুর সব খোঁজখবর দিয়ে থাকবে। রেণুর সন্তান নষ্ট হবার খবরও এ-ই দিয়ে দিয়েছিল নিশ্চয়, সেই সন্ন্যাসীকে।—রেণু চিনবে কোথা থেকে অঘোরীবাবাকে? বাঙালী ভদ্রমহিলারা কি কেউ যান সতীথানে ইট বাঁধতে!—

মুনিয়ার মা অনর্গল বকে চলেছে। বিষয় পালটেছে। বলছে নিজের দুঃখের কথা, অভাবের কথা। কি জানি কেন, তার দারিদ্র্যের কথা আর আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। পরনের কাপড় ছেঁড়া কুটিকুটি, অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নাই, তবু বিশ্বাস হচ্ছে না তার কথা। এইবার সে কাঁদতে আরম্ভ করল নিজের দুঃখের কথা বলতে বলতে। গুটিগুটি এগিয়ে এসেছে গাছতলার অন্য স্ত্রীলোকরা কান্নাকাটির গল্পর গন্ধ পেয়ে। সায় দিচ্ছে তারা মুনিয়ার মায়ের কথায়।

গুজরাতীর মা বলে—"বাকিয়া-ভবানীপুরের অঘোরীটার জন্যই আজ এর এই দশা। এর টাকাকড়ি সমস্ত খেয়ে পেট মোটা করে বসে আছে। আমাদের গাঁয়ের লোকরা মুনিয়ার মায়ের জন্য তাকে মারধর করবার ভয় দেখায়, তাতেই গোটাকয়েক টাকা দিয়েছিল। মুনিয়ার মা যে অঘোরীর গায়ে হাত তুলতে বারণ করে—নইলে ওটাকে ঠাণ্ডা করতে কতক্ষণ লাগে। অতবড় চেহারা হলে কি হয়, খুব ভীতু লোকটা।···বুঝলি বিশ্বাসজী গুজরাতীরা বলে যে অঘোরীর কোথায় যেন ঘর-সংসার আছে। বহু টাকা করেছে।···রোজগার যেমন ভাবে ইচ্ছা কর, কিন্তু তাই বলে নিজের সঙ্গী সাথীদের ঠকাবি, এ জিনিস বরদাস্ত করবার পাত্র মঘইয়া-ডোমরা না।"

দেখলাম যে, এরা অঘোরীবাবাকে ভাল করেই চেনে।

আমি না বলে থাকতে পারলাম না যে অঘোরী, মায়ের নাম করে মুনিয়ার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে বার কয়েক।

খবরটা শুনে একেবারে হইচই বেধে গেল মেয়েদের মধ্যে। মুনিয়ার মা কাঁদতে কাঁদতেই চীৎকার করছে কি যেন সব বলে। স্ত্রীলোকদের চেঁচামেচির সারমর্ম হল—অঘোরীটার গলায় আঙুল দিয়ে সে টাকা বার করতে হবে যেমন করেই হোক। আর কিছু উত্তম মধ্যমও দেওয়া দরকার, বেশ করে!···তারপর কিছুক্ষণ ধরে চলল অঘোরীর সম্বন্ধে টীকা-টিপ্পনী। অন্তিম রায় দিল গুজরাতীর মা, আঙুলের একটা মুদ্রা দেখিয়ে।

"এই এতটুকুনি মনের লোক হারামজাদাটা!···জানিস বিশ্বাসজী, ওই বজ্জাতটারই সঙ্গে একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলাম!···"

* * *

পথের ধারের অশথতলায় একটা ঘুঘু কি যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।··· প্রথম যখন তাৎলেবররা এখানে আসে তখন ওই গাছটাকে কত ভাল লেগেছিল! তাদের জন্য সরকার-বাহাদুর নতুন গ্রাম বসিয়ে, যখন ইঁদারা দেবার জায়গা খুঁজছিলেন তখন তারা এই অশথ গাছটার কাছাকাছি জায়গাই বেছেছিল। তাদের যাযাবর জীবনে নদীর ধারের অশথতলা পেলে, তারা আর অন্য কোন আশ্রয়স্থান চাইত না। পৌঁছেই প্রথমে গাছের ছোট ছোট ডালপালা কাটতে আরম্ভ করত, সঙ্গের ছাগল, গোরু, ভেড়াগুলোকে খাওয়ানোর জন্য। কিন্তু এখন আর সম্মুখের অশথ গাছটাকে সে রকম ভাল লাগে না।

তাৎলেবর বসেছে মাচার উপর; তার ছেলে গুজরাতী আর গুজরাতীর মা মাটিতে। সুখদুঃখের গল্প হচ্ছিল। পুরনো সুখের আর আজকের দুঃখের কথা। যাযাবর জীবনের কষ্টের কথাটুকু এরা ভুলেও মনে আনে না।

আগেকার ভালটুকুর সঙ্গে আজকের জীবনের খারাপটা তুলনা করে করে দেখে। একটা কিসের যেন অভাববোধ অষ্টপ্রহর তাদের পীড়া দেয়। কোন জিনিসের অভাব তা ঠিক বোঝা যায় না। তবে সে জিনিস যে আগেকার জীবনে ছিল, আর আজকের জীবনে নাই, এ সম্বন্ধে তারা নিঃসন্দেহ। অস্বস্তিতে তাদের মন উদাস হয়ে থাকে, সময় সময় তেতোও হয়ে ওঠে। এই মৃদু মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যের হাত থেকে সাময়িক শান্তি পাওয়া যায় সেই সব গল্প করলে।

তালেবর বলে—"মাচার উপর বসলেই আমার মনে হয় যেন কোন হাটের মধ্যে বসে রয়েছি।"

"আমার হাটের কথা মনে পড়ে কুষ্ঠরোগী দেখলে।"

মা বাবার কথার মধ্যে গুজরাতী কোন কথা বলল না। সে জানে তাদের ব্যথা কত গভীর। অন্য দশজনের সঙ্গে লবটুলিয়ার লোকের মেলে না। হাট বলতে পৃথিবীশুদ্ধ সবাই ভাবে বেচাকেনার কথা, লোকের ভিড়ের কথা; কিন্তু নতুন টোলা লবটুলিয়ার লোকে হাটবারের হাটের কথা ভাবে না। যে সব দিনে জনশূন্য হাটের একচালা আর মাচাগুলো খাঁ খাঁ করে, সে সব দিনের হাটের সঙ্গেই ছিল এদের সম্বন্ধ। বর্ষায় পথ চলার সময় যখন তারা মাথা গুঁজবার জায়গা খুঁজত, তখন তাদের দেখা হত, ওই সব চালার স্থায়ী রাতের বাসিন্দা কুষ্ঠরোগীদের সঙ্গে। কুষ্ঠরোগী ভিখারীরা বেশী থাকে সে সব হাট-গুলোতে, যেগুলো পাড়ার বাইরে। তালেবররাও সে-যুগে খুঁজত গ্রামের বাইরের হাট। গ্রামের ভিতরের হাটে গেলে, হাটের মালিক আর পাড়ার লোকে অনর্থ বাধাত; চৌকিদার থানায় খবর দিত। তাছাড়া তখন অধিকাংশ সময়েই সঙ্গে সঙ্গে থাকত থানার পুলিশ। সেগুলোই তাদের আস্তানা গাড়তে দিত না গ্রামের মধ্যে। গাঁয়ের বাইরে হাটের জায়গায় ছাড়া, আর ইঁদারা পাবে কোথায়, সব জায়গায় তো আর নদী নাই। তাই হাটের সঙ্গে তাদের স্মৃতি এমনভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়ানো।

"মা, তুই তাহলে কুষ্ঠরোগী দেখতে খুব ভালবাসিস বল।"

"বাসিই তো। আর সব মানুষে আমাদের দেখে ভয় পেত, যেন কেটে

খেয়ে ফেলে দেবো; কিন্তু কুষ্ঠরোগী ভিখিরীরা কোনদিন ভয় পায়নি আমাদের দেখে।"

"আমার কি দেখলে হাটের কথা মনে পড়ে, বল তো?"

বাপ রসিকতা করে—"বেতো ঘোড়ার শুকনো লাদ দেখলে।"

"ধেৎ।"

মা জিজ্ঞাসা করে—"তুইও আবার পুরনো কথা মনে করিস নাকিরে গুজরাতী? আমি তো ভাবতাম, হাট না দেখলে তোর আর হাটের কথা মনে পড়ে না। কি দেখে মনে পড়ে রে?"

"ওই হাড়িটা দেখে।"

তালেবর আর তার স্ত্রী দুজনেই একটু আশ্চর্য হয়ে তাকায় শিকেয় ঝোলানো কালিঝুলি-মাখা মাটির হাড়িটার দিকে। ওই হাড়িটার মধ্যে গুজরাতীর মায়ের পুরনো জীবনের পোশাক—খেরোর জীর্ণ ঘাগরাটা সযত্নে তোলা আছে; আর আছে একটা পুরনো ধুনুচি।

...সত্যিই তো! ঠিক সেইরকম লাগছে! এতদিন খেয়াল হয়নি। হাটের চালাগুলো থেকে ভিখিরীদের কালিঝুল-মাখা মাটির হাঁড়ি এমনি করেই ঝোলে। কোন জিনিস দেখে যে লোকের কোন কথা মনে পড়ে!

মায়ের মন হঠাৎ খুশী হয়ে ওঠে। লবটুলিয়ার বয়স্ক লোকদের ধারণা, যে ছোটরা নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে—পুরনো জীবনের জন্য তাদের বুঝি মন খারাপ হয় না আর। না, তা তো নয়। এ গাঁয়ের সবাই পিছনে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—ছেলে বুড়ো সবাই।

"গুজরাতীটারও দিল আছে দেখছি তা হলে। কিরকম মনে করে রেখেছে দেখ, ছোঁড়াটা।"

"হাটের মধ্যেই ওর নাড়ী কাটা হল, ও কি কখনও ভুলতে পারে হাটের কথা!"

"শোন গুজরাতী তোর বাপের কথা একবার। নাড়ী কাটার সময়ের কথা কারও মনে থাকে নাকি?"

"আরে না না, আমি কি তাই বলছি নাকি। কথাটার মানে আগে বোঝ। আমি বলছি অন্য কথা। জন্ম-টন্ম ওসব বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে পাওয়া জিনিস ; মনে না থাকলেও ভোলা যায় না। তাছাড়া তোর আমার মনে না থাকলেও, আমাদের মঘইয়া জাতের সকলের জন্মর কথা সরকার বাহাদুরের নিশ্চয় মনে আছে। সব যে পুলিসের খাতায় লেখা হত ; জন্ম থেকে মরা পর্যন্ত। শুধু আমাদের মরাটা, সে খাতায় আর লেখা হবে না।"

"তখন কি কেউ ভাবতে পেরেছিল যে আমাদেরও মাটির হাঁড়ি ব্যবহার করতে হবে একদিন !"

অন্তরের গভীর থেকে বেরিয়ে এসেছে এই খেদোক্তি। লোকে কথায় বলে—'মঘইয়াদের দুই কাজ ; দিনে পথচলা আর রাতে সিঁধকাটা'। কোন জিনিসে অনাসক্তি না থাকলেও বাসনকোসনের উপরেই ছিল তাদের ঝোঁক বেশী। চৌকিদার, কানিষ্টিবিল-সাহেব এরা সঙ্গে সঙ্গে থাকলে কি হবে, তারাও তো মানুষ—লোকের দুঃখ দরদ বুঝত, তারাই অতিরিক্ত বাসনগুলো বিক্রি করতে সাহায্য করত, আধাআধি বখরায়। সে জীবনে পিতল-কাঁসার বাসনের অভাব হয়নি কোনদিন তাদের, কিন্তু আজ সে ঝোঁক থাকলেও সামর্থ্যে কুলয় না। তাই মাটির-বাসন এদের কাছে, স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধবার প্রতীক।

"গুজরাতীর-মা, নামা দেখি একবার হাঁড়িটা।"

"না না, কি হবে ওসব দেখে।"

"কেন ; দেখলে তোর সেই ঘাগরাটা ক্ষয়ে যাবে নাকি? গুজরাতী পাড় তো হাঁড়িটা !

"না। দেখতে হবে না ! মার খাবি বলছি গুজরাতী আমার কাছে !"

"আরে, ধেৎ তেরি !"—বলে তালেবর হাঁড়িটাকে নামাতে গেল।··· মেয়েমানুষের কথায় কান দিতে গেলে আর লবটুলিয়ার মোড়ল হয়ে বেঁচে থাকতে পারত না সে আজ।

লাফিয়ে উঠে গুজরাতীর মা তার হাত ধরে। চেহারা বদলে গিয়েছে দুজনেরই, মুহূর্তের মধ্যে। তালেবরের হাতের এক ঝটকায় তার স্ত্রী গিয়ে

পড়ল মেঝের উপর। সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়ি থেকে ছিটকে পড়ল পুরনো ধুনুচিটি, আর খেরোর ঘাগরাটা।

কথায় কথায় এদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। মারধব এদের নিত্যকার ব্যাপার। গুজবাতীর মাও হয় তো হাতেব কাছে খড়ম লাঠি যা পেত, তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত স্বামীর উপব। কিন্তু ধুনুচিটি যে মেঝেতে পড়ে গিয়েছে। মেঝে থেকে সেটাকে তুলে মাথায় ঠেকাল।

তালেবরও অপ্রস্তুতেব একশেষ। সে জানে তার ধুনুচিটা তার স্ত্রীর কত আদরের জিনিস। বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া। মারা যাবার সময় তার বাপ দিয়ে গিয়েছিল তার একমাত্র মেয়েকে। কয়েক পুরুষ থেকে এটা ছিল তাদেব পবিবারে। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে, পুর্বপুরুষদের কে যেন ধুনুচিটা একজন সন্ন্যাসীর কাছ থেকে পেয়েছিল। 'পাওয়া' মানে যে কী, তা তাবা জানে। পাওয়া মানে নেওয়া—না বলে নেওয়া—জোর করে নেওয়া—রাতের অন্ধকারে সিঁধ কেটে নেওয়া—বাধা দিলে তাকে সাবাড় করে দিয়ে নেওয়া। বাপঠাকুরদারা এমনি করেই এ জিনিস পেয়ে থাকবে। নইলে সাধু-সন্ন্যাসীর দায় পড়েছে কোন মঘইয়াকে যেচে জিনিস দিতে। দেখেছে তো সাধুবাবাদেব। দুটো মিষ্টি কথা বলা দূরে থাক, তারা মঘইয়াদের কাছেও ঘেঁষে না। রাতের বেলা আবাম খোঁজে, তাই পথচলতি সন্ধ্যা হলেই তারা ছোটে ভুঁড়িওলা গেবস্তদেব বাড়ি। সেইজন্য পথচলার যুগে সন্ন্যাসীদেব দু চক্ষে দেখতে পারত না মঘইয়ারা কোনোদিন। এই ধুনুচিটা বস্তায় ভরে সেইটা মাথায় দিয়ে, তাদের সেই পুর্বপুরুষ এক রাত্রে ঘুমুচ্ছে, এমন সময় তাকে গোখরো সাপে কামড়ায়। সাপের কামড়েও কিন্তু সে মবেনি, এই ধুনুচিটার গুণে। তাই ধুনুচিটাকে অন্য দশখানা বাসনের মত বিক্রি করে দেওয়া হল না। তারপর থেকে পুরুষানুক্রমে, তারা কেউ হাতছাড়া কবেনি এটাকে। পথচলতি কতবার কত দত্যিদানো, আপদ বিপদের হাত থেকে তাঁরা বেঁচে গিয়েছে এর কল্যাণে। চিরকাল তারা শুনে এসেছে যে, এ ধুনুচি কাছে থাকলে ঘরে মন টেঁকে না, পথ চলতেই হয়। কিন্তু কই? সে নিয়ম থাকল কই? সে-ই রাজা

হরিশ্চন্দ্রের সময় থেকে যে পথচলা শুরু হয়েছিল, তা সরকারের হুকুমে বন্ধ হয়ে গেল কি করে? কিন্তু সরকারবাহাদুরের হুকুম মানুষে মেনে নেয়, জিনিসে নেয় না। তারা মেনে নিয়েছে, কিন্তু ধুনুচিটা নেয়নি। পথচলার যুগে বর্ষায় পায়ে পাঁকুই হলে, তারা এই ধুনুচিতে ধুনো গরম করে লাগিয়ে দিত; একদিনের মধ্যে পাঁকুই সেরে যেত। এখানেও এখন ক্ষেতের কাজ করে বর্ষায় পায়ে খুব হাজা হয়। যেবার তারা প্রথম এখানে আসে, সেবার ধুনোচিতে ধুনো গরম করে লাগিয়েছিল পায়ের ফাঁকের হাজাতে। একদিন, দুদিন, সাতদিন, দশদিন—কিছুতেই কিছু হল না! বুক চাপড়ে, কপাল চাপড়ে মরে গুজরাতীর মা। বোঝা গেল যে, এক জায়গায় খুঁটির সঙ্গে বাঁধা পড়ে ধুনুচিটার ধক ফুরিয়ে গিয়েছে। সে পাঁকুই সারল সরকারী ডাক্তারের দেওয়া মলমে। যেখানকার যা সেখানকার তা। যেখানে সরকারী নিয়ম রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিয়মের চেয়ে বড়, সেখানে রোগ সারে সরকার বাহাদুরের দেওয়া ওষুধে। এ ধুনুচির দরকার ফুরিয়েছে পথ চলার পালা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে। তুলে রেখেছিল তাই এটাকে গুজরাতীর মা। তার স্বামী ছেলে কারও এই অনাবশ্যক জিনিসটার কথা আর মনেও পড়ে নি এতদিন।

অনেকদিন দেখেনি. স্বামী, স্ত্রী, ছেলে তিনজনেই হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ধুনুচিটাকে দেখছে। অদ্ভুত দেখতে। পিতল না তামা কিসের যেন। কলঙ্ক পড়ে সবুজ হয়ে গিয়েছে। নীচের দিকটা একজোড়া পায়ের পাতার মত; তারই সঙ্গে ধরবার হাতলটা, আর ধুনো জ্বালাবার বাটিটা বসানো। কেউ একটাও কথা বলে না। গুজরাতীর মা সেটাকে সযত্নে কাপড় দিয়ে মুছে, আবার রেখে দিল হাঁড়ির ভিতর। এতক্ষণে তার সময় হল ঘাগরাটাকে ঝেড়ে তুলবার। ক্ষার দিয়ে কেচে, পাট করে তুলে রেখেছিল এটাকে। গুজরাতীর মায়ের চোখে অনুযোগের ব্যঞ্জনা—'দেখ কি করেছিস দেখ্।'

এই চাউনিই যুদ্ধবিরতির সূচনা। অল্পর উপর দিয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা; তাই তালেবর আর কথা কাটাকাটি করে না এ নিয়ে।

ঘাগরাটাকে দেখলেই গুজরাতীর মায়ের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। ঘরে যখন কেউ থাকে না, তখন সে এটাকে মধ্যে মধ্যে বার করে করে দেখে। লবটুলিয়ায় আসবার পর থেকে তাদের ঘাগরা পরার পাট উঠে গিয়েছে। জেলার-হাকিম বছরে একজোড়া করে শাড়ি দেয় তাদের প্রত্যেককে। সরকারী হাকিমরা সেই সময় এসে বলেছিল—ঘর বেঁধে থাকতে গেলে নাকি শাড়ি পরতে হয়। ঘাগরা পরলে নাকি আশপাশের গ্রামের লোকরা কোনদিন ভুলতে পারবে না যে, লবটুলিয়ার লোকরা মঘইয়া-ডোম। আরে, তোরা তো বলে দিয়েই খালাস! শাড়ি পরে কি কোন কাজ করা যায়? হাঁটতে গেলে পা জড়িয়ে আসে, অথচ কেমন যেন নেংটো নেংটো লাগে। আর যে জন্য পরা—আশপাশের গ্রামের লোকরা কি শাড়ী পরতে দেখলেই ভোলে? তারা লবটুলিয়াকে বলে মঘইয়াটুলি। নামটা বলবার সময় নাক সিঁটকয়। ঘর বেঁধে যারা থাকে, তাদের মন ওই বেড়া-দেওয়া উঠনের মত এতটুকু!

"মা, তোর সঙ্গে কথা বলতে তো ভয়ই করে। চটিস না, একটা কথা বলছি। ঘাগরাটাকে একবার পরবি? দেখি, কেমন দেখতে লাগে। ভুলে গিয়েছি।"

"মারবো এক থাবড়া।"

"ওই দেখ! বলেছিলাম আগেই!"

"আগেই বলিস, আর পরেই বলিস, ও ঘাগরা আমি পরছি না। দাঁড়া, ওটাকে তুলে রেখে দি।"

"জেদী, জেদী! তোর মা কি গুজরাতী কারও কথা শুনেছে কোনদিন যে আজ তোর কথা রাখবে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা থাম! তোর আর রসান দিতে হবে না!—ঘাগরা অমনি পরলেই হল—কে না কে এসে পড়বে তার ঠিক নেই!"

বাপ ছেলের দিকে চেয়ে হাসল—"টোলার কোন লোকটা বাড়িতে আছে আজ যে আসবে?"

"টোলার লোকরা না থাকুক। যার ভয়ে তারা সবাই পালিয়েছে, সে লোকটার কথা ভুলে যাচ্ছিস কেন? লবটুলিয়ায় আবার নতুন লোক

আসবার কামাই আছে নাকি ? লোকের পর লোক আসছেই—আসছেই। একদিন বাদ নেই। এক মিনিট নিশ্চিন্দি নেই! অতিষ্ঠ করে দিল একেবারে! সব কটা এসে হাঁড়ির খবর চায়! ইচ্ছা করে এ সব ছেড়েছুঁড়ে পালাই, যেদিকে দুচোখ যায়!"

এ কথার প্রতিবাদ করতে পারে না তালেবর। সে নিজেও ভুক্তভোগী—লবটুলিয়ার সবাই। যবে থেকে তারা এখানে বসবাস আরম্ভ করেছে, তবে থেকে শুরু হয়েছে সরকার বাহাদুরের লোকদের আনাগোনা। এ আপদগুলো দুরকমের। এক রকম পেন্টুলুন-পরা; সেগুলোকে ওরা বলে হাকিম। আর এক রকম—ধুতিপরা, সেগুলোকে ওরা বলে হাকিমের চাকর। কেউ এসে বলে এমনি করে থুতু ফেলবি, কেউ এসে বলবে এমনি করে ছাগলের নাদিব পাহাড করবি,—সব বিষয়ে নাক গলাতে আসে তারা! ওই দুরকমের লোকের উপরই ওরা সমান বিরক্ত। তবে পেন্টুলুনপরা হাকিমগুলো টাকা, শাড়ি, ইঁদারা দেবার মালিক, তাদের খাতির দেখাতে হয়! তারা এলেই লবটুলিয়ার মেয়েরা হেসে, বাঁকা চোখে ঝিলিক আর দেহরেখায় বিজুলী খেলায়, পুরুষরা ঝুঁকে হুজুরকে সেলাম করে। কিন্তু ধুতিপরা হাকিমের চাকরগুলো যখন আসে, তখন লবটুলিয়ার লোকে তাদের বিশেষ আমল দেয় না।

'যা বলবার আছে বলে যাও'—এমনি একটা ভাব দেখিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আসলে এখানকার একঘেয়েমির গ্লানি তাদের ভবঘুরে মনের মধ্যে জমতে জমতে বিষিয়ে ওঠে। কিন্তু রাগের পাত্র হিসাবে রক্তমাংসের লোক না পেলে তৃপ্তি হয় না। সরকার বাহাদুরকে তারা দেখেনি, তাই সব রাগ গিয়ে পড়ে হাকিম, আর হাকিমের চাকরদের উপর। তারা পিছন ফিরলেই লবটুলিয়ার লোকে তাদের গালাগাল দেয় 'শ্বশুর' বলে।

আজ যে শ্বশুরটার ভয়ে গাঁয়ের লোকবা পালিয়েছে সেটা হাকিম না হাকিমের চাকর, সেইটাই হচ্ছে কথা।

"যেটার আসবার কথা আছে, সেটা পেন্টুলপরা, না ধুতিপরা ?"

"তা আমি কি করে জানব।"

"ধুতিপরা হলে সেটাকে দু ঘা দিলে কেমন হয়?"

"না না!"

"দেখছিস গুজরাতী, তোর বাপ ভয় পেয়ে গিয়েছে সেই গুরুমশাইকে মারবার পর থেকে।"

এখন যেখানে রাত্রে ছাগল গোরু থাকে, সেই চালাটাতে একজন হাকিমের চাকর গুরুমশাই প্রতি রাত্রে লবটুলিয়ার লোকদের অ আ পড়াবার নাম করে আসত। লোক ভাল ছিল না। জ্বালাতন হয়ে গিয়ে তালেবর তাকে একদিন এমন প্রহার দিয়েছিল যে সে আর এমুখো হয়নি। সে আপদ বিদায় হয়েছিল বটে, কিন্তু সেবার জেলার হাকিম বড় ঝঞ্ঝাট বাধিয়েছিল। শেষকালে বিশ্বাসজী মাঝে পড়ে ব্যাপারটা মিটমাট করে দেন।...জেলার হাকিম হালের-বলদ মরলে দেয়, বীজের ধান দেয়, শীতে কম্বল দেয়; তাকে চটাতে ভয় করে।

ভয়ের কথাটা মুখ ফুটে স্বীকার করতে বাধে। তালেবরের মনের সব চেয়ে স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দিয়েছে গুজরাতীর মা। ভীতু কথাটার চাইতে বড় তুর্নাম আর নাই মঘইয়াদের মধ্যে। পথচলার যুগে এরা কোথাও আস্তানা গাড়লে, এদের ভয়ে আশপাশের গ্রামের মায়েরা ছেলের গলার মাতুলিটা পর্যন্ত খুলে রাখত, মেয়েরা ক্ষেতখামারে যাওয়া বন্ধ করে দিত, পুরুষরা পালা করে রাত জাগত। রাতদুপুরে গেরস্তবাড়ির আনাচ কানাচ থেকে তালেবররা কতবার শুনেছে, ঘুমজড়ানো স্বরে মায়েরা দুষ্টু ছেলের কান্না থামাচ্ছে, মঘইয়াডোমদের কাছে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে।

স্ত্রীর কথায় তালেবরের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সে বুক ঠুকে বলে—"এই তালেবর মঘইয়া আজ পর্যন্ত কাউকে ভয় পায়নি, বুঝেছিস। বন্দুকের গুলিকে পর্যন্ত ভয় পাইনি জানিস!"

"সেই সোনাপুরের কথাটা বলছিস তো? সেই যে গেরস্তর হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়েছিলি সে কি আজকের কথা—তখনও গুজরাতী জন্মায়নি। তখন তো আর বাঁধা ঘরের মধ্যে থাকতিস না। সেদিন, আর আজ! হেঃ! আজ বন্দুক দেখলে আর কাছার কাপড় থাকবে না!"

"দেখ গুজরাতীর মা, অমন করে খোঁচামারা খোঁচামারা কথা বলবি না, বুঝলি! থাবড়ে মুখ ভেঙে দেবো! মরা তেলী, একশ আধুলি! বুঝলি? যে তেলীটাকে ভাবছিস খেতে না পেয়ে মরে যাচ্ছে, সেটার বাড়ি থেকেও দেখবি মরবার পর একশ আধুলি বেরুবে। পেণ্টুলুন-পরা হাকিমরা আমার সঙ্গে 'আপনি' বলে কথা বলে, আর তোর মুখের কোন রাশ নাই?"

"তুই না বলে আপনি বলেছে হাকিম, তাতেই যে ফুলে হাপড হয়ে গেলি! দেখিস, দেখিস—আবার ফট করে ফেটে না যাস! তোকে আমাকে কি আব ওই হাকিমগুলো মানুষ মনে করে নাকি? মানুষ মনে করলে নতুন গ্রাম বসাবে কেন—পুবনো গাঁয়ের মধ্যে অন্য মানুষদের সঙ্গেই থাকতে দিত। শুনিস না, উঠতে বসতে বলে আশপাশের গাঁয়ের মানুষদের মত হতে? দেখিস না তাদের হুকুমেব ঘটা? এমনি করে শাড়ি পরতে হবে, এমনি কবে ইঁদারার পাড়ে জল ঢালতে হবে, সকালে বিকালে লোটা হাতে কোন মাঠে যেতে হবে তা পর্যন্ত! গোবর-সোনার হাকিমটা—ওই যে যেটা এসেই প্রথমে বলে 'গোবরই হচ্ছে সোনা'—সেইটা বলে কিনা উনুনের ছাই ক্ষেতের মধ্যে না ফেললে পিটবে। এত বড আস্পর্ধা! যাকে লোকে সত্যিকারের 'আপনি' বলে তাকে আবার হুকুম করে নাকি? মুখে বলে ভাই—মনে ভাবে গাই! গোরুরও অধম! বোঝা তো যায়। 'আপনি' বলায় যে ফুলে কুপো হয় সে যেন হাকিমের দেওয়া ইঁদারাব পাব জিভ দিয়ে দিয়ে চাটে। শাড়ি, কম্বল দিয়েছে বলে হক কথা বলব না, তেমন মেয়ে আমার বাপ জন্ম দেয়নি!"

"মেলা বকিস না! লম্বা লম্বা কথা! সে বাপের মেয়ে যেখানে ইচ্ছা চলে যাক না কেন; কে তাকে আটকে রাখছে!"

"কথা বলবার হলেই বলে!"

"মা, তুই থামবি কিনা বল। শোন আমার কথা! রাত্রে কিন্তু পড়তে হবে যাগরাটা। বাড়ির মধ্যে রাতে তো আর কেউ দেখতে আসছেনা। এই নে বিড়ি।"

"আমার কথা কারও সয় না দেখি—না বাপের না বেটার। হাকিমের-চাকর যখন এসে গালাগাল দিয়ে গেল বীজের ধান খেয়ে ফেলেছিস বলে, তখন সে গালাগাল হাঁ করে গিললি তো? আমার কথা সইবে কেন। আচ্ছা, আমি এই চুপ করলাম!"

সে বসল গম্ভীর হয়ে, ছেলের দেওয়া সিদ্ধিপাতার বিড়ি টানতে! তিন-জনেই নীরব কিছুক্ষণের জন্য। বাপ ছেলের দিকে চোখ টিপে ইশারা করে—দেখ না কী মজা করি। ছেলে বোঝে যে বাপ এখনি আরম্ভ করবে, সরকার-বাহাদুর বালিভরা জমি দিয়ে মঘইয়াদের কেমন করে ঠকিয়েছে। একথা শোনবার পর মায়ের সাধ্য নাই যে সে চুপ করে থাকে।...

কিন্তু সময় পাওয়া গেল না।

ঘু-ঘু-উ-উ-ঘু!..

ডাক শোনা গেল ঘুঘু পাখির, বহু দূর থেকে। অশথতলার ঘুঘু পাখিটা থমকে দাঁড়ায়। এই অসময়ে সঙ্গী ডাকছে কেন, এমন কাতর মিনতি জানিয়ে? গ্রীবা-ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে বিস্ময়। শব্দ লক্ষ্য করে পাখিটা উড়ে গেল।

পাখিরা ভুল করে এ ডাক শুনে, কিন্তু লবটুলিয়ার লোকে করে না। তিন জনেরই কান খাড়া হয়ে ওঠে।

"আসছে শ্বশুরটা!"...

ফাঁদ পেতে ঘুঘুপাখি ধরবার জন্য যাযাবর জীবনে তারা এ ডাক শিখেছিল। আজকাল এ ডাকের, ওই এক মানে—সাবধান, অবাঞ্ছিত কেউ আসছে গ্রামে!...গ্রামের লোকেই কেউ সতর্ক-বাণী পাঠাচ্ছে দূর থেকে।

পাশের গ্রামে কলেরা হয়েছে। কাল থেকে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে হাকিম আসবে লবটুলিয়ার লোকদের গায়ে কলেরার সুঁচ ফোটাতে। তালেবর গ্রামের মাথা, গ্রামে যে-ই আসুক, তার বাড়িতেই আসবে। আজ চৌকিদার তাকেই খবর দিয়ে গিয়েছে। বলে গিয়েছে বাড়িতে থাকতে। তাই আজ গ্রামসুদ্ধ সকলে ইনজেকশনের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও, তালেবররা যেতে পারেনি। গুজরাতী মাচার উপর উঠে দাঁড়াল—যদি দূর থেকে দেখা যায় কে আসছে।

"পেণ্টুলুন-পরা নাকি রে ?"

"হেঁটে না সাইকেলে ?"

"দেখা যাচ্ছে না কিছুই।"

এই যে। এসে গেল লোকটা। সাইকেলে। ধুতিপরা। হাকিমের-চাকর। ছোকরা। এখনও মোচ কড়া হয়নি—একদম ছোকরা। · ফুঃ !···

"আপনারই নাম তালেবরজী না ? নমস্তে! চৌকিদারকে দিয়ে কাল খবর দিয়েছিলাম, পেয়েছিলেন তো ?"

"হ্যাঁ।"

"আমি বেশীক্ষণ বসব না। আবার ফিরতে হবে ষোল মাইল সাইকেল করে। পাড়ার লোকজনদের তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠান !"

"পাড়ায় কেউ নেই। সবাই কাজে বেরিয়েছে।"

"আগে থেকে খবর পাঠিয়ে দিলাম, তবুও ?"

"তার আর কি করব বল। ধরে তো আর রাখতে পারি না কাউকে।"

"ফিরবে কখন ?"

"সে কথা কি আমায় কেউ বলে গিয়েছে !"

"তা হলে কতক্ষণ বসে থাকব ?"

"বসে থাকতে হবে না।"

"তাহলে আপনাদের তিনজনকে দিয়ে দেব ?"

"না বলছি ! আবার কেমন করে বলব !"

গলার স্বর বেশ রুক্ষ।

লোকটা বোঝে। লবটুলিয়ার লোকদের মেজাজের বেশ দুর্নাম আছে সরকারী-কর্মচারী মহলে। সে আর কথা না বাড়িয়ে সাইকেলে গিয়ে ওঠে। ওঠবার পর রাগ চাপতে না পেরে শাসিয়ে যায়—"আমি থানা হয়ে যাচ্ছি।"

আগুনে যেন ঘি পড়ল।

"বল গে শ্বশুর, তোর বাপ দারোগাকে !"

গুজরাতী লোকটার দিকে দৌড়ে এগিয়ে যায়। হাকিমের-চাকরটা জোরে সাইকেল চালিয়ে, প্রাণ নিয়ে বাঁচে।

এর পরও কি গুজরাতীর মায়ের গাম্ভীর্য টেঁকে!

"নে। এর পরও কি বলিস যে গুজরাতীর মা বাজে বকবক করে?"

...সত্যিই এসবের মধ্যে আর এখানে থাকতে ইচ্ছা করে না! এখানে থাকলে লোকের মনে পচ ধরে। মানুষগুলোই যায় বদলে অন্যরকম হয়ে। একথা লবটুলিয়ার লোকে কত সময় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে। একই জমিতে যারা বছরের পর বছর চাষবাস করে, একই উঠন যারা প্রত্যহ নিকয়, তাদের মন অন্যরকম হয়ে যেতে বাধ্য। লাড্ডু মঘইয়া এক রাত্রে তালেবরের ক্ষেতে মোষ চরিয়ে দিয়েছিল। পথ-চলার যুগে কোন মঘইয়া তার ভাই-বেরাদারের সুঁচটা পর্যন্ত নেয়নি, না বলে। কিন্তু আজ সে সব রীত বদলাচ্ছে। সরকার বাহাদুরের খাতায় এতকাল ধরে মঘইয়াদের প্রত্যেকের নাড়িনক্ষত্র লেখা আছে, কোন মঘইয়া মেয়ে, পুলিসের মারধর জুলুমে, বলে ফেলেছে তার জাত-বেরাদারের রাতের গতিবিধির খবর—এ কি কোথাও দেখাতে পারবে? কালে কালে হল কি। নিরঙ্গুর মা টাকার লোভে বলে দিল সেদিন পাডার মদ চোলাই-এর কথাটা! ঘটিতে করে টাকা মাটিতে পুঁততে শিখবে আর দুদিন পর।...

আগের জীবনে এরা কোনদিন পয়সা জমানোর কথা ভাবতে পারে নি।... জমাতে গেলে সঙ্গের পুলিসটা কেড়ে নিত না?... এই যে পুরনো কুকুর বাণ্টা সম্মুখে বসে রয়েছে—এটার সুদ্ধ মনে পচ ধরেছে—একবার ডাকল না।—হাকিমের-চাকরদের দেখে আর ডাকে না আজকাল!...

"শ্বশুরটা শাসিয়ে গেল থানায় যাচ্ছি বলে। যাক না। গিয়ে দেখুক! পুলিসেরা যেন তোর বাপের চাকর! তোর কথা শুনে দারোগাসাহেব খামকা আমাদের পিছনে লাগতে গেল আর কি! আমাদের চেয়েও যেন বেশী পুলিস চিনিস! আমাদের আসিস দারোগা দেখাতে! ওরে, দারোগার-বাপ জেলার পুলিস-সাহেব—তার সঙ্গে সুদ্ধ আমরা কারবার করেছি একদিন। মনে আছে না তোর গুজরাতীর-মা?"

"সে কথা কি আমি কোনদিন ভুলি। সে তো করেছিলাম আমি। তুই তো তখন হাজতে।"

অনেককাল আগেকার ঘটনা। সে যুগে ওরা চুরিকে বলত 'রাতের রোজগার'। সন্দেহ করে তালেবরকে থানার হাজতে রেখেছে দারোগাসাহেব। সঙ্গের কানিস্টিবিল-সাহেব গুজরাতীর মাকে ফিস ফিস করে বলল—সাঁঝের পর দারোগাসাহেবের সঙ্গে একা দেখা করিস—সব ঠিক হয়ে যাবে।···

···এ উপদেশ মঘইয়া মেয়েদের দিতে হয় না। এসব তাদের জানা। সাঁঝের সময় চুল বেঁধে দারোগা-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেল থানায়। গিয়ে দেখে ··বিপরীত কাণ্ড! জেলার পুলিশ-সাহেব—লাল টকটকে সাহেব —থানার বারান্দায় চেয়ারে বসে! জিজ্ঞাসা করল—'কেয়া মাংটা?'

—সাহেব আমার মরদকে ছেড়ে দে।···'টুমলোগ বডমাস্ হায়'।···না সাহেব।···সাহেব জিজ্ঞাসা করে, তারা চুরি ছাড়া আর কিছু জানে কিনা। ···তা জানব না কেন। কত জিনিস জানি। কত পাখির ডাক ডাকতে জানি। এমন শিয়ালের ডাক ডাকতে জানি যে দূর থেকে বনের শিয়াল ছুটে আসবে।···তাই নাকি? দেখা এখনি। দেখাতে পারলে তোর মরদকে ছেড়ে দেবো।···শিয়ালের ডাক শুনে সাহেব খুব খুশী। দূর বনের শিয়ালরা এ ডাকে সাড়া দিতে, সাহেব হেসে কুটিপাটি। দারোগাকে হুকুম দিয়ে দিল তালেবরকে হাজত থেকে ছেড়ে দিতে।···চলে আসবার আগে সেলাম করতেই সাহেব আবার হেসে বলল—'টুমলোগ বডমাস্ হায়'···

সে সব কথা গুজরাতীর মায়ের মনে আছে।

"পুলিসরা তো লোক খারাপ না। কত পুলিসকেই তো দেখলাম!"

"প্রথম প্রথম এখানে এসে পুলিস না থাকায় কেমন যেন খালি খালি লাগত, নারে?"

"উখলি, সামাট, হাঁড়ি, ঘটির মত পুলিসগুলোও যেন আমাদের নিজেদের জিনিস হয়ে গিয়েছিল, নারে?"

"আরে সে সব যুগের কথা বাদ দে।"

···সত্যিই। আজকালকার চাষবাসের যুগের মুতফরাক্কা রাতের-রোজগারের সঙ্গে, আগেকার রাতের-রোজগারের জীবনের কোন তুলনা হয়? কিসে, আর কিসে! নিশাচর, রাতের শিকারীদের সঙ্গে তখন তাদের ছিল

আত্মীয়তার সম্বন্ধ। রাতদুপুরে ওয়াক পাখি ডাকে, সেকরা-পেঁচা ঠকঠক করে শব্দ করে, সাপে ব্যাঙ ধরে, সজারু খরগোশে ক্ষেতের আনাজ খায়, জোনাক পোকা জ্বলে নেভে, শিয়ালের দল প্রহর গোনে ; এরা সবাই ছিল মঘইয়াদের আপন জনের মত তখন।…

"বুঝলি গুজরাতীর মা, আজকাল রাতে মাঠে ঘাটে আর যেন দেখতে পাই না আগেকার মত।"

…তখন মঘইয়াদের একাত্মতা ছিল, যারা পথ চলে তাদের সঙ্গে—রামলীলাব দল, ইরাণীর দল, গাইয়ে বাজিয়ে নৌটাঙ্কির দল, আরও কত দলের সঙ্গে।…

"বুঝলি গুজরাতীর মা, আজকাল বাতে খরখর শব্দ হলেই ভাবি সাপ কিংবা বুনো শুযোরের কথা। জানোযার আব পোকামাকড়গুলোও বোধহয় গন্ধতে বুঝে যায়, কোনটা পথচলার লোক, আর কোনটা ঘর-বাঁধা লোক।"

"সে সব গন্ধই যেন পাই না আর। একই হাট, একই ছাপ্পর, একই গাছ—কোন জিনিসের দিকে তাকাতে আর ইচ্ছা করে না আজকাল। তাকাই কিন্তু দেখি না!"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস শোনা গেল।

জমির উপর মোহ এখনও তাদের জন্মায়নি। ক্ষেতের আল নিয়ে মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হয়নি আজও। চাষবাসে তাদের মন বসে না। চাষের কাজ ফেলে অকারণে হাটে ছুটে আসে, কিছু কিনবার না থাকলেও। হরখু পাঁচ-পা-ওলা গোরুটাকে গ্রামে গ্রামে দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে। নিরস্থ মঘইয়া এক পয়সায় দশবার করে হুরবোলার ডাক শোনায়।

…কিছু আর থাকল না আগেকার মত!…

"চল, চলে যাই আমরা এখান থেকে।"

কতদিন তারা একথা ভেবেছে, কিন্তু যত জিনিস মন চায় সব কি করা যায়? প্রবীণরা সাহস পায় না, ইচ্ছা থাকলেও। এখানে এসে তারা অনেক কিছু খুইয়েছে বটে, কিন্তু তার বদলে পেয়েছে খানিকটা নিরাপত্তা।

…গুজরাতীর ছেলের নাড়ী আর অশথতলায় কাটতে হবে না।…

"সে আর আজ হয় নারে গুজরাতীর মা।"

কথার সঙ্কোচকাতর স্বর গুজরাতীর মা ধরতে পারে। মেয়েমানুষের বাজে-কথা বলে, তার প্রস্তাব উড়িয়ে দিচ্ছে না গাঁয়ের মোড়ল। তালেবরের কথা দ্বিধা লজ্জায় ভরা, চুরির কথা দারোগার কাছে কবুল করবার সময়ের মত। বড় জিনিস ফেলে, ছোট জিনিসের পিছনে ছুটবার লজ্জা।...সে জানে যে তার পূর্বপুরুষরা স্বর্গ থেকে তাদের অভিশাপ দিচ্ছেন—রাজা হরিশ্চন্দ্র পর্যন্ত। মরবার পর তাঁদের কাছে গিয়ে এর জবাবদিহি করতে হবে। বাঁধাঘরে থাকা, জমিতে লাঙল দেওয়া সব যে তাদের বারণ। বাপ-ঠাকুরদার মুখে শুনে এসেছে যে তারা আগে ছিল রাজা। একদিন রাজ্যপাটে লাথি মেরে, তাদের পূর্বপুরুষ রাজা হরিশ্চন্দ্র বেছে নিয়েছিলেন পথচলার জীবন। বলেছিলেন আকাশের নীচে আর মাটির উপরের সব জায়গা, আজ থেকে হয়ে গেল আমার এলাকা। তাঁর বলা ছড়াটা আজও তারা গায়। সেই বড় আকাশ ছেড়ে, সে ছোট্ট লবটুলিয়ার, ছোট্ট আকাশ পছন্দ করেছে; পায়ে চলবার পথকে আল দিয়ে ঘিরে চাষের জমি করে নিয়েছে। তার মনের এ হীনতার জন্য সে স্ত্রীর চোখে কত ছোট হয়ে গিয়েছে, সেকথা তার অজানা নয়। তবু—উপায় নাই!...

"কেন? হয় না কেন?"

"সরকারবাহাদুরের হুকুম।"

"ওসব বোঝাস গিয়ে বাচ্চাদের—গুজরাতীদের। যে সরকারবাহাদুর বালিভরা জমি দিয়ে ঠকাতে পারে তার হুকুম হয়ে গেল রাজা হরিশ্চন্দ্রের হুকুমের চেয়েও বড়?"

"হ্যাঁরে আজকাল তাই হয়ে গিয়েছে।"

"পায়ে চলার মাটিতে বেড়া দিয়ে ঘর তুলে দিয়েছে; তারই জন্য তুই সরকারবাহাদুরের দিকে টেনে, মিছে বলছিস! বুকে হাত দিয়ে বল আমার কথা সত্যি কিনা! আমরা যদি এখান থেকে চলে যাই রাতারাতি—অনেক—অনেক দূরে—তাহলে সরকারবাহাদুর কি ধরে ফাঁসি দেবে আমাদের?"

"তা আর হয় না।"

"আমরা যদি গিয়ে বলি—আবার আমাদের উপর আগেকার মত কানিষ্টিবিল মোতায়েন করে দে, আবার সকলের নামে নামে পুলিশের টিকিট করে দে, জমি ফিরিয়ে নে—শুনবে না জেলা-হাকিম?"

"নারে, আর হয় না সে সব।"

তালেবর তাকাতে পারছে না স্ত্রীর মুখের দিকে কুণ্ঠায়। তার ব্যক্ত অব্যক্ত, অভিযোগ অনুযোগগুলো সব সত্যি।......তবু এমনি ভাবে এখানেই থাকতে হবে। ভাবিস না গুজরাতীর মা পুরনো কথা। ভুলে যেতে চেষ্টা কর। যত ভাববি তত মন খারাপ হবে। আমি কি আর বুঝছি না তোর মনের দুঃখ—আমিও যে ভুক্তভোগী। প্রতি সকালে নতুন জায়গার নতুন গন্ধ না পেলে আমারই কি ভাল লাগে? জেলা-হাকিমের কাছ থেকে হাত পেতে নেওয়া, আলঘেরা বালির ঢিবিতে ছাগলনাদি দিয়ে ফসল নেওয়া, এ রোজগার কি আমারই ভাল লাগে? বাপঠাকুরদার মুখে কালি পড়ছে—এতে আমার কি লজ্জা করে না? একে কি রোজগার বলে! এ হচ্ছে থুতু চাটার শামিল। ইজ্জত দিয়ে পেট ভরানো। পরের এঁটো খাওয়া। রোজগার হচ্ছে রাতের রোজগার, গরাদ বেঁকিয়ে, তালা ভেঙে, সিঁধ কেটে রোজগার, নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে মরদের রোজগার। এখনও মাঝে সাঝে যেদিন রাতের-রোজগার হয়ে যায়, সেদিনকার ডাল-রুটিটা যেন মিষ্টি লাগে খেতে, আর অন্য দিনের খাওয়া—সে শুধু পেটের ফুটো বোজানো!...বুঝি রে সব বুঝি! তোর চেয়ে বোধহয় বেশী করেই বুঝি—বয়সে বড় তো।......কিন্তু তুই যা বলছিস সে আর হয় না। ছোট ছেলের মত অবুঝ হোস না তুই গুজরাতীর মা। আমি নিজেই মরমে মরে আছি রে......আমি যে লবটুলিয়া গাঁয়ের মাথা!...

বান্টা ঘরের এ-কোণ ও-কোণ শুঁকতে শুঁকতে মাচার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। তালেবর চেঁচায়—"ভাগ! আর জায়গা পেলি না!"

গুজরাতীর মা কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে—"না না, তা কেন হতে যাবে! ও মাচার উপরে বিছানো পুরনো তাঁবুটার গন্ধ শুঁকছিল বোধ হয়। চাউনি দেখছিস না; মানুষের চেয়েও জন্তুজানোয়ার বোধহয় ভোলে দেরিতে।"

এই শতছিন্ন চটের তাঁবুটা, তাদের পথচলার জীবনের জিনিস। আজ অন্য কাজে লাগানো হয়েছে। এরকম আরও কত জিনিস আছে, যেগুলো তাদের পুরনো কথা মনে পড়ায় অষ্টপ্রহর।

বেলা পড়ে এল। তিনজনের কেউ এখান থেকে নড়েনি তখন থেকে। এরা প্রতীক্ষা করছে পাড়ার লোকদের ফিরে আসবার। প্রথমেই তারা আসবে এইখানে। জিজ্ঞাসা করবে, লেজ গুটিয়ে পালাবার সময় সূচের-হাকিমের মুখখান কেমন হয়েছিল।······

বাণ্টা ডাকতে ডাকতে বাইরে ছুটে গেল। জন্তুজানোয়ারের ডাকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদাভেদও মঘইয়াদের জানা। কে আবার আসছে? ভরসন্ধ্যাবেলা নূতন লোক! সাঁঝের পর হাটুরের দল, বা ভিনগাঁয়ের গোরুর গাড়ি পারতপক্ষে লবটুলিয়ার মধ্যে দিয়ে যায় না। এত ভয় করে লোকে মঘইয়াদের।·····

গলার স্বর শোনা গেল জনকয়েক লোকের।···বেশ সজীব কথাবার্তা।··· ক্রমেই কাছে আসছে।····· "একটু এগিয়ে ত্যাখ তো গুজরাতী।"

এল ঠিক মেলার যাত্রীদের মত দল বেঁধে। টোলার মেয়েরাও আছে। দূর থেকে গুজরাতী চেঁচিয়ে জানাল যে 'সাধুবাবা' আসছেন।

আর একজন, গুজরাতীর ভুল সংশোধন করে বলে—"সাধুবাবা না—অঘোরীবাবা।"

"অঘোরী বাবা!"

মুহূর্তের সংশয় ও দ্বিধা কেটে গেল টোলার লোকদের সঙ্কোচহীন কথাবার্তার ধ্বনি কানে আসায়। তালেবরের চেয়েও জোরে ছুটে এগিয়ে গেল গুজরাতীর মা।

···এই জন্যই সকালবেলা কাকটা ডেকে বলছিল যে আজ এ বাড়িতে অতিথি আসবে। তখন সে কান দেয়নি; ভেবেছিল সূচ ফোঁড়বার হাকিমের আসবার কথাই বুঝি বলছে। তা তো নয়। এ যে দেখি সত্যিকারের অতিথ। অঘোরীবাবা। মঘইয়াদের বাড়িতে সাধু সন্ন্যাসীর আসা এই প্রথম হলে কি হয়, ওরা যে কতকালকার জানা, কত দিনকার চেনা।

ওরাও যে পথচলার দলের লোক মঘইয়াদের মত !···আজকাল ভাবলেও গায়ে আনন্দের শিহর লাগে !···

সঙ্গের লোকেরা বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। সকলেরই কিছু না কিছু বলবার আছে এ সম্বন্ধে। সকলেই এক সঙ্গে কথা বলছে, তাই বুঝতে একটু সময় লাগল।···হাট থেকে ফিরছিল তারা। অঘোরীবাবা গিয়েছিল পাশের গ্রাম ডিহিপুরে আজ রাত্রিতে থাকবার জন্য। সে গ্রামে কলেরা; রোজ লোক মরছে; তার মধ্যে অঘোরীবাবাকে রাখে কি করে? কাছে-পিঠের অন্য সব গ্রামেও কলেরা। তাই তারা অঘোরীবাবাকে লবটুলিয়ায় এগিয়ে দিতে আসছিল। এরই মধ্যে পথে তাদের সঙ্গে দেখা। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। দল পুরু হয়েছে লবটুলিয়ার কাছাকাছি এসে।···

···অন্ধকারে অঘোরীবাবার মুখ দেখা যাচ্ছে না। সাধু-সন্ন্যাসী অতিথি হলে কি রকম ব্যবহার করতে হয় তাও জানা নাই। খাতির দেখাতে হয় দারোগা হাকিমকে; কিন্তু ঘরের অতিথি সন্ন্যাসী যে আপনার লোক।·· জামাকাপড কথাবার্তায় নাই বা থাকল মিল; আসল জায়গাতেই যে মিল রয়েছে। বুনোশুয়োর-ভরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, করায়েৎ সাপে ভরা আলের উপর দিয়ে, একেও যে হাঁটতে হয় দিনের পর দিন। আজ কোথায় আছে কাল কোথায় থাকবে, এরও যে ঠিক থাকে না। রোজ ভোরে নতুন জায়গায় ঘুম থেকে উঠে, এও যে বুঝতে পাবে না কোন দিক দিয়ে সূর্য উঠবে।··

"ও গুজরাতী, আলোটা জ্বাল আগে।"

আলো জ্বালায় এতক্ষণে সন্ন্যাসীর মুখ দেখা গেল। মাথায় জটা। লম্বা-চওড়া জোয়ান। পরনে লাল রঙের আলখাল্লা। আলখাল্লার রঙ দেখেই সকলে একে অঘোরীবাবা বলছে। হাতে সাপের মত আঁকাবাঁকা লাঠি, কালো ভিক্ষাপাত্র, পিঠে ঝোলা।

"দাঁড়িয়ে রইলি কেন অঘোরীবাবা। আয়। এই কাঠের কুঁদোখানার উপর ব'স! হাত-পা ধো! আমি জল ঢেলে দি—তুই পা ধো! খুব আরাম লাগছে, নারে? সারাদিন চলবার পর পায়ে জল দিলে খুব আরাম লাগে

নারে? আর শীতকালে যদি পা ধোয়ার জন্য গরম জল পাওয়া যায়, তা হলে কেমন লাগে দেখেছিস কখনও? দেখিসনি? সে আবার কি? এত ঘি-দুধ-খাওয়া গেরস্তর বাড়ি যাস, তারা কোথাও গরম জল দেয়নি শীতকালে? গেরস্ত-বাড়ির বাঁধা উনুনে জল গরম করতে সময় লাগে নাকি? যত ক্রোশ হেঁটেই আসিস না কেন, গরম জলে পা ধুলে সঙ্গে সঙ্গে শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে—ঠিক মদ খেলে যেমন হয়। কিন্তু সে শুধু শীতকালে। শীতকাল হলে আমিও গরম জল করে দিতাম।…ও কি ছাই ধোয়া হচ্ছে? …এইখানে…এইখানে…এই গোড়ালির কাছের কড়াটার উপর…রগড়ে… এই যেখানে জল ঢালছি…আরে ধেৎ! ‥"

গুজরাতীর মা আর থাকতে পারল না নিজে হাত না দিয়ে।…"কি অঘোরী-গিরি করিস! নিজের পাটা নিজে ধুতে শিখিসনি ভাল করে! এমনি… এমনি করে রগড়ে রগড়ে ধুতে হয়। তা নয়—সুড়সুড়ি দিচ্ছে যেন ফোড়ার উপর। কী ফেটেছে দেখ তো তোর পা! তবু তো এখন শীতকাল না। এই তো সবে বর্ষার আরম্ভ। বর্ষাকালে তোর পাঁকুই হয়? হয় আবার না! কাকে বোঝাচ্ছিস? জলকাদায় হাঁটলে আবার পাঁকুই হয় না?"…

অঘোরীবাবার গোড়ালির কড়াটার উপর, আর পায়ের নীচের ফাটা খরখরে চামড়ার উপর হাত দিতে বেশ লাগছে গুজরাতীর মায়ের।…আবছা মনে পড়ে…স্বপ্নের মত লাগে।…

যত মেয়েপুরুষ এখানে দাঁড়িয়ে কারও অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না গুজরাতীর মায়ের আচরণ। সকলেই অনুভব করছে পথের পথিক অঘোরীবাবার সঙ্গে একাত্মতা।…এ শুধু অতিথিকে খাতির দেখানো নয়। এ হচ্ছে মঘইয়াদের পূর্বপুরুষদের প্রতি সম্মান দেখানো, নিজেদের পূর্বজীবনের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া।

এত স্বতঃস্ফূর্ত গুজরাতীর মায়ের আচরণ, এত সহজভাবে সে বলছে কথাগুলো, যে কারও চোখে অস্বাভাবিক ঠেকছে না সেগুলো। বরঞ্চ তারা খুশী যে, অতিথিসেবার যে সব কাজ তাদের মাথায় খেলেনি, গুজরাতীর মায়ের সে সব ঠিক খেয়াল আছে দেখে। জানল কি করে

এতসব গুজরাতীর মা। চিরকাল তারা দেখে এসেছে যে সে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলে বটে, সব সময় সব জিনিসে, কিন্তু তার বুদ্ধি খুব।…

সন্ন্যাসীও লোক চরিয়ে খায়; এদের ক্ষুণ্ণ করতে চায় না। যা মন চায় করুক! এর আগে কখনও মঘইয়াদের সংস্পর্শে আসেনি—আজ এসেছে বাধ্য হয়ে। এদের আদর-আপ্যায়নের রীতি-নীতি জানে না। তবে এরা সাধু সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে না দেখে, এদের ধাঁচধরনের একটা আন্দাজ করে নিয়েছে। সন্ন্যাসীসুলভ উপদেশ আর গাম্ভীর্য যে এ পরিবেশে অর্থহীন, সে কথা বুঝতে তার একটুও দেরি হয় নি।

"এই কাঠখানার উপর পা রাখ অঘোরীবাবা। গুজরাতী তোর বাপের খড়ম জোড়া আন না, এও কি বলে দিতে হবে। দেখিস অঘোরীবাবা, বাঁ পায়ের খড়মের বোলেটা নড়বড় করছে, সাবধানে হাঁটবি। আয়!"

…অঘোরীবাবার সব কাজ গুজরাতীর মা নিজে করবে। পাড়ার মেয়েদের কাউকে কিছু করতে দেবে না। হাকিমের কাছ থেকে পাওয়া নিজের কম্বলখান মাচার উপর পাতবার জন্য আনতেই সন্ন্যাসী বাধা দিল—"না না আমার কম্বল আছে।"

নিরস্থর মা সবজান্তা ভাব দেখিয়ে বলে—"অঘোরীবাবারা কি কখনও অন্যর কম্বলে বসে।"

ঝোলা থেকে সন্ন্যাসী কম্বল বার করতেই তার হাত থেকে সেখান ছিনিয়ে নিল গুজরাতীর মা। মাচার উপর কম্বলখানা বিছিয়ে দিতে দিতে বলে—"জেলা-হাকিমের দেওয়া কম্বলে তোদের না বসাই ভাল।"

কথাটার সুর ধরতে না পেরে সন্ন্যাসী অবাক হয়ে তাকাল গুজরাতীর মায়ের দিকে।

"দাঁড়িয়ে রইলি কেন অঘোরীবাবা? মাচায় উঠে বস!"

অতিথিকে সম্মান দেখানোর একটা কথা এতক্ষণে মনে পড়েছে তালে-বরের। কম্বলখানার উপর দুটো চাপড় মেরে সে বলে—"খাতিরের

লোককে বসতে বলবার আগে কম্বলের ধুলো ঝেড়ে দিতে হয়, এটুকুও জানিস না?"

মেয়েপুরুষ সকলের চোখমুখেই ফুটে উঠল মৃদু ভর্ৎসনা—'গুজরাতীর মা-টা যেন কী! এটুকুও শেখেনি! কেবল লম্বা লম্বা কথা!'

স্বামীর কথা তার কানেও গেল না বোধ হয়। গেলেও কোন জবাব দিত না। কি হবে কথা বলে; বুঝবে না ওরা। একি হাকিম দারোগা যে একে খাতির দেখাতে হবে, কম্বলের ধুলো ঝাড়বার মিছে চাপড় মেরে? অঘোরীবাবা হচ্ছে আপন জন; আপন জনের মত একে ভালবেসে আদর করতে হবে। সে সব কি এরা বোঝে!

"তুই কি রকম অঘোরী রে? বাঘের ছাল নেই কেন? আমরা তো আগে জন্তুজানোয়ারের চামড়া পেতে শুতাম; শীতকালে তাঁবুর উপর দিয়ে দিতাম। সেই ছেঁড়া তাঁবুর উপরই তো তোর কম্বলখান পাতা হল এখন।"

অঘোরী একটু লজ্জিত হল।

"আমার জপতপের জন্য জানোয়ারের চামড়ার আসন দরকার হয় না। কম্বল দিয়েই কাজ চালিয়ে নিই।"

অঘোরীর কথায় লাড্ডু মঘইয়ার মনে পড়ে জপতপের কথা।

"গুজরাতীর মা, এত তো কথা বলছিস; অঘোরীবাবার জপতপের কথাটা ভেবেছিস?"

বিজয়ীর দৃষ্টি লাড্ডুর। অঘোরীবাবা তালেবরের বাড়িতে এসে উঠলে কি হয়, সে গ্রামসুদ্ধ লোকের অতিথি। সকলের চেয়ে আগে তারই মনে পড়েছে অঘোরীর জপতপের কথাটা।

...তাই তো, এ এক নূতন সমস্যা! জপতপের ব্যবস্থা জিনিসটা কি রকম তা কারও জানা নাই।

অঘোরীবাবা গোঁড়া নয় মোটেই; সব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

বলে—"জপতপের কোন ব্যবস্থার দরকার নাই। শেষরাত্রে উঠে

আমি জপে বসি। সেই সময়টাই ভাল সবচেয়ে—হই-চই লোকজন একেবারে থাকে না।"

দুশ্চিন্তা কাটল সকলের। বয়স্থ-বয়স্থরা একটু আড়ালে গিয়ে কি সব যেন বলাবলি করে এল। বিনা চেঁচামেচিতে ঠিক হয়ে গেল, তালেবরের ঘরখানা আজ রাত্রের মত সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে অঘোরীবাবাকে। লোকজন থাকলে জপের ব্যাঘাত হয়। তাই তালেবররা আজ অন্য জায়গায় শোবে।

অঘোরীবাবা বসেছে মাচার উপর; লবটুলিয়ার লোকেরা মাটিতে। গাঁজার প্রসাদ পাচ্ছে সকলে। গ্রামের প্রত্যেকে একে একে পৌঁছে গিয়েছে এখানে। যে স্থচ ফুঁড়বার হাকিমটার ভয়ে আজ সকলে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল, তার কথা একবারও কেউ জিজ্ঞাসা করেনি কাউকে। মনে পড়েনি সে কথা এই নূতন অতিথিকে হঠাৎ নিজেদের মধ্যে পাবার উদ্দীপনায়। অঘোরী ভারী সুন্দব গল্প কবতে পারে। কত নূতন নূতন খবর দিচ্ছে পথের ধারের চেনা জায়গাগুলোর। কত রকমের প্রশ্ন করছে তারা। কামালপুর হাটের ইঁদরার পাড এতদিন বাঁধিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়? জালালগড়ের বেনেরা যে জন্তুজানোয়াবদের জল খাওয়ার জন্য চৌবাচ্চা করে দিয়েছিল, সেটা কি পরিষ্কার রাখে, না সেই আগেকার মতই ময়লা? নরকটিয়া নদীর উপরের পুলটা তয়ের হয়ে গিয়েছে? পুলের পাশের হাটের কুষ্ঠরুগীটা এখনও বেঁচে আছে? সেখানে একটা তালগাছের উপর অশথগাছ আছে না? এই কুকুরটার মাটাকে সেই গাছতলায় পোঁতা হয়েছিল।

অঘোরী সাধ্যমত এদের কথার জবাব দিচ্ছে—এদেব মনের মত জবাব। বেফাঁস কিছু মুখ থেকে বেরিয়ে গেলে সামলে নিচ্ছে অনায়াসে। কি মিষ্টি যে লাগে সেই সব পিছনে ফেলে আসা স্বর্গের কথা শুনতে!···আর কোনদিন তারা সেসব দেখতে পাবে না নিজের চোখে!··· খুব ভাল লাগছে অঘোরীবাবার গল্প। এ গল্প যেন তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে না যায়!···সবাই মাচার দিকে আরও ঘেঁষে বসে। সবাই—এক শুধু গুজরাতীর মা বাদে।

সে উঠনে রাঁধছে। অঘোরীর গল্প একটু আধটুকু কানে যাচ্ছে।

নাই বা শোনা গেল সব কথা। তার মন ভরে উঠেছে; পুরনো জীবনটাই তার প্রাণের কাছে এসে গিয়েছে আজ, অঘোরীবাবার মধ্যে দিয়ে। যে জীবন সে প্রতি মুহূর্তে ফিরে পেতে চেয়েছে গত পাঁচ বছর ধরে, সেই জীবনেরই প্রতীক অঘোরীবাবা। নিজে থেকে এসে ধরা দিয়েছে সে জীবন, অপ্রত্যাশিত ভাবে। অঘোরীর ধুলোভরা কম্বলের গন্ধ, ফাটা পায়ের কর্কশ স্পর্শ, সাড়া জাগিয়েছে তার মনের গভীরে—ফিরিয়ে এনে দিয়েছে তার হারিয়ে-যাওয়া জগতের স্বাদ। মনের সমস্ত একাগ্রতা ঢেলে দিয়ে সে রাঁধতে বসেছে, তার অঘোরীবাবার জন্য। নিজে রেঁধে খাওয়াবে তাকে, একথা ভাবতেই মন আনন্দে ভরে ওঠে।··· খুব খিদে পেয়েছে বোধহয় অঘোরীর।···সারাদিন বোধহয় কিছু খাওয়া হয়নি!...শুকিয়ে গিয়েছে মুখখানা! ··

গুঞ্জরাতীর মা উনেনের আঁচ ঠেলে দেয়।

অঘোরীবাবাও গল্পর ফাঁকে ফাঁকে মাচার উপর থেকে উঠনের দিকে তাকাচ্ছে। ধূর্ত কুটিল চাউনি। সে লক্ষ্য করছে স্ত্রীলোকটিব তন্ময়তা। মুখের একদিকে আলো পড়েছে—কালো পাথরে খোদাই-করা মূর্তির মত লাগছে মুখখানাকে এতদূর থেকে। এই রকমই তন্ময়তা নিয়ে স্ত্রীলোকটি তাঁর পা ধুইয়ে দিয়েছিল।···পথের গল্প ওকে শোনাতে পারলে আরও ভাল লাগত।···একবার মেয়েটিও এদিকে মুখ ফেরাল,···চোখাচোখি হল তার সঙ্গে,···স্পষ্ট দেখা যায় না,···তবু মনে হল মেয়েটি মুচকে হেসে বলতে চাইল—এই যে আমার রান্না হয়ে এল, খুব খিদে পেয়েছে বুঝি?···যাযাবর মেয়ে বলেই এই মিষ্টি ব্যঞ্জনা আরও ভালো লাগে অঘোরীর। নূতন নূতন লাগে।

পাড়ার লোকরা চেয়েছিল, অনেক রাত্রি পর্যন্ত অঘোরীবাবার সঙ্গে গল্প করতে, কিন্তু গুঞ্জরাতীর মা তাড়া দিয়ে উঠেছিল।

"ও মানুষ সারারাত জেগে তোদের সঙ্গে গল্প করবে নাকি? সারাদিন পথ চলবার পর সারারাত জাগতে কেমন লাগে তা তোরা জানিস না? এরই মধ্যে ভুলে গেলি নাকি? আবার শেষ রাত্রে উঠে ওর জপতপ আছে।

তারপর ভোরবেলায় তো চলেই যাবে। ওকে ঘুমতে দে এখন! যা! ভাগ! ঘর খালি করে দে! তুই শুয়ে পড় অঘোরীবাবা; আমি আলোটা নিভিয়ে দিই।…"

তখন রাত কত ঠিক জানা নাই। অঘোরীর ঘুম ভাঙল। চমকে উঠেছে। কে! বাড়ির বিড়ালটা নয় তো?…এতক্ষণে বোঝা গেল ব্যাপারটা। ঘুমের ঘোরে একটু দেরি লেগেছে বুঝতে। কে একজন তার পায়ে তেল মালিশ করে দিচ্ছে। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। প্রতিবার হাত নাড়বার সময় একটা খুটখুট শব্দ কানে আসছে।··বোধহয় গালার চুড়ির আওয়াজ! রাতের নিস্তব্ধতায় শব্দটা খুব জোরে জোরে হচ্ছে মনে হয়।…গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। তবে কি!…আঙুলের পরশের সঙ্গে একটা শক্ত জিনিস মাঝে মাঝে তার পায়ে লাগছে। চুড়ি কিংবা কাঁকন না হয়ে যায় না।…অন্য সাধুসন্ন্যাসীর মুখে উত্তরাখণ্ডের কোন কোন স্থানের সাধুসেবার অদ্ভুত রীতির গল্প কখন কখন শুনেছে অঘোরী…মঘইয়াদের মধ্যে সেরকম কোন রীতি নাই তো সাধুসেবার?…না না—তা কেন হতে যাবে!…কি জানি কেন, তার মনে কোন সংশয় নাই যে এ গুজরাতীর মা। পা ধোয়াবার সময় তার চুড়িও এমনি করে গায়ে ঠেকছিল। সেইজন্যই গালার চুড়ির কথাটা তার সব চেয়ে আগে মনে এসেছে।· পায়ের আঙুলের ফাঁকগুলোর মধ্যে বেশ করে আঙুল চালিয়ে তেল দিয়ে দিচ্ছে।·· সব চেয়ে ভয়ের কথা যদি স্ত্রীলোকটি বাড়ির লোকের অজানতে এসে থাকে! সেইটাই বেশী সম্ভব। প্রথম থেকেই স্ত্রীলোকটির হাবভাব ও আচরণ ঠিক অন্য মেয়েদের মত ছিল না।…কিন্তু এতদূর সে কল্পনাও করতে পারেনি। মঘইয়াদের সুনীতি দুর্নীতি সম্বন্ধে মূল্যবোধ অন্যদের সঙ্গে মেলে না, এ খবর অঘোরীর জানা।…কি কুক্ষণেই যে এদের আতিথ্য স্বীকার করেছিল! এখন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে হয় এখান থেকে।·· সত্যিকারের সাধক ভক্ত লোক নয় সে। নানা কারণ মিলিয়ে তার সন্ন্যাসী হওয়া। জীবনে এর আগেও যে বিপদে পড়েনি তা নয়।…কিন্তু এরা যে মঘইয়া!…অঘোরীর নিজের গ্রামেই মঘইয়া চোররা একবার একটা মেয়ের হাত থেকে চুড়ি খুলতে না পেরে, তার একটা হাতসুদ্ধ কেটে

নিয়েছিল—বিনা দ্বিধায়! এত হিংস্র জাত এরা!···তার বুকের স্পন্দনের শব্দ, চুড়ির শব্দকেও ছাপিয়ে উঠেছে।···সারা গা ঘামে ভিজে উঠেছে। অঘোরীর বেশে থাকলে কি হয়, প্রাণের ভয় তার প্রচুর।···স্ত্রীলোকটি অতি সন্তর্পণে মাচা থেকে নামল। চোখের পাতা খুলে অঘোরী দেখতে চেষ্টা করল সেদিকে। কিছু দেখা গেল না অন্ধকারে। শব্দ থেকে অনুমান করা যায় যে মেয়েটি বেড়ার গা হাতড়াচ্ছে। আবার এসে বসল। পাখা করছে, তাহলে পাখা আনতে গিয়েছিল; ঘামতে দেখে ভেবেছে সন্ন্যাসীব গরম লাগছে বুঝি। গালার চুড়ির আওয়াজের সঙ্গে মিলেছে পাখা চালানোর একটা মৃদু শব্দ। চোখ খুলে রাখলে হয়তো অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে কিছু দেখতে পেত; কিন্তু ভয় হয় স্ত্রীলোকটা আবার পাছে বুঝে ফেলে যে সে জেগে আছে। কেন যেন সে অনুভব করছে যে মেয়েটা তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।··· ওকে ঠকানোর জন্য, জেগে জেগে নাক ডাকালে কেমন হয়?···হঠাৎ সরষের তেলের গন্ধ নাকে এল। মনে হল স্ত্রীলোকটি হাতের আঙুল তার নাকের সম্মুখে রেখে কি যেন দেখছে। বোধহয় তার শ্বাসপ্রশ্বাস থেকে বুঝবার চেষ্টা করছে, যে সে জেগে আছে কিনা। মঘইয়া মেয়ে-পুরুষে এসব জিনিস ছোটবেলা থেকে শেখে।···মেয়েটা ঠিক বুঝে গিয়েছে যে সে জেগে।·· বুঝুক গে!···এখন মটকা মেরে পড়ে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।· কলেরার হাত থেকে বাঁচবাব জন্য লবটুলিয়াতে আসা, কিন্তু এখন এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া বুঝি আর কপালে নাই। পুরুষেরা জানতে পারলে বোধহয় এই মুহূর্তে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে পুঁতে ফেলে দেবে!·· ভয়ে গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে। ভাবনা-চিন্তাগুলো গুলিয়ে যাচ্ছে।···এখানে আসাই ভুল হয়েছে!···এরই নাম নিয়তি!···গুরুর নাম স্মরণ করতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে আতঙ্কে।···স্ত্রীলোকটি আর পায়ে তেল মালিশ করছে না। শুধু আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আঙুলের পরশ পায়ের পাতায়—পায়ের তলায়—ফাটা গোড়ালিতে—ফাটা খরখরে জায়গাটুকুর উপর আঙুলের ডগাগুলো একনাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে যেন খেলা করছে—সুড়সুড়ি দেবার মত—শুধু ওই জায়গাটুকুর উপর। আনমনা হয়ে যায়নি তো? কিংবা

হয়তো ওই কর্কশ স্পর্শের অনুভূতিটুকু উপভোগ করছে;···গরম নিঃশ্বাস পায়ের উপর এসে লাগছে—নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ফোঁপানির মত একটা শব্দ—বোধহয় কাঁদছে।···

ঘুমের ভান করে পড়ে থাকাও মিছে। প্রাণ বজায় রাখতে গেলে, আর এক মুহূর্তও এখানে দেরি করা উচিত নয়। একবার পাশ ফিরে আড়মোড়া ভেঙে অঘোরী একটু সময় দিল মেয়েমানুষটাকে। সে কিন্তু নড়ল না। পায়ের দিকে বসে রয়েছে। কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। অঘোরী বিছানা ছেড়ে ওঠে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে লাঠি, ঝোলা, ভিক্ষাপাত্র নেয়। ঘরের ঝাঁপ ঠেলে বার হবার সময় প্রাণ কেঁপে ওঠে—যদি কেউ বাইরে ওত পেতে বসে থাকে!···যাক রক্ষা! কাছাকাছি কেউ নাই! গুরুদেব বাঁচিয়েছেন!···

বাইরের খোলা বাতাসে এসে এতক্ষণকার মানসিক উত্তেজনা একটু কমে। তেল দিয়ে ঘষা গরম পায়ের তলায় ঠাণ্ডা শিশির-ভেজা ঘাস—বেশ যেন একটু অন্যরকম অন্যরকম লাগে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বোঝে যে রাত্রি শেষ হতে বেশী দেরি নাই। অঘোরী পা চালিয়ে চলতে আরম্ভ করে।

বেশ কিছু দূর এসেছে। হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দে বুক কেঁপে উঠল।··· ছুটতে ছুটতে আসছে একজন।···কে?

চাপা গলায় জবাব এল, "আমি গুজরাতীর মা। জঙ্গলের পথ দিয়ে এলাম।"

অঘোরী ঠিকই আন্দাজ করেছিল।

"কেন?"

"আমি তোর সঙ্গে যাব।"

"আমার সঙ্গে!"

"হ্যাঁ।"

"পাগল নাকি তুই!"

"না আমায় সঙ্গে নিয়ে চল। অনেকক্ষণ ধরে তোর ঘুম থেকে উঠবার প্রতীক্ষা করছিলাম। আমার ভয় যে পাছে, উঠেই জপে বসিস। পুজো

করতে করতে সকাল হয়ে গেলে, আমার আর যাওয়া হয় না। ঘুম থেকে উঠে তুই জপে বসলি না দেখে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।...... আ মর! ছাখ কাণ্ড কুকুরটার! তুই আবার এলি কেন? ছিলি না তো ওখানে। যা ভাগ! বুঝলি অঘোরীবাবা, আজ পুরনো ঘাগরা আর চেলিটা পরে এসেছি কিনা, তারই গন্ধে গন্ধে এসেছে। মনে আছে ওর সব। ভাবছে যে আগেকার ঘুরে বেড়ানোর জীবন ওর আবার আরম্ভ হল বুঝি।"

এতক্ষণে অঘোরী ঠাহর করে দেখল যে গুজরাতীর মা শাড়ি ছেড়ে ঘাগরা পরেছে, মঘইয়া মেয়েদের মত। হাতে একটা পুঁটলি।

"বাড়ি যা।"

"ঘর ছেড়ে এলাম, আবার যাব কেন?"

ঘাগরা পরে বাড়ির বার হতেই গুজরাতীর মা, তার অনেককাল আগেকার মন ফিরে পেয়েছে। মনের ভার কেটে গিয়েছে। নিজেকে খুব হালকা হালকা লাগছে। ছুটে যেতে পারে সে এখান থেকে ওখানে, দশ পনর বছর আগে যেমন পারত, একটা বেটাছেলেকে চিমটি কেটে পালাতে পারে; ইঁদারার পাড়ের উপর উঠে এক পায়ে হাঁটতে পারে; নিজেদের দুষ্টু ভেড়াটার শিঙ ধরে কুস্তি লড়তে পারে; জন্তুজানোয়ারের ডাক ডেকে অন্যমনস্ক পথচারীকে হঠাৎ ভয় পাইয়ে দিতে পারে, তারপর হেসে মাটিতে লুটোপুটি খেতে পারে। এতদিন জেলা-হাকিমের দেওয়া শাড়ি তার দেহ-মনকে একেবারে আড়ষ্ট করে রেখেছিল। আজ পথের হাওয়া লেগেছে তাতে। পায়ের নীচের মাটিটা আজ অন্যরকম হয়ে গিয়েছে হঠাৎ। এর সঙ্গে কতকালের আত্মীয়তার সম্বন্ধ! আল দিয়ে ঘেরা ক্ষেতের মাটি, বেড়া দিয়ে ঘেরা উঠনের মাটি নিজের জিনিস হলেও, আপন হয় না কোনদিন! সে সব জমি নিজের পাঁকের মধ্যে লোককে টানে। সেই মন-ছোট-করা ক্ষেতের আলগুলো, এখন হঠাৎ আবার পায়ে চলবার পথ হয়ে গিয়েছে। একটা সরু আলের উপর দিয়ে তারা চলেছে। সাপের ভয়ে লাঠি ঠক ঠক করতে করতে অঘোরী চলেছে আস্তে আস্তে—নইলে অন্ধকারে পা পিছলে পড়ে যাবার ভয় আছে। এত আস্তে চলার ধৈর্য আজ নাই গুজরাতীর

মায়ের। হাওয়া বাতাসের এমন গন্ধ সে অনেককাল পায়নি। ক্ষেতে নেমে, সন্ন্যাসীকে পাশ কাটিয়ে, সে আবার গিয়ে উঠল আলের উপর। সাপখোপের ভয় নাই। স্বামী, পুত্র, চেনা লোকজনের জন্য চোখের জল পড়েছে বটে, কিন্তু মনে একটুও দ্বিধা নাই।..যারা লাঙল দিয়ে মাটির বুক ফাঁড়ে, তারা বুঝবে না।...পায়ের নীচের সব-মাটি পথ হয়ে-যাওয়ার আনন্দের সে যে কি স্বাদ, তা জানে শুধু এই অঘোরীবাবা!......

এতক্ষণে তারা আল থেকে নেমে গ্রামের বাইরের খোলা মাঠে পড়ল। এইখানে অঘোরী দাঁড়ায়। লাভ-লোকসান খতিয়ে, এতক্ষণ ভেবে সে ঠিক করে নিয়েছে, কি করা উচিত এ ক্ষেত্রে; এই খেয়ালী মেয়েটার সঙ্গে কি ভাবে কথা বলা উচিত।

"দাঁড়া এখানে! আমার কথা শোন, তুই বাড়ি ফিরে যা! পাগলামি করিস না।"

"পাগলামি কি বলছিস, অঘোরী বাবা?"

"পাগলামি বলব না তো কি! নিজের ঘরদুয়োর ছেড়ে এমনি করে চলে যায় নাকি লোকে?"

"ও আমার কপাল! আমি ভাবছি যে তুই বুঝি আমার দুঃখের কথা বুঝেছিস! কি রকম অঘোরী রে তুই? ওই ঘর-দুয়োরের ভয়েই যে আমি চলে যেতে চাই।"

রাগে, দুঃখে তার গলার স্বর ভারি হয়ে উঠেছে।

"তোর মনের দুঃখের কথা আমি কি করে জানব। বলে বুঝিয়ে দিবি, তবে তো বুঝব।"

গুজরাতীর মা কাঁদতে কাঁদতে বলে,—"তুইও যদি আমার ব্যথা না বুঝিস তবে কে বুঝবে!......এক ইঁদারার জল আমি আর রোজ রোজ খেতে পারছি না। একই অশথ গাছের উপর দিয়ে রোজ সূর্য উঠতে আর আমি দেখতে পারি না। নতুন জায়গায় প্রত্যহ শোবার আগে অবাক হতে চাই, প্রত্যহ ঘুম ভেঙে অবাক হতে চাই।...মাটির হাঁড়ি দেখলে আমার গায়ে জ্বলুনি ধরে। এক উনুনে রোজ রাঁধতে আমার কান্না পায়।...রাতে ঘুম ভেঙে

বকের-বাসায়-ভরা অশথগাছের গন্ধ আমি কতকাল পাইনি। এখানে কাল-কি-হবে বড্ডো জানা।...এ আমি সহ্য করতে পারছি না অঘোরীবাবা।... বাবরী চুল কেটে ফেলেছে এরা সকলে।"

প্রত্যেকটা কথার মধ্যে সারা জীবনের ঠাসবুননি। কিন্তু অঘোরীর কানে লাগে অসংলগ্ন, কথাগুলো। মানে ঠিক বোঝা যায় না। মনগড়া একটা মানে করে নিয়ে সে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

"তোর ছেলে রয়েছে, স্বামী রয়েছে।"..

"সে কি তুই বলে বোঝাবি? তাদের কথা মনে করেই তো কলজের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে। সারারাত চোখে জল এসেছে তাদের জন্য। গুজ-রাতীটা দেখতে চেয়েছিল, এই ঘাগরাটা পরে আমায় কেমন দেখায়। আমি যেখানেই থাকি সে কথা কি কোন দিনও ভুলতে পারব! কিন্তু কী করি। এখানে যে দম বন্ধ হয়ে আসে।"

"আমি সন্ন্যাসী মানুষ, তোকে নিয়ে যাব কি করে?"

"কেন তাতে কি হয়েছে! আমাব ঘাগরা আর চোলির রং তোর আলখাল্লাটার মত নয় বলে ভাবছিস? সে আমি ঠিক মিলিয়ে রং করে নেব।"

"না না, সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গে মেয়েমানুষ রাখতে নাই।"

"এ তুই কি বলছিস অঘোরীবাবা! কত মিয়া-বিবি সাধু দেখেছি।"

"না না। সে হয় না।"

"তুইও বলিস—সে হয় না? গুজরাতীর বাপও বলে সে হয় না। সবাই বলে—সে হয় না। সে হয় না, ছাড়া কি আর কোন কথা নেই পৃথিবীতে? একা যেতে কি আমি ভয় পাই? তা নয়। একা পথ চলা যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের বারণ। তাই জন্যই না তোর এত খোশামোদ করছি অঘোরীবাবা।"

"সে হয় না রে, সে হয় না।"

"কোন উপায় নেই?"

"না।"

"তাহলে, আমি কি করি?"

এ প্রশ্ন অঘোরীকে নয়, নিজেকে। গভীর হতাশায় ভরা। অন্তর নিংড়ে বেরিয়ে এসেছে কথাগুলো। আবার কি তাহলে তাকে, এতটুকু আকাশের নীচে, চোখ-পচানো অশথগাছটার সম্মুখে বসে গোবর-সোনা হাকিমের বক্তৃতা শুনতে হবে? মরবার দিন পর্যন্ত ঢিবি করে ছাগলের নাদি পচাতে হবে?......

সে অঘোরীর পায়ের উপর মাথা কোটে।

"অঘোরী বলে কি এতটুকুও মায়া-দয়া থাকতে নেই। না করিস না অঘোরীবাবা! তোর কোন অসুবিধা আমি করব না। নিয়ে চল আমাকে এখান থেকে!"

কি কাতর মিনতি! এমন অন্তর দিয়ে নিজের আত্মার মুক্তি, কোন সাধু সন্ন্যাসীও বুঝি কোনদিন চাননি!...এ অনুরোধ রাখতে না পারার জন্য অস্বস্তি লাগে অঘোরীর। ইচ্ছা হয়; কিন্তু সাহসে কুলয় না।...কুকুরটা গ-র-র-র করে একটা অপছন্দ ও বিরক্তির আওয়াজ বার করল গলা থেকে। অঘোরী জোর করে পা ছাড়িয়ে নিল। আর দেরি করা যায় না—শুকতারা দেখা যাচ্ছে পুব আকাশে।...গাঁয়ের কে না কে আবার কোথা থেকে দেখে ফেলে হইচই বাধাবে!...

"চলে যাচ্ছিস অঘোরীবাবা? আচ্ছা আর এক দণ্ড দাঁড়া! ঘরে থাকলেও তো এতক্ষণ জপই করতিস। পথ চলবার তো সারাদিন সময় পাবি। তোর সড়ক কি আমি কেড়ে নিতে যাচ্ছি? একটুখানি না হয় আমার অনুরোধে দাঁড়ালি!"

"না না, ভোর হয়ে এল যে।"

সে অধৈর্য হয়ে পড়েছে। গুজরাতীর মা এগিয়ে এল তার কাছে।

"একটু সবুর কর। এইটা নিয়ে যা।"

"কি আছে পুঁটলির মধ্যে?"

"একটা ধুনুচি। আর এক সাধুবাবার দেওয়া। ওটা কাছে থাকলে পথ চলার সময় মঙ্গল হয়; বাঁধা ঘরে মন টেকে না। এতে করে ধুনো

গলিয়ে, পাঁকুই হলে পর লাগিয়ে দিস—একদিনে সেরে যাবে। এটা আমার আর কোন কাজে লাগবে না। তুই রাখিস কাছে।"

চলে যাবার সময় অঘোরী স্ত্রীলোকটিকে ক্ষুণ্ণ করতে চায় না।

"আবার কোন দিন দেখা হতেও পারে।"

পুঁটলিটাকে নিজের ঝোলার মধ্যে পুরে নিয়ে পথের দিকে পা বাড়াল সে।

এখনও অঘোরী দূরে চলে যায়নি। মিষ্টি খাওয়ার পরও কিছুক্ষণ তার স্বাদ লেগে থাকে মুখে। কিছুক্ষণের জন্য যে মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল তার রেশ এখনও মুছে যায়নি মন থেকে একেবারে। সম্পূর্ণ মিলিয়ে-যাওয়া পর্যন্ত সময়টুকু সে নিজের মত করে নিবিড় ভাবে উপভোগ করতে চায়। বহুকাল শিয়ালের ডাক ডাকা হয়নি, সেই যবে থেকে বাতের রোজগার বন্ধ হয়েছে মঘইয়াদের। আজকের পাওয়া পথচলার-জীবনের ক্ষণিক স্বাদ সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবার আগে, তার ইচ্ছা হল একবার আগেকার মত করে শিয়ালের ডাক ডাকতে। ঘাগবাটা আবার মাটির হাঁড়িতে তুলে রাখবার আগে, বড় আকাশের নীচে, এই ডাকের মধ্যে দিয়ে সে পথচলার জীবনের শেষ অন্তরঙ্গ পরশ চায়।

ঘাগরাপরা মেয়েটির একদিকে মাঠের মধ্যে দিয়ে পায়েচলার পথের অস্পষ্ট সাদাটে আঁকাবাঁকা রেখা, আর একদিকে আল-দেওয়া ক্ষেত, নিস্তব্ধ গ্রাম। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে শিয়ালের ডাকের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল দূর দূরান্তরে। বান্টার কান, লেজ খাড়া হয়ে উঠল। অঘোরী থমকে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকাল। দেখে গুজরাতীর মায়ের মনে নতুন আশার ঝলক লাগে।

নানাদিক থেকে শিয়ালের ডাক শোনা গেল। বনের শিয়ালের ডাক। তারা ভুল করেছে। ঠকেছে। এর পর শোনা গেল গ্রামের দিক থেকে শিয়ালের ডাক। লবটুলিয়ার লোকে ভুল করেনি। তারা সাড়া দিচ্ছে গুজরাতীর মায়ের ডাকের। নকল শিয়ালের ডাকের মধ্যে দিয়ে তারা জানাচ্ছে—আসছি আসছি, এই এলাম। তারপর গাঁয়ের দিক থেকে হইচই শোনা গেল।

অঘোরী বোধ হয় ভাবে যে তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য মেয়েমানুষটা গ্রামের লোক ডাকছে। সে প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করে। গুজরাতীর মা আবার মুষড়ে পড়ে।…না, ফিরে এল না অঘোরীবাবা! পথ চলার যুগে শিয়ালের ডাকে কাজ হয়েছিল লাল টকটকে সাহেবের কাছে; কিন্তু নেংটিপরা অঘোরীর আজ মন গলল না সে ডাকে। পথচলার যুগ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে, শিয়ালের ডাকের ধকও ফুরিয়ে গিয়েছে!…ভয় পেয়েছে অঘোরীবাবা।…আরে ছুটিস কেন? একেবারে ছোট্ট ছেলের মত! কিছু বোঝে না। আরে ওরা কি তোকে ধরতে আসছে? ওরা আসছে সাধুবাবার দর্শন পেতে, বিদায়ের আগে। বোকা কোথাকার! মায়া লাগে।

পশ্চিমের দিগ্বলয়-ছোঁয়া মাঠের আঁকাবাঁকা পথে, অঘোরীবাবার আকৃতি ক্রমে ছোট হয়ে আসছে। দূরে চলে যাচ্ছে। অস্পষ্ট হযে মিলিয়ে গেল।

আল-দেওয়া-ক্ষেতে ভরা গ্রামের দিককার মানুষগুলো কাছে এগিয়ে আসছে। ক্রমে বড় হয়ে উঠছে। কথা শোনা যাচ্ছে। এই এসে পড়ল বলে!

যাক অঘোরীবাবাব শেষ দর্শন সে একাই পেয়েছে—লবটুলিয়াব অন্য কোন লোক না!

আবেশ হঠাৎ কেটে গেল। একটা ঝাঁকানি খেয়ে মন ফিরে এল বেড়া-দিয়ে-ঘেরা উঠনের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতায়। খেয়াল হল পরনেব ঘাগরাটার কথা। এর কি জবাব দেবে স্বামী-পুত্রের কাছে?

বলবে—"কাল যে বাপবেটায় দেখতে চেয়েছিলি ঘাঘরা পরলে আমায় কেমন লাগে, তাই রাত থাকতে পরেছিলাম, তোদের অবাক করে দেবার জন্য।"

নিজের উছল মুহূর্তের বিবরণ গুজরাতীর মা যেমন বলতে পেরেছে, তেমন আর কেউ পারেনি। ও কিন্তু ভয় ভয় কথাটা একবারও ব্যবহার করেনি। ভয় ভয় ভাব আবেশ কাটবার মুহূর্তে তার হয়েছিল নিশ্চয়ই; কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করতেই উত্তর দিল অদ্ভুত।

..."তখন মনে হল যেন আমি খরচ হয়ে গেলাম—ছেলে হবার পর এক রকম হয় না—পেটের মধ্যেটা খালি খালি—সেই রকম যেন খালি খালি হয়ে গিয়েছি আমি তখন—না তোকে বোঝাতে পারব না।"...

অদ্ভুত উপমা। মেয়েমানুষে এক যদি বুঝতে পারে! আমি পারিনি!

লবটুলিয়া থেকে সেই দিনই রওনা হয়েছিলাম। আসবার সময় মুনিয়ার মা কেঁদে কেটে অনুরোধ করেছিল, তার মেয়েকে বলে দিতে সে যেন আর অঘোরীবাবাকে টাকা-পয়সা না দেয়।

বাড়িতে এসে সুটকেস খুলে মনে পড়ল মুনিয়ার দেওয়া ন্যাকড়া-জড়ানো পুলিন্দাটার কথা। সে বলেছিল ধুনুচিটাকে বাকিয়া-ভবানীপুরে অঘোরী-বাবাকে দিয়ে দিতে।· একেবারে ভুলে গিয়েছি!...যা পত্রপাঠ বিদায় করেছিল আমাকে অঘোরী সেখান থাকে!...রেণু চলে গিয়েছে স্বামীর কাছে। সেখানে থাকলে পর এটাকে নিয়ে বেশ খানিকটা হাসিঠাট্টা জমত এখন।

*　　　*　　　*

রঘুয়ার জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারগুলোর জন্য আমাকে বেশ কিছুকাল বাড়িতে থেকে যেতে হয়। ভাল লাগত না। সময় কাটাতাম বই পড়ে। মনোবিজ্ঞান ও আচরণবাদের উপর আধুনিক বইগুলো পড়বার দিকেই ঝোঁক গিয়েছিল বেশী। তারপর রঘুয়ার ব্যাপারটা মিটলে, আমি আবার বেরিয়ে পড়ি। দেশে কত দেখবার জায়গা। কোন প্রোগ্রাম না করে, অনির্দিষ্টভাবে বহু জায়গায় ঘুরেছি। নিত্য-নূতন পরিবেশ বেশ লাগত। ধর্মশালায় থাকা, নিজে রেঁধে খাওয়া—এসবে মোটেই অসুবিধা বোধ হত না।

এই সময় একবার শোনপুরের মেলায় আমার হঠাৎ দেখা দাড়িওলা-মহাত্মার সঙ্গে। হাতে ঘটি। আমায় দেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল—ঘটিহাতেই। ছাপড়ায় যাদের ওখানে কাজ করে তারা দোকান দিয়েছে মেলায়। বেশ ভালই আছে। মালিকরা লোক ভাল। আমাকে তাঁদের তাঁবুতে দিনকয়েক থাকতে হয়েছিল প্রচুর আদর আপ্যায়নের মধ্যে। দাড়িওলা-মহাত্মার সঙ্গে দেখাটা বছর দুই তিন আগে হলে, রঘুর জমির ব্যাপার নিয়ে বিশেষ ঝামেলা পোহাতে হত না তখন। যাক, সে সব তো মিটেই গিয়েছে অনেক দিন আগে।

সদানন্দ দাড়িওলা-মহাত্মা। সব কথারই হেসে জবাব দেয় হালকা সুরে।

"দাড়িওলা-মহাত্মা, এমন ভাবে আমাদের ওখান ছেড়ে দিয়ে চলে এলে?"

"যার যেখানে ভাত লেখা আছে!··দাদা, আমার কথা বাদ দেন; আপনার তো সেখানে বাড়ি-ঘর-দোর সব রয়েছে। তা সত্ত্বেও সেখানে থাকেন কত!"···

কথাটা ছ্যাঁক করে মনে লাগল। আমার ঘরবাড়ি ছেড়ে ঘুরে বেড়ানোর কথাটা।

আসছি সে কথায়। আগে দাড়িওলা-মহাত্মার আমাদের ওখান থেকে চলে আসবার বৃত্তান্তটা বলে নিই।

ওয়াক পাখি ডাকে—ওয়াক্! ওয়াক্!

কেউ শোনে, কেউ শোনে না। যারা শোনে তাদের মধ্যে কেউ বলে—"ঠিক যেন আঁতুর ঘরে ছেলে কাঁদছে—নারে?" আবার কেউ বা বলে—"ঠিক যেন বমির ওয়াক তুলছে—নারে?"

বুড়ো নিরাপদবাবুর মত কাজের লোকদের এ ডাক কানেও যায় না। পাখির ডাক শোনা তাঁর কর্তব্যের ফিরিস্তির মধ্যে পড়ে না যে।

বারোয়ারিতলার তেঁতুল গাছে ওয়াক পাখির ডাকের কিন্তু বিরাম নাই। কেউ শুনুক, আর না-ই শুনুক, দাড়িওলা-মহাত্মা তো শুনবেই। মালিকের দোকানে তেল নুন ওজন করবার সময়েও, সে কান খাড়া করে থাকে শোনবার জন্য। মিষ্টি মিষ্টি ভিজে ভিজে লাগে। কষ আমলকী খাওয়ার পর মুখ একরকম মিষ্টি মিষ্টি বস রস হয়ে ওঠে না? সেই রকম। রসেভরা ভরাট গলা—যেন মুখে মিঠে গিলি দিয়ে কথা বলছে।

তার মধ্যে আবার একটু কাঁপুনি মেশানো; ছেলেপিলেদের হুইসেল বাঁশির মধ্যে ছিপির টুকরো থাকলে, আওয়াজটা যে রকম কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ে সেই রকম। রাতের বেলায় বিছানায় শুয়ে এ-ডাক কানে এলে, আজও উদাস মনটা কেঁদে কেঁদে ওঠে—ঘুম আসতে চায় না কিছুতেই।...

মাথায় ছোট ঝুঁটি, পাঁশুটে রঙের ডানা, নীলাভ সবুজ পা আর ঠোঁট, বকের মত দেহের গড়ন—ওয়াক পাখিগুলোর। অনেকে এর মাংস খায়। বছর বিশেক আগে বারোয়ারি তলায়, এই পাখি মারা নিয়ে হল এক কাণ্ড। সরকারী কাছারির নতুন বাড়ি তয়েরের জন্য, বাইরে থেকে যে কন্ট্রাক্টররা এসেছিল তাদের কুলি খাটানোর কাজ দেখত, গেরুয়াপরা একটি লোক। ওয়াক পাখির বাসায়-ভরা তেঁতুল গাছটার নীচে লোকটি পড়ে রইল তিনদিন না খেয়ে দেয়ে; বারোয়ারি-তলায় বন্দুক দিয়ে পাখি মারলে, সে না খেয়ে প্রাণত্যাগ করবে ওইখানেই। এ নিয়ে মহা হইচই। বারোয়ারি কমিটির মিটিং পর্যন্ত হল। সেই

থেকে শুধু যে ওয়াকপাখি মারা বন্ধ হল তা নয়, লোকটির নাম হয়ে গেল দাড়িওলামহাত্মাজী। এত বড় নাম ধরে ডাকা যায় না সব সময়, প্রবীণ প্রবীণারা তাই ডাকেন মহাত্মা বলে; আর অন্য সবাই ডাকে দাড়িওলাদা বলে।

দুর্নাম নিয়ে কণ্ট্রাক্টরকে এখান থেকে চলে যেতে হয়। কাঠের ফ্রেম খুলতেই নতুন জমানো সিমেণ্ট-কংক্রিটের ছাত ধসে পড়ে, দুজন লোকও মারা যায়। দাড়িওলামহাত্মা সেই সময় থেকে এখানেই রয়ে গিয়েছে। পাখির-ডাক আঁকড়ে পড়ে রয়েছে।

ওয়াকপাখি ডাকে। দাড়িওলামহাত্মা মনে মনে জাল বোনে। আর জাল বোনে গুটিপোকারা সমাজসেবী নিরাপদবাবুর রেশমঘরে। নিজের দেহটাকে উলটে পালটে ঘুরপাক খাইয়ে খাইয়ে মুখের লালা দিয়ে মিহি রেশমের জাল বোনে। বুড়ো নিরাপদবাবু সেগুলোকে গরম জলে সিদ্ধ করেন, পাছে আবার গুটি কেটে প্রজাপতি হয়ে বেরিয়ে না যায়। লোকদের দৃষ্টান্ত দিয়ে শেখানোর জন্য তিনি বহু জিনিস করেছেন সারা জীবন ধরে। এখন গুটিপোকার চাষ নিয়ে মেতে আছেন।

হালখাতার দিন সন্ধ্যায় গুটিপোকা সিদ্ধ করতে করতে তাঁর দেরি হয়ে গিয়েছিল। মালিক দোকানে তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের মত বড় লোকদের কৃপাতেই দোকান চলে; শুধু বড়লোক নয় মহৎ পরোপকারী লোক। সব সম্ভ্রান্ত খদ্দেররা এর আগে দোকানে পায়ের ধুলো দিয়ে গিয়েছেন—এক শুধু তিনিই বাকি।

এই যে তাঁর গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থামতেই ক্যাশবাক্সের পাশে রাখা ধুনুচিটাতে এক খাবলা ধুনো দিয়ে দিল রঘুয়া। ভাল খদ্দের যে।

দাড়িওলাদার অনুরোধে ছোকরা রঘুয়া আজ এখানে ফাইফরমাশ খাটবার জন্য রয়েছে।

মালিকের কাছে বেশ মোটা টাকা জমা দিতে দিতে তিনি বললেন, "তুমি হচ্ছ ক্যাশবাক্সের চার্জে, মহাত্মা মিষ্টির চার্জে, আর ধুনুচি-ইন-চার্জ হচ্ছে রঘুয়া। কি বলিসরে রঘুয়া?"

রঘুয়ার কাছে কোন কথা পড়তে পায় না। সে বলে—"ধুনো দিলে বেশ পুজো পুজো লাগে, তাই না?"

"হ্যাঁ, এ ধুনুচিটাও বেশ নতুন ধরনের দেখছি।"...

এর থেকেই এল পিতল-কাঁসার কারিগরদের গল্প। আজকাল নাকি তারা খেতে পাচ্ছে না। দরকার ঘরে বসে করবার মত কাজ দেবার। সারা দেশে এই সব ব্যবস্থা না থাকাতেই আজ এই দুর্দশা। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি গুটিপোকার চাষের কাজে হাত দিয়েছেন।...যে কোন গল্পর মধ্যে গুটিপোকার প্রসঙ্গ নিরাপদবাবু টেনে আনবেনই আনবেন।

বেশ কিছুক্ষণ গুটিপোকার গল্প করে, তিনি লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে আবার গিয়ে উঠলেন গাড়িতে। সময় নাই তাঁর মোটে; বহু জায়গায় তাঁকে কর্তব্য সারতে যেতে হবে।

তিনিও গেলেন, মালিকও উঠলেন বাড়ি যাবার জন্য।

"মহাত্মা, তুমি তাহলে ঘণ্টাখানেক পরে দোকান বন্ধ করে এস। লুচি মিষ্টি অনেক বেঁচে গেল দেখছি।"

জবাব দিল রঘুয়া।

"না ওগুলো বাঁচবে না: খরচ হবে। দাড়িওলাদার চেলা শাগরেদের দল এখনও যে বাকি।"

মালিক হেসে চলে গেলেন। দল বোধহয় কাছেই কোথাও অপেক্ষা করছিল। দাড়িওলা-মহাত্মাজীর জয়ধ্বনি দিতে দিতে তারা এসে হাজির হল দোকানে। বয়সনির্বিশেষে সব ছেলেই দাড়িওলাদার বন্ধু। স্কুলের ছেলেরা, তার কাছ থেকে সিগারেট কেনে, তার ঠিকানায় কলকাতা থেকে নভেল আনায়। আর একটু বেশী বয়সের যুবকরা দাড়িওলাদার মাইনের অর্ধেক জেরে করে নিয়ে নেয় ক্লাবের জন্য। এরা সেই বড়দের দল।

"বুড়ো কি বলল দাড়িওলাদা?"

"অত বড় একজন লোক। তাঁকে 'বললেন' বলতে পার না?"

"বৃদ্ধ কি বলিলেন? রেশম কীটের কাহিনী নয় কি?"

হাসির শব্দে দাড়িওলাদার জবাবটা শোনা গেল না।

"ভো ভো শ্মশ্রুল অগ্রজ ! আপনার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করুন।"

"আমি বলছিলাম যে একজন বিরাশি বছরের বুড়ো ভদ্দরলোক যদি তোমায় দুটো বাজে উপদেশই দেন, তা শুনলে কি তোমার গায়ে ফোস্‌কা পড়ে যাবে ?"

"আচ্ছা দাড়িওয়ালাদা, তুমি সব সময় ওই বুডোর দিকে টেনে কথা বলো কেন বল তো ?"

লুচি মিষ্টি পরিবেশন করতে করতে সে জবাব দেয়—"কারও দিকে টেনে কথা বলি না। পাডার লোকের জন্য ভদ্দরলোক কী না করেন। যার যখন যে দরকার, সবাই ছোটে নিরাপদবাবুর কাছে। কোনদিন না বলতে শুনেছ ভদ্দরলোককে ? লোকের বিপদে আপদে সব সময়......"

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল সে। নিজেকে সংযত করে নিয়েছে। সকলের চোখমুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল একবার। সব সময় সতর্ক হয়ে থাকে ; তবু কেন সে বলে ফেলল একথা। বিপদ আপদের কথাটা তোলা ঠিক হয়নি। কথার মোড ঘোরাবার জন্য জিজ্ঞাসা করে—"তোমাকে দুখান লুচি দিই ? আরে লজ্জা কি। নাও নাও। তুমিই বা বাদ থাক কেন ? এস। ওরে রঘুয়া পুঁটেবাবুকে জল দে একগ্লাস !"

কিন্তু সামলানো গেল না।

"বুদ্ধেব ওই যে বিপদে-আপদে গিয়ে দাঁডাবার কথাটা বললেন না, ওরই জন্য তো আমরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাডি। আমার বাড়ি হলে, আমি বুড়োকে বলে দিতাম পরিষ্কার—বিয়েতে এস, পইতাতে এস, আগুন লাগলে এস, বাড়ির ঝগডা মিটোতে. এস, কিন্তু দোহাই তোমার, বাড়িতে কারও অসুখ করলে দেখতে এস না।"

"যা বলেছিস !"

"একটা কথা অনেকদিন আমার মনে হয়েছে, বুঝলি। নিজের ছেলের অসুখ করলে নিরাপদবাবু কি সে ঘরে ঢোকেন ?"

হাসি-তামাসার মধ্যে এই সমস্যার উপর ভোট নেওয়া হল দীর্ঘ আলোচনার পর। সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হয়ে গেল যে যেহেতু নিজের বাড়িতে অপয়ার

ধক থাকে না, যেহেতু যার নামে হাঁড়ি ফাটে তার বাড়িতেও রান্না হয়, যেহেতু মাছ ধরতে যাবার সময় যার মুখ দেখলে খালি হাতে ফিরতে হয় সেও প্রত্যহ মাছ খায়, সেইজন্য এই সভার মতে নিরাপদবাবু নিজের ছেলের অসুখ করলে রুগীর ঘরে ঢোকেন।

"পান আছে—মিঠে খিলি,—জরদা আছে—সিগারেট আছে—যার যা ইচ্ছা—পান জরদা সিগারেট তিনটেও নিতে পার ইচ্ছা করলে।"

দাড়িওলা-মহাত্মার এই শেষ চেষ্টাও বৃথা হল। বরঞ্চ ফল হল উলটো। সকলে চেপে ধরল দাড়িওলাদাকে—এ বিষয়ে তার মতটা জানবার জন্য।

"লোকের পিছনে লাগতে তোমরা এতও ভালবাস।"

"পিছনে আবার লাগলাম কোথায়। তোমার মতটা কি তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"আমি কিছু বলব না। বছরের প্রথম দিন পরনিন্দা করলে, সারা বছরটা এই কাজেই কাটবে।"

"ও বোঝা গেল। তুমি আমাদের স্বীকৃত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। তা তো হবেই।"

এ রসিকতার অর্থ এখানকার সবাই জানে। হেসে গড়িয়ে পড়েছে এ ওর গায়ে। দাড়িওলাদা নিজের কাঁচুমাচু মুখখানায় জোর করে হাসি আনবার চেষ্টা করছে। রসিকতাটা তাকে নিয়ে, তার মনের সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গাটাকে নিয়ে। অন্য লোকে কথাটা তার মুখের উপর খোলাখুলি বলে না, কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সে শিষ্টাচারের নিয়ম মানবে কেন? তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে ছাড়বে কেন? যারা যত অন্তরঙ্গ, তারা তত বেশী নিষ্ঠুর।

"দাড়িওলাদা, দু বছর হয়ে গেল এখনও তোমার মালিকের দোকানটা ফেল মারাতে পারলে না—এ কি রকম হল। তোমার নাম খারাপ হয়ে যাবে দেখছি এইবার।"

এতক্ষণে আক্রমণটা এসেছে। এইটারই তার ভয়। সে যার চাকরি করে তার ব্যবসাই ফেল করে, এই রকম একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা আছে

এখানকার লোকের মনে। এ ধরনের কথার প্রতিবাদ করলে আরও কথা বাড়ে, চটলে লোকে আরও বেশী করে ক্ষেপায়—এসব সে জানে। এসব কথাকে কৌশলে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়, কথা উঠবার সম্ভাবনা দেখলে গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিতে হয়, না হয় কাজের ছুতো দেখিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে হয়, তাও যদি সম্ভব না হয়—তবে সাবধান, চোখে যেন জল না আসে, মনের ব্যথা যেন চোখমুখে প্রকাশ না পায়, চেষ্টা করবে মৃদু হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে রাখতে। বিশ বছরের অভ্যাসে এসব তার আয়ত্ত হয়ে গিয়েছে। শুধু একটা দুর্নাম নয়; এ তার জীবিকা নিয়ে টানাটানি। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়, সতর্ক হয়ে থাকতে হয়। প্রাণের দায়ে সে সাধ্যমত এখানকার সকলকে খুশী রাখবার চেষ্টা করে, বুড়োদের খবরের কাগজ পড়ে শোনায়; মেয়েদের ফাইফরমাশ খাটে, ছেলেদের তো কথাই নাই। আঘাত থেকে বাঁচবার চেষ্টায় কতভাবে যে সে নিজেকে ছোট করছে নিজের কাছে অষ্টপ্রহর তার ঠিক নাই। চব্বিশ ঘণ্টা একটা কুণ্ঠিতভাব ঢাকবার চেষ্টা। দিনদিনই সঙ্কুচিত মনটাকে আরও নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে হয়। তার পেটের মৃদু ব্যথাটার চাইতেও এ ব্যথার অস্বাচ্ছন্দ্য অনেক বেশী। কিরকির করে বিঁধছে সব সময়। এর হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া। বোঝে সব, কিন্তু পারে না। উপায় যে নেই!…

তবু এক এক সময় মেজাজ ঠিক রাখতে পারা যায় না। "লোকের সুনাম করতেও তোমরা, দুর্নাম করতেও তোমরা! দশচক্রে ভগবান ভূত। লোককে পয়মন্ত করতেও তোমরা, আবার অপয়া করতেও তোমরা!"

এতক্ষণ বেলেখেলা চলছিল, এইবার আসর সত্যিকারের জমে উঠল।

"আচ্ছা আমি বলছি। এক-এক করে গুনে যা। পয়লা নম্বর—নতুন কাছারির কণ্ট্রাক্টর।"

"কণ্ট্রাক্টরবাবু সিমেণ্ট চুরি করায় ছাত ধসে পড়ল। আর আমি হলাম অলক্ষুণে?"

"দুই নম্বর—বেচুবাবুর মনোহারির দোকান।"

"টাকা ঢালবে না দোকানে। আমি বলে বলে হয়রান। কানেও তোলে না। যা খোঁজ তাই নেই। খদ্দের আসবে কেন? দোকান উঠে গেল কি আমি অপয়া বলে?"

"তিন নম্বর—ছকুবাবু আর গদাইবাবুর দেওয়া দোকান।"

"দুজনের মধ্যে যে যখন দোকানে বসে সে-ই টাকা হাতায়। দুজনেই মালিক; কাকে ঠেকাবে! ছকুবাবু কলকাতায় গেল বউ আনতে—বলল দোকানের মাল কিনতে যাচ্ছি। শুধু নিজের রাহা আর খাই খরচ নয়—ট্যাক্সিতে করে মুর্গিহাটা থেকে মাল কেনবার পর্যন্ত বিল করল দোকানের উপর। এ ব্যবসা যদি ফেল্ না মারে তবে ফেল মারবে কোন ব্যবসা?"

"চার নম্বর—শ্রীনাথবাবুর খবরের-কাগজ বিলি করবার কাজ।"

"হায়রে আমার কপাল! কলকাতার কাগজের অফিস থেকে তাগাদার পর তাগাদা আসে। ভদ্দরলোক নির্বিকার। কিছুতেই টাকা পাঠাবে না। মাঝে মাঝে দু দশ টাকা ঠেকিয়ে দেয়। এমনি করে আর কতদিন চলে? কলকাতার কাগজওয়ালারা তো আব দানছত্র খুলে বসেনি। তারা কাগজ পাঠানো বন্ধ করল। এর মধ্যে, আমি অমঙ্গলে কিনা সেকথা ওঠে কি করে?"

"পাঁচ নম্বর—হেমবাবুর মনিহারীর দোকান।"

"আরে বড়রাস্তার উপর না হলে কি মনিহারীর দোকান চলে? নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় দোকান খুলে বসে থাকল!"

"ছ নম্বর—পুঁটে, হাবলাদের চায়ের দোকান।"

"এই তো পুঁটে, হাবলা দুজনই এখানে রয়েছে। বলুক। তিন বন্ধুর টাকায় দোকান—সবাই নিজের-নিজের মত চাকরিবাকরি করে। দোকানে যা বিক্রি হয় সবই মনে করে লাভ। চপ কাটলেট খেয়েই দোকানটাকে উড়িয়ে দিল। কত সাবধান করে দিলাম—কে কার কথায় কান দেয়! ব্যবসা ফেল মারল কেন। না, দাড়িওলাদা অপয়া। বলো, তোমরাই বলো!"

"হাতযশ কি সকলের থাকে দাড়িওলাদা।"

"সাত নম্বর—"

"বলে যাও, বলে যাও।"

আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা ঝিমিয়ে এসেছে।

"আট নম্বর—"

"পেয়েছ ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো দাড়িওলাদাকে, বসে নাও।"

"ন নম্বর—"

"যে মরেই রয়েছে, তাকে মেরে আর লাভটা কি তোমাদের।"

নামের ফর্দ একজায়গায় শেষ হতে বাধ্য, তাই শেষ হল।

"আচ্ছা দাড়িওলাদা, যে কারণেই ব্যবসাগুলো ফেল্‌ করুক, এটা তো স্বীকার কর যে, তুমি যার চাকরি নিয়েছ সে-ই গণেশ উলটেছে ?"

"অন্যভাবে দেখ না কেন জিনিসটাকে। বলো না কেন যে ফেল্‌ মারবার মত ব্যবসাগুলোতেই আমার চাকরি জুটেছে বারবার। ভাল জায়গায় জোটেনি।"

"তাই বা হয় কেন ? ভুলে একবারও কি চলবার মত ব্যবসাতে তোমার চাকরি জুটল না ?

"আমার কপাল।"

সত্যিই এ প্রশ্নের জবাব নাই তার কাছে। কেন এমন হয় ? ভালভাবে স্থায়ী ভাবে চলবার মত কোন ব্যবসাতে কেন সে ঢুকতে পারে না ? তর্কের মধ্যে এইখানে পৌঁছবার পর আর পায়ের নীচে শক্ত মাটি পাওয়া যায় না। সে জানে যে অপবাদটা মিথ্যা, কিন্তু তার বলবার মুখ নাই। নিরস্ত্র সে। শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া, আর কোন গতি নাই তার। এখানে থাকবার দাম এই অপযশটুকু। থাকতে গেলে দিতেই হবে। সে হো-হো করে হেসে ওঠে। সে হাসি আর থামতে চায় না। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গেল। জেরায় কোণঠাসা হলে, এই রকমই করতে হয়। নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রূপে প্রাণ খুলে যোগ দিতে হয়, দলের সঙ্গে সঙ্গে। দেখাতে হয় যে, রসিকতাটা তুমিও তাদেরই মত উপভোগ করছ। তারা যদি দু পা যায়, তুমি আরও এক পা বেশী এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে বলো—"যাদের নামে হাঁড়ি ফাটে তাদের

হচ্ছে জেনারেল প্র্যাকটিস। আমরা হচ্ছি স্পেশালিস্ট। আমি ব্যবসাতে স্পেশ্যালিস্ট, নিরাপদ বাবু কঠিন রোগে স্পেশ্যালিস্ট, কিরণ রায় হচ্ছে পেনাল্টি শট্-এ স্পেশালিস্ট—ওর নাম নিলে কিছুতেই গোল হবে না"।

হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে আসে সকলের। দাড়িওলাদাটা এমন এমন কথা বলে। ·একেবারে হাসিয়ে হাসিয়ে মারে। এই জন্যই সকলের ওকে এত ভাল লাগে।

"একবার বোলো, দাড়িওলা—মহাত্মাজীকা জয়।"

·· এরা বোঝে না, তার দিক থেকে জিনিসটাকে ভেবে দেখে না; হাসিঠাট্টা করে। এই রকম নির্দোষ হাসিঠাট্টার থেকেই হয় অপয়া দুর্নামটার প্রথম আরম্ভ। তখন বোঝা যায় না। পরে কবে থেকে যেন উল্কির দাগের মত গায়ে আঁকা হয়ে যায়। ও দাগ ওঠে না। একবার অপয়া তো চিরকাল অপয়া। কেন তার এমন হল। এখানে আসবার আগে পর্যন্ত তো তার এ অখ্যাতি ছিল না। ছেলেবেলায় সে নিজেও হয়ত কত লোকের পিছনে লেগেছে, তাই বুঝি ভগবান তাকে শাস্তি দিচ্ছেন। হয়ত সময়টাই খারাপ পড়েছে তার—গ্রহ নক্ষত্র কত কিছু আছে তো। সেইটা কেটে গেলেই আবার ভাল সময় আসে। প্রতিবারই সে ভাবে এইবার বুঝি তার দুঃসময়টা কেটে গেল। কিন্তু কাটে কই। বিশ বছর হয়ে গেল। এই জায়গাটাই তার সইছে না বোধ হয়। হয় না এক রকম? এক এক জনের এক এক জিনিস সয় না? সেই রকমই কিছু হবে নিশ্চয়। ··কিন্তু পুরনো কথা মনে পড়ানো বর্ষারাতের ওয়াক পাখির ডাক, বিছানায় শুয়ে শুয়ে আর কোথায় পাবে? গঞ্জের বাজার ছাড়বার পর কত জায়গা তো ঘুরে দেখেছে সে' এমন মনেপড়ানি জায়গা যে আর নাই ভূভারতে। নিজের দেশের গঞ্জের বাজারে ফিরে যাবার পথ যে তার বন্ধ।

মালিকের বাড়িতেও আজ হালখাতার খাওয়া দাওয়ার জের চলেছে। দুচারটি অন্তরঙ্গ পরিবারের মেয়েরা নিমন্ত্রণ খেতে এসেছেন। দাড়িওলা মহাত্মা যখন বাড়ি পৌঁছল তখন তাঁরা খেতে বসেছেন।

সব বাড়ির মেয়েদের সঙ্গেই তার জানা শোনা। গেরুয়া কাপড় পর্নে, মাছ মাংস খায় না, যখন যে কাজ বলো হাসিমুখে করে দেয়, এর কথা ওর কাছে বলে না, কারও নিন্দা কুৎসার মধ্যে থাকেনা; তাই পাড়ার গিন্নীবান্নীরা সকলেই তাকে ভালবাসেন, তাকে বিশ্বাস পান; তার কাছে সংসারের সুখ দুঃখের গল্প করেন; তাকে দিয়ে লুকিয়ে গয়না গড়ান। সব বাড়িতেই তার অবারিত দ্বার। অদ্ভুত একটা সম্বন্ধ সে পাতিয়ে নিয়েছে এখানকার সব বাড়ির সঙ্গে, এই বিশ বছরের মধ্যে। পাড়ার পাঁচটা বাড়িতে তো সে চাকরিই করেছে এর আগে; তার উপর আছে গেরুয়া কাপড়ের পাসপোর্ট। সে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েদের খাওয়ার কাছে। তার বয়সী অন্য কোন পুরুষ মানুষের সাহস হত না মেয়েদের খাওয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার !

বেচুবাবুর স্ত্রী হেসে বললেন…"এতক্ষণে ছুটি হল মহাত্মার ? তোর খাওয়া হল না, আর আমরা খেয়ে নিলাম।"

বোধহয় একটু অপ্রস্তুত হয়েছেন! বাড়ির-ছেলে, রাঁধুনি বামুন, আর সন্ন্যাসী-ঠাকুর—তিন মেলালে যা হয়, তাই হচ্ছে দাড়িওলা মহাত্মার সম্পর্ক এই সব পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে।

"তাতে কি হয়েছে।"

"হবে আবার কি—তোর জন্য মিষ্টিটিষ্টি কিছু আর থাকবে না।"

"আমাদের মালিকানীকে মিষ্টিতে ফেল করানো এত সোজা নয়, বুঝেছেন। ও মালিকানী! শুনছেন! এদিকে! এই পাতে আর দুটো মিষ্টি দিয়ে যান! আর একটা রেণুদির পাতে!…… তা বললে কি চলে? একটা নিতেই হবে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে বেশী করে খাওয়া—ওদের ঘর ভাড়া নিয়েই তোদের দোকান। ওর খাতিরই আলোদা।"

"তা তো বটেই।……মালিকানী, আপনি দিয়ে দেন না পাতে!"

"মালিকানী আবার কি কথা? মা বলতে পারিস না?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ; আপনারাই বুঝিয়ে বলুন তো দিদি মহাত্মাকে; কি বিশ্রী শুনতে মালিকানী-কথাটা। আমি তো ওকে বলে বলে হার মেনে গিয়েছি।"

"মালিকানী কথাটাই ভাল। ওতে নিজের নিজের জায়গাটা সব সময় মনে থাকে দুজনেরই। যার যে জায়গা, বুঝলেন।"

হাসছে মহাত্মা।

"শোন কথা! একথার কোন মানে হয়!"

এই এক উত্তর মহাত্মার। বাঁধা উত্তর। বেচুবাবুব স্ত্রীর জানা। পাড়ার যার-যার বাড়িতে কাজ কবেছে সে সব বাড়ির গিন্নীদের জানা। সবাইকে সে একদিন মালিকানী বলেছে। সবাই সে সময় মালিকানী কথাটাতে আপত্তি করেছেন। কিন্তু সব সময় ওই এক উত্তর।..... নিজের নিজের জায়গা ঠিক থাকে।......জায়গার আবার ঠিক বেঠিক কী? কী ভাবে, কী বলে, কী করে, তা ওই জানে। মা বলতে না পারিস, মাসি, পিসি, খুড়ি, জ্যেঠিও তো বলা যায়।......

সবাই যে যার নিজের মত মানে করে নেন। কেউ ভাবেন, মা বলে বুঝি কোথাও ঠকেছে; দুঃখ পেয়েছে বোধহয়। কারও বা ধারণা যে, সে মায়েব মর্যাদা যাকে তাকে দিতে চায় না। কারও বা সন্দেহ যে, বয়সে বেমানান বলেই হয়তো তাঁকে মা বলতে চায়নি। কিংবা হয়তো নিজের মাকে নিয়েই মনেব ব্যথা ওব—কখনও বাড়ি যায় না—কাবও কাছে দেশের কথা বলে না—জিজ্ঞাসা কবলেও এড়িয়ে যায়।···পুরনো মালিকানীদেব মধ্যে বেচুবাবুব স্ত্রীই তাকে সব চেয়ে বেশি জানেন—তাঁদের বাড়িতেই সব চেয়ে বেশী দিন কাজ কবেছে কিনা। তাঁব ধারণা যে মহাত্মাব মতে মা সম্বন্ধটা স্থায়ী; মালিকানী সম্বন্ধটা সাময়িক, যেদিন ইচ্ছা ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া যায়।··· কতবার তাকে চাকরির জায়গা বদলাতে হয়—অতবার কি মা বদলানো যায়?......বলে ঠিকই। মা যদি—তবে বাবসা ফেল মাববার পরও বাড়িতে ছেলের মত রেখে খেতে দিলেন না কেন?.....মানুষটা একটু অদ্ভুত কিনা। কারও সঙ্গে মেলে না। এত মেলামেশা সকলের সঙ্গে, অথচ যেন আলগোছে মেশে। নির্লিপ্ত গোছের! এত হাসিখুশি, তবু যেন কোথায় ওর ব্যথা।...... বহুকাল আগে একদিন বলেছিল যে ছোটবেলাতেই ওর মা-বাবা দুজনেই স্বর্গে যান .....

অন্য নিমন্ত্রিতারা চলে যাবার পরও বেচুবাবুর-স্ত্রী কিছুক্ষণ থেকে গেলেন, মহাত্মার খাওয়ার কাছে বসবার জন্য। অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে এই সব ছোট ছোট না-চাইতে-পাওয়াগুলোকে, বড় ভয় ভয় করে মহাত্মার।

খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সে খুব সাবধান—শারীরিক কারণে। কিন্তু সেরাত্রে বেচুবাবুর স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে খাওয়াটা বেশী হয়ে গিয়েছিল। শেষ-রাত্রি থেকেই পেটের মৃদু-ব্যথাটা বাড়ে।......আবার বেশি বাড়াবাড়ি না হয়, সেবারকার মত !......সে-ই তার ভয়।......

সকালে দোকান খুলবার সময় শরীরটা ভাল লাগছিল না। ধুনুচিতে ধুনো জ্বালিয়ে ক্যাশবাক্সে ঠেকিয়ে প্রণাম করে। তারপর সেটাকে কুলুঙ্গিতে তুলে রেখে, নিজে বেঞ্চিখানার উপর কিছু-ক্ষণের জন্য শোয়। দোকানের কাজকর্মর জন্য যখন উঠতে হল তখন তার মেজাজ খারাপ। সারারাত ঘুম হয়নি ; শরীরে জুত পাচ্ছে না ; মালিক দোকানে এলে এখন একটু সাহায্য হত। কিন্তু মালিক যে ঘুম থেকে ওঠেন অনেক বেলায়। বয়স হচ্ছে তো। পেনশন নেবার পর 'প্রভিডেন্ট-ফাণ্ড' এর টাকা দিয়ে এই মুদিখানার দোকান খুলেছেন। কাচ্চাবাচ্চা অনেক ; তাই এই দোকান দেওয়া।

একজন খদ্দেরের জন্য আধসের নুন ওজন করতে করতে হঠাৎ তার হাত কেঁপে উঠল।..."দাড়িওলাদা ! দাড়িওলাদা ! মা ডাকছে—চল শীগগিরই !" খোকন ছুটতে ছুটতে আসছে—মালিকের ছোট ছেলে খোকন।...জোর তাগিদ দিয়ে মালিকানী অনেক সময়ই ডেকে পাঠান। গরম গরম মুড়ি খাওয়াবার জন্যও জোর তাগিদ, লক্ষ্মীর ব্রতকথা শোনাবার জন্যও জোর তাগিদ, আবার পাঁচিলে চড়ে শিম পেড়ে দেবার জন্যও জোর তাগিদ।... কিন্তু এর সুর অন্য—একেবারে অন্য রকম ! হঠাৎ মনে একটা ছেঁকা লেগে, আতঙ্ক ও অস্বাচ্ছন্দ্যের শিহর খেলে গেল সারা দেহে। কেন ডাকছে সে আন্দাজ করে নিয়েছে। ব্যাঙ আর পিঁপড়েরা যেমন করে আসন্ন ঝড়বৃষ্টির কথা জানতে পারে, তেমনি করে সে জানতে পেরেছে। অন্যদিন হলে সে জিজ্ঞাসা করত—"কেন রে ? মা কেন ডাকছে রে ?" কিন্তু এখন সে চুপ

করে থাকে—যতটুকু দেরি করা যায়—ছেলেটা আপনা থেকেই বলছে।... বয়সে ছোট না হলে প্রথম নিশ্বাসেই আসল খবরটা দিয়ে দিত !...

তার কথা যেন কানেই যায়নি এমনি ভাব দেখিয়ে মহাত্মা খদ্দেরকে বলে—"আধসের নুন। এই এস।"

"দেরি করছ কেন দাড়িওলাদা? মা যে এখনই যেতে বলেছে।"

"যে খদ্দের দোকানে এসে পড়েছে তাকে বিদায় করব, তবে তো যাব!"

অতটুকু ছেলে। খদ্দেরের প্রতি দোকানদারের কর্তব্যের কিই-বা বোঝে। তাড়া খেয়ে সে চুপ করে গেল। "তুই তাহলে দোকানে বস খোকন। কোন খদ্দের এলে বলবি যে দাড়িওলাদা এই এল বলে।"

"না না, মা দোকান একেবারে বন্ধ করে যেতে বলেছে। মা'র বড ভয় ভয় করছে।"...

বুকের স্পন্দন থেমে গেল এর পরের কথাগুলো শোনবার জন্য।

"...পায়খানা থেকে এসেই বাবার যে অসুখ করেছে।"

ধীরে সুস্থে দোকান বন্ধ করলে কি হয়; তালা দেবার সময় তার হাত কাঁপছে। রঘুয়া বাজার করতে যাচ্ছিল, জিজ্ঞাসা করল—"এমন অসময়ে যে দাড়িওলাদা?"

"মালিকানীর ডাক পড়েছে"—ঠোঁটের কোণে একটু হাসি।

দাড়িওলাদাকে পিছনে ফেলে খোকন ছুটে চলে গেল। সে হাঁটছে আস্তে আস্তে। মনের আলোড়ন চেপে একটা অবিচলিত শান্তভাব দেখাতে চায় বাইরের নিষ্করুণ পৃথিবীকে।

বাড়ি পৌছে দেখে, ডাক্তার তার আগেই এসে গিয়েছেন। পাড়ার দু-চারজন লোকও রয়েছেন। মেঝের উপর মাদুরে মালিক শুয়ে। বুকে ব্যথা; শরীর কেমন করছে, কথা বলতে পারছেন না, খুব গরম লাগছে। মালিকানী পাখার বাতাস করছেন। নডাচডা বারণ, তাই তক্তাপোশে পর্যন্ত উঠিয়ে শোয়ানো হয় নি। শক্ত অসুখ। মানসিক উদ্বেগ ঢাকবার চেষ্টা কারও নাই। ডাক্তারবাবু বড় ডাক্তারকে ডাকতে বললেন, একা নিজের উপর দায়িত্ব রাখতে ভরসা পান না।

…অক্সিজেন দেবার যন্ত্রটা এনে রাখা ভাল; এখানকার একমাত্র যন্ত্রটা খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে; হরিপুর হাসপাতালেরটা আনিয়ে নেন এখনই লোক পাঠিয়ে! একজন যাও চট করে কারও কাছ থেকে মোটর গাড়ি চেয়ে নিয়ে! দেরি কোরো না মোটেই! উনুনে এক হাঁড়ি গরম জল চড়িয়ে রাখ!…বড় ছেলেকে একখান টেলিগ্রাম করে দাও।

এতগুলি ছেলেপিলে ভদ্রলোকের। একটা ছেলেও এখনও মানুষ হয় নি।…মেয়ের বিয়ে বাকি।…

ডাক্তার বদ্যি লোকজন—মুহূর্তের মধ্যে একটা তছনছ কাণ্ড ঘটে গিয়েছে বাড়িতে। সদর দরজার বাইরে জন কয়েক ঘিরে দাঁড়িয়েছে বড়-ডাক্তার বাবুকে। তাঁর মতামতটা জানতে চায়।

…রুগীর জ্ঞান আছে; ভাল লক্ষণ; হার্টের অসুখ; একদিন এই রকম কাটলে তবে আশার কথা।…যত সময় কাটে তত বিপদ কমে এসব রোগে।…

দাড়িওলামহাত্মা বড ডাক্তারের পিছন থেকে বলে ওঠে—"মালিককে কত বারণ করি বেশী কবে খেতে। ব্লাড প্রেসারের রুগী—কাল রাত্তেও আধ সের মাংস খেয়েছেন। অল্প বয়সে যা সহ্য হয়, এ বয়সে কি তা হয়।"

এ তার আত্মরক্ষার অস্ত্র, এখন থেকে বলে রেখে দিল; পরে কাজে লাগলেও লাগতে পারে। শ্রোতাদেব সকলের মুখচোখ সে লক্ষ্য করছে। …সকলে রুগীর কথাই ভাবছে—তার কথাটা এখনও কারও খেয়াল হয়নি। কিন্তু সে আর কতক্ষণ।…কত লোক তো সেরে ওঠে এই ব্যারামের হাত থেকে। সে খবরের কাগজে পড়েছে কয়েক জন নামজাদা লোকের কথা, যাঁরা এই অসুখের ধাক্কা সামলে উঠে আবার নিজেদের কাজকর্ম করেছেন। "হে ভগবান, আমার মালিককে বাঁচিয়ে দাও।…আমার পাপ খণ্ডন কি এখনও হয় নি?"

"শরীরটা বেশী খারাপ লাগছে? বুকে একটু হাত বুলিয়ে দেবো? তবে? কি বলছ? কাকে খুঁজছো? মহাত্মাকে? মহাত্মাকে একবার ডেকে দেবো? ও মহাত্মা—শীগগির শোন— তোমাকে ডাকছেন!"

……মালিক ডাকছেন !…সে ঘরের ভিতর ঢুকল তাড়াতাড়ি। মালিকানী উঠে রুগীর পাশে তার বসবার জায়গা করে দিলেন। চোখের ভ্রূকুটিতে ছোট-ডাক্তারবাবু বুঝিয়ে দিলেন যে, কথাবার্তা বলে রুগীর বিশ্রামের ব্যাঘাত করবার সময় এখন নয়। মালিকের অসহায় চাউনি করুণ মিনতিতে ভরা। কি যেন বলতে চান। কি যেন অনুরোধ করতে চান।…

কি বুঝল না বুঝল সে-ই তা জানে। মহাত্মা আশ্বাস দিয়ে বলে—"সে সব কথা আপনি ভাবছেন কেন! দিনকয়েক বিশ্রাম কবলেই আপনি ভাল হয়ে উঠবেন। আমি তো রয়েইছি।"

তবু যেন একটু আশ্বস্ত হলেন মালিক। একটু স্বস্তি, একটু কৃতজ্ঞতা—মহাত্মার কথার উপর নির্ভর করা যায়!…

এইটুকুই তার তৃপ্তি। সবাই তাকে বিশ্বাস করে। কবেনি এক শুধু নিজের দেশের গঞ্জবাজারের সেই আড়তদার, যার গোলায় সে জীবনে প্রথম চাকরি নিয়েছিল।…মালিক এক দৃষ্টে তারই দিকে চেয়ে রয়েছেন! ঘর নিস্তব্ধ; শুধু পাখার শব্দটা শোনা যাচ্ছে।

বাইরে একটা মৃদুগুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল।

কে যেন কি জিজ্ঞাসা করছে আস্তে আস্তে।

"আমি ছিলাম গুটিপোকার ঘরে। হেমের ছেলে গাড়ি চাইতে গিয়েছিল, হরিপুর হাসপাতালে যাবার জন্য। তার কাছেই শুনলাম খবরটা।"

…গাড়ি চাইবার আর লোক পেল না!…আসছেন!…কান খাড়া হয়ে উঠছে সকলের।…ঠুকঠুক করে লাঠির শব্দ!…মুহূর্তের মধ্যে বুঝে গিয়েছে সকলে।…অবাঞ্ছিত শব্দটা এগিয়ে আসছে।…উঠনে…সিঁড়িতে… বারান্দায়। ছাই-এর মত সাদা হয়ে গিয়েছে মালিকানীর মুখ।…কোন রকমে কি শব্দটাকে আটকানো যায় না দরজার বাইরে! ডাক্তারবাবু, মহাত্মা কেউ কি পথ আটকে দাঁড়াতে পারে না ?· ·

মালিকানী মাথার কাপড় টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কেঁপে উঠেছে দাড়িওলামহাত্মার বুক। রুগীর চোখও আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে

উঠেছে। ডাক্তারবাবু পর্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়লেন; মালিকানীর দৃষ্টির অনুরোধ বুঝতে পারলে কি হয়—নিরাপদবাবুকে বারণ করবার সাহস এ শহরের স্থায়ী বাসিন্দা কারও নাই।···মহাত্মা এগিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে।·· আটকাবে নাকি তাঁকে দরজার বাইরে? হাজার হলেও ও বাইরের লোক; ও পারে বৃদ্ধের পথ আটকে দাঁড়াতে।···চোখাচোখি হল দুজনের।

নিরাপদবাবুকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল মহাত্মা। তার মুখের হতাশা ও বিরক্তির ব্যঞ্জনাটুকু বৃদ্ধের নজর এড়াল না। তিনি যে এখানে অবাঞ্ছিত তা তিনি জানেন। কত সময় তাঁর নিজের সম্বন্ধে কত টীকাটিপ্পনী তাঁর কানে আসে। সে সব গায়ে মাখতে গেলে চলে না। পাড়ার কারও অসুখ-বিসুখে তিনি কি কখনও না গিয়ে পাবেন? যে যা ইচ্ছা বলুক, তাঁকে তাঁর কর্তব্য করে যেতেই হবে—যতকাল বাঁচবেন। এতবড জীবনে, দশের জন্য তিনি কত কাজ করেছেন; কিন্তু ভয় বা স্বার্থে কর্তব্যপথ থেকে বিচলিত তিনি কখনও হননি।···শিখুক, দেখে শিখুক আজকালকার ছেলেছোকরারা! তারা বলে বড বড কথা—অচেনা মানুষের জন্য চোখের জল ফেলে—কিন্তু পাশের বাডির লোকটা না খেতে পেয়ে মরল কিনা সে খবর রাখে না!···উপদেশে কাজ হয় না, তাই তিনি নিজের আচরণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চান তাদের সম্মুখে। দেখে শিখুক!···

'ঠিক কি এসে জুটবে! গন্ধ পায়! তর্কে তর্কে থাকে।'—এই না-বলা কথাগুলো এসে বিঁধছে।···অকৃতজ্ঞের দল!·· কত সময় ভেবেছেন যে আর যাবেন না কারও বাড়িতে এ সব সময়ে।···কিন্তু তা বললে কি চলে?···

মনের কুণ্ঠা ঢেকে, তিনি স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন রোগীর মুখের দিকে।

দাড়িওলামহাত্মা সেই যে বেরিয়ে এল রুগীর ঘর থেকে, আর সে ঘরে ঢোকেনি। মালিকের বাঁচবার আশাটুকু তার মন থেকে উবে

গিয়েছে, নিরাপদবাবু এখানে আসবার মুহূর্তে।...কোন আশা নাই; আর কতক্ষণ টিকবেন সেই হচ্ছে এখন একমাত্র কথা!...নিজের পেটের ব্যথাটাও যেন এতক্ষণে তাকে বাগে পেয়ে, নতুন করে চেপে ধরল। সকলে জিজ্ঞাসা করছে তাকে রোগীর আধুনিকতম খবর। দায়সারা-ভাবে সে উত্তর দিচ্ছে সকলের প্রশ্নের—অনিশ্চিত, অস্পষ্ট জবাব।... যতটুকু স্থগিত করা যায়! কিন্তু সে আর কতটুকু! সবাই ওত পেতে রয়েছে যে শিকার ধরবার জন্য!

...প্রতি ক্ষেত্রেই তার বিভিন্ন মালিকের ব্যবসাটা না চলবার একটা করে ন্যায্য কারণ ছিল; কিন্তু লোকে তাকেই করেছিল নিমিত্তের ভাগী। এ দোকানটাও উঠে যাবে মালিকের মৃত্যুতে; তার অপয়া দুর্নামটা আবার আর একটা নতুন বার্নিশের পালিশ পাবে; তার অপযশের ভিত আরও একটু মজবুত হবে লোকের চোখে। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথাটা ভেবেই তার ভয়। আর যদি সে চাকরি না পায়! অপয়া বলে আর যদি কেউ তাকে কাজ না দেয়! তার নিয়মিত বাঁধা দুর্ভাগ্যের পর সে প্রতিবার নূতন চাকরি পেয়ে এসেছে; কিন্তু এবার যদি না পায়! তার দুর্নামের বনিয়াদ আগের চেয়েও একটু মজবুত হল বলেই, তার ভয় এত বেশী। যে চাকরি দেবে সে কি কথাটা না ভেবে পারে!...শেষকালে কি তাকে এখানে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে খেতে হবে? এর হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় এখান থেকে চলে যাওয়া—এখান থেকে বহু দূরে—যেখানকার লোকে তার অপয়া দুর্নামের কথা জানে না। সে পরিশ্রম করতে ভয় পায় না, বহু রকমের কাজ জানে; কাজ সে জুটিয়ে নিতে পারবে যেখানে যাবে সেখানে।... কিন্তু মন যে চায় না এখান থেকে চলে যেতে।..

মহাত্মা বাইরের বারান্দায় মেঝের উপর শুয়ে পড়ে। উপুড় হয়ে শুলে পেটের ব্যথাটা একটু কম থাকে। এই অসহায় পরিবারের এত বড় বিপদের কথাটা তার আর মনেও আসছে না এখন। নিরাপদবাবু কখন চলে গিয়েছেন তা সে খেয়ালও করেনি।

মালিক মারা গেলেন বিকালের দিকে। নিরাপদবাবু আবার এলেন। হেঁটে এসেছেন। শোকের বাড়িতে তিনি কখনও গাড়িতে আসেন না।...বাড়ির লোকের কান্নাকাটি কানে আসছে।...এই অঘটনের জন্য তারা নিশ্চয়ই তাঁরই দোষ দিচ্ছে।...তিনি দেখা করবার পর যেসব রুগী সেরে ওঠে তাদের কথা এখানকার লোকে ভুলে যায়; কিন্তু যারা মারা যায় তাদের কথাই মনে করে রাখে; সেইগুলোকেই অপবাদের নজির হিসাবে দেখায় সময়ে অসময়ে। অবিচার না?...এই বাড়ির লোকদের শোকদুঃখের জন্য কি সত্যিই তিনি দায়ী? উপস্থিত লোকরা তাঁকে বলছে না কিছু; কিন্তু তাদের বদ্ধ আক্রোশ তিনি অনুভব করতে পারছেন, কারও দিকে না তাকিয়েও। ঘরে ঢুকতেই মালিকানী কান্নার মধ্যেই চীৎকার করে উঠলেন—"যমদূতটা আবার এসেছে রে!"

...মিশে যেতে ইচ্ছা হয় মাটিতে! তবু তাঁকে বিচলিত হলে চলবে না। শেষ বারের মত একবার মৃতের মুখখানি দেখতেই হবে। তারপর আরও কত কাজ! আগে শ্মশানে যেতেন; আজকাল আর যান না। তবে শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সব ব্যবস্থা নিজে দাঁড়িয়ে করান।

এত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর কেবলই মহাত্মার কথা মনে পড়ছে।... একই অভিশাপ তাঁদের দুজনের উপরই।

"মহাত্মাকে দেখছি না?...শরীর খারাপ? কি হয়েছে? এই তো ওবেলাও দেখলাম ঘোরাঘুরি করছে!...তোমার আবার কি হল মহাত্মা?"

"একটা কলিক ব্যথা আমার মাঝে মাঝে হয়। ও কিছু না।"

"তোমার আর শ্মশানঘাটে গিয়ে কাজ নেই। ভেবো না। শুয়ে থাক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোন ভাবনাচিন্তা কোরো না!"

নিরাপদবাবুর কথার আন্তরিকতাটুকু সে ধরতে পারে। মুখে যা বললেন, তার চেয়েও বেশী যেন বলতে চান, এই রকম একটা ভাব তাঁর কথার মধ্যে স্পষ্ট ছিল। ঠিক কি বলতে চাচ্ছিলেন বোঝা গেল না।

'বল হরি হরিবোল' দিয়ে শব শ্মশানে নিয়ে গেল। মহাত্মার চোখের জল বাধা মানছে না। বড় ভাল লোক ছিলেন এ মালিক। তার সব

মালিকরাই লোক ভাল ; সকলেই তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে। এক শুধু সে বিষনজরে পড়েছিল গঞ্জ বাজারের সেই আড়তদারের।...এখনও ওয়াকপাখির ডাক কানে আসছে।...সব লোকজন চলে যাবার পরও নিরাপদবাবু রয়েছেন, বাকি কাজগুলো তদারক করতে। শ্মশান থেকে ফিরে আসবার পর লোকদের মিষ্টিমুখ করাতে হবে—অগ্নিস্পর্শ করাতে হবে—কিছু নিমপাতারও দরকার—সব ব্যবস্থা তিনি নিখুঁতভাবে আগে থেকে করে রাখতে চান। গাড়িতে তিনি যাবেন না আজ, তাই বৃদ্ধকে নিয়ে যাবার জন্য বাড়ির চাকর এসেছে প্রকাণ্ড একটা আলো নিয়ে।

আর কোন লোক নাই এখানে এখন। এই সুযোগটুকুই তিনি খুঁজছিলেন এতক্ষণ থেকে। চাকরের হাত থেকে আলোটা নিয়ে তিনি বাইরের বারান্দার দিকে এগিয়ে এলেন।

"এদিকটা যে একেবারে অন্ধকার। ওরা ফিরে এসে এইখানেই দাঁড়াবে প্রথম। আলোটা থাক এখানে, কি বলো মহাত্মা? থাক থাক্ উঠলে কেন? এখন কি রকম বোধ করছ?"

একটা নিবিড় একাত্মতা তিনি বোধ করছেন মহাত্মার সঙ্গে।.. আজ তাঁকে খোলাখুলি যমদূত বলেছে একজন, এই বাড়িতেই! ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না, অপয়া দুনামের ব্যথা, কেমন করে অষ্টপ্রহর মনের মধ্যে কিরকির করে বেঁধে।...তিনি মহাত্মার মনের নাগাল পান।...বুড়ো হয়েছেন ; কতদিন আর বাঁচবেন। কিন্তু মহাত্মাকে যে এখনও অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে।......ওর দুনাম কাটাবার একটা উপায় আছে—ওকে যদি আর কারও চাকরি না নিতে হয়! সেই জন্য তিনি একটা ব্যবস্থা করতে চান।...এ শুধু একজন লোককে সাহায্য করা নয়—একটা আদর্শকে সাহায্য করা—অমঙ্গলের বাহক হিসাবে যাদের উপর অযথা অপবাদ, তাদের খ্যাতি ফিরিয়ে আনবার জন্য, তাঁর সাধ্যমত এই সামান্য চেষ্টা। সমাজের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ একরকমের প্রতিবাদ আন্দোলন। এই অবিচারের প্রতিবাদ জানাবার জন্যই তিনি শত বাধা সত্ত্বেও মরণাপন্ন রোগীদের দেখতে যান...মাথা উঁচু করে, বুক ফুলিয়ে, দেখতে যান বটে ; কিন্তু তিনি জানেন, এর পিছনে কতখানি

ব্যক্তিত্ব, কতখানি মনের জোরের দরকার হয়। তিনি যা করেন, তা কি সবাই পারে ?…মহাত্মাকেই দেখ না—ভয়ে আধমরা হয়ে রয়েছে কালকের কথা ভেবে।… ‥

স্বভাব এমন হয়ে গিয়েছে যে, অপয়া দুর্নাম সংক্রান্ত কোন কথা, কারও কাছে বলতে লজ্জা লজ্জা করে—মহাত্মার মত আপনজনের কাছে পর্যন্ত। তার উপর চাকরটা আবার একটু দূরেই দাঁড়িয়ে।

গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে বললেন—"তুমি এবার একটা নিজের ব্যবসা আরম্ভ কর। যা লাগে, আমি দেবো।"

এর চেয়ে সংক্ষেপে বলা যেত না। এর চেয়ে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলবার দরকারও ছিল না।

…ভুল শুনল না তো ? নিজের কানকে বিশ্বাস করতে ভরসা পায় না মহাত্মা প্রথমটায়।…ব্যথার ব্যথী নিরাপদবাবুর সহানুভূতিতে ভরা মুখখানির উপর আলো পড়েছে।… ভিক্ষা দিচ্ছেন না। বন্ধু বন্ধুকে দিচ্ছে। শুকনো কর্তব্যনিষ্ঠার চেয়েও অনেক গভীর জিনিস ফুটে উঠেছে দরদী লোকটির চোখের লেখায়।…এতদিনে বুঝি তার শাপমোচন হল।…নিজের শরীর খারাপ, মালিকের মৃতদেহ এখনি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল, তারপর এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব, একটু দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে। আর একটু ভাববার সময় পেলে ভাল হত।… কিন্তু তার নিজের ব্যবসাও যদি ফেল করে। ভয়-ভয় করে। তাহলেও কি লোকে সেটাকে তার অপয়া দুর্নামের নজির হিসাবে ব্যবহার করবে না কি ? না শুধু অকেজো বলবে ? ঠিক বলা যায় না। ‥নিজের ব্যবসা কখনও চালায়নি—চিরকাল অন্যের ব্যবসাতে কাজ করে এসেছে—ঠিক বিশ্বাস পায় না নিজের উপর। এর চেয়ে উঠে-যেতে পারে না এই রকম একটা ব্যবসাতে, কোন ভাল ব্যবসায়ীর অধীনে সে যদি এখানে একটা চাকরি পায়, তা হলেই সব দিক দিয়ে সুবিধা। চাকরিও থাকে, দুর্নামও কাটে। ·

"আপনার ছেলে তো অতবড় একজন কণ্ট্র্যাক্টর, তাঁর ব্যবসাতে যদি একটা চাকরি· ····"

কথাটাকে শেষ করতে দিলেন না নিরাপদবাবু।

"না না, সে হয় না।"

হঠাৎ তিনি আলোটাতে পাম্প দিতে বসলেন।

"আপনার টাকার আমার দরকার নেই।"

দুজনের বলা-কথার পিছনের না-বলা কথাগুলো দুজনেই স্পষ্ট বুঝেছে।

নিরাপদবাবু গম্ভীর হয়ে চলে গেলেন।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত মহাত্মা সেইখানে শুয়ে শুয়ে কত কি ভাবল।... নিরাপদবাবুকে আব কি দোষ দেবে, তার নিজেরই যে নিজের উপর কত সময় সন্দেহ হয়! কত দিক থেকে, কত রকম করে সে নিজের সমস্যাটাকে ভেবে দেখে। যত ভাবে তত মাথা গরম হয়ে ওঠে, পরিবেশেব উপর একটা বদ্ধ আক্রোশে।...যে লোকটাকে মালিকানী যমদূত ভাবেন, সে পর্যন্ত তাকে চাকরি দিতে ভরসা পায় না! ঘেন্না ধরে যায় নিজের উপব! লোকে যখন তাকে এড়িয়ে চলতে চায়, তখন তার লাভ কি বেঁচে থেকে? বিনা অপরাধে চব্বিশ ঘণ্টা চোরের মত থাকার কোন অর্থ হয় না!...

এই হীন হয়ে থাকা, সকলের ঠাট্টার বিষয় হয়ে থাকা, অন্যের কৃপার উপর নির্ভর করে থাকা, লোকের আপদ হয়ে বেঁচে থাকার, কোন মানে সে আর খুঁজে পাচ্ছে না। নিরাপদবাবুব প্রত্যাখ্যানটাই তার মনে লাগছে সব চেয়ে বেশী করে। সে ধড়মড় কবে উঠে দাঁড়াল। সংকল্প সে স্থির করে ফেলেছে।.. তার অমঙ্গলের ধকল আর কাউকে সইতে হবে না!..

গোয়ালঘর থেকে গোরু বাঁধবাব দড়িটা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। নিশিতে-পাওয়া লোকের মত সে চলেছে অন্ধকার পথে। ঠিক কোথায় যাচ্ছে ভেবে বার হয়নি। কিন্তু জলকে কি বলে দিতে হয় কোন দিকটা নীচু? নিবাপদবাবু তার সঙ্গে আজ কথা বলতে আসবার সময়ের আগের জগৎটা নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছে মন থেকে। কেবল একটাই চিন্তা।...

বারোয়ারিতলার তেঁতুলগাছে ওঠবাব সময় ঘষড়ানি লেগে বুকের চামড়া ছিঁড়ে গেল সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নাই। পাখির ডাক আর ডানা-ঝটফটানির শব্দ তার কানেও ঢুকছে না। গায়ে ভিজে ভিজে কি যেন পড়ছে

মাঝে মাঝে, সেদিকে তার খেয়াল নাই। অন্ধকারে ঠিকমত ডাল বাছা শক্ত। হাতের কাছের একটা ডালে সে শক্ত করে দড়ির ফাঁসটা বাঁধে। আগে কি ছিল তা সে ভুলেছে; পরে কি আছে তার জন্য কোন চিন্তা নাই; জানা ও অজানার মধ্যের চুলচেরা জোড়ের দাগের উপর সে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ নিরাপদবাবুর কথা মনে পড়ল।

…কী আন্তরিক দরদভরা চাউনি। তাঁর চাউনির মধ্যে দিয়ে আজ যেটুকুনি সে পেয়েছে, সে জিনিস গত কুড়ি বছরের মধ্যে সে আর কারও কাছে পায়নি। জানা লোকদের মধ্যে আর কেউ তার দিক থেকে সমস্যাটাকে এমনভাবে ভাবেনি। তিনি যা করতে চেয়েছিলেন, তা আজ পর্যন্ত আর কেউ করতে চায়নি তার জন্য।…

…'যখনই ওই বুড়ো যমদূতটা বাইরের বারান্দায় ব্যথায় কাতর মহাত্মাকে দেখতে গিয়েছে, তখনই বুঝে গিয়েছি যে সময় ঘনিয়ে এসেছে দাড়িওলাদার' —কাল যদি লোকে বলে একথা!… কে তাদের বোঝাতে যাবে যে রোগে ভুগে মরা, আর আত্মহত্যায় মরা, এক জিনিস নয়! সকলে ওত পেতে থাকে! তার আত্মহত্যাটাকে নিরাপদবাবুর অপয়া-দুর্নামের একটা অতিরিক্ত প্রমাণ হিসাবে লুফে নেবে লোকে। যে অন্যায় অবিচার সহ্য করতে না পেরে, সে আজ মরতে চলেছে, সেইটাই প্রশ্রয় পাবে, যদি সে মরবার লোভ না ছাড়ে!…

দম-আটকানো সুরঙ্গপথের ফাটলের মধ্যে দিয়ে একটু যেন আকাশের আলো দেখতে পাওয়া গেল।

গাছ থেকে নেমে সে শহরের বাইরে যাবার পথ ধরে। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি আসবার মুহূর্তে, সে এখানকার জগৎটার থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল। সেই মরা জগৎটার দিকে ফিরে তাকাবার দরকার নাই আর। ওয়াকপাখিরা বৃথাই ডেকে ডেকে সারা হল, তাকে অপয়ার মায়াগণ্ডির মধ্যে আবার ফিরিয়ে আনবার জন্য।

*　　　*　　　*　　　*

"আপনারও তো ঘরবাড়ি রয়েছে ; তবু সেখানে থাকেন কত।" কথার পৃষ্ঠে বলা কথা। দাড়িওলা-মহাত্মা কিছু ভেবে বলেনি। একথা এর আগেও কত লোকের মুখে শুনেছি। বউদি তো উঠতে বসতে বলেন। তবু মহাত্মার মুখে কথাটা শুনেই মনে হল—সত্যিই তো। যেন ঘরবাড়ি ছেড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর কথাটা এই আমি প্রথম শুনলাম। ঠিক পালটা জবাব দিয়েছে আমার কথার। সত্যিই তো, কেন আমার মনের এই অস্থিরতা ?

শোনপুরের মেলায় সেই রাত্রিতে তাঁবুর মধ্যে মাটিতে খড় বিছিয়ে, তার উপর শুয়ে আছি। ঘুম কিছুতেই আসছে না—ধোঁয়া আর ধুলোর জন্যই বোধহয়। পাশে মহাত্মার নাক ডাকছে। শুয়ে শুয়ে কত কি ভাবছি। রেণু, রোদে-ঝলমল ক্রোটনগাছ, মুনিয়া, রঘুয়া, গুজরাতীর মা, দাড়িওলা-মহাত্মা, অঘোরীবাবার ধুনুচি—কত লোকের কত কথা মনের মধ্যে আসছে যাচ্ছে। · এই সব লোকগুলো, এই সব জিনিসগুলো কবে, কোন এক সময় যেন আমার মনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। কই রাজনৈতিক কর্মজীবনের কোন কথা তো এমনভাবে আমার মনের মধ্যে আসা-যাওয়া করে না। সে যুগে এত ভাবনা চিন্তার বালাই ছিল না আমার। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কি মনের অস্থিরতা বাড়ছে ? আমার জানা লোকদের তো দেখি ঠিক উলটো।

ওই তো রেণু—বিয়ের পর থেকে কি অশান্তিতেই তার কেটেছে। কিন্তু এতকাল পর ফিরে গিয়ে আবার তো সুখে শান্তিতে নিজের ঘর করছে। মুনিয়াকেই দেখ না। শ্বশুরবাড়িতে মন টিকত না। তারপর কতরকম দুশ্চিন্তার ঝড়ঝাপটা গেল তার উপর। এখন তো দিব্যি ঘর সংসার করছে।

রঘুয়া। ওই তো বয়স। এরই মধ্যে কত কি করেছে। ঘুরে ফিরে আবার নিজের ঘর দুয়োর নিয়ে বসবাস করছে। বউদি লিখেছেন—সেদিন বিয়ে করে বউ নিয়ে এসেছে রঘুয়া।

দাড়িওলা-মহাত্মা নিজেই বলেছে যে সে বেশ নিশ্চিন্ত আছে আজকাল। এমন সাধা ঘুমই তার প্রমাণ।

অঘোরীবাবার মত লোককেও আজ ঘুরে বেড়াতে হয় না এখান থেকে সেখানে। বাকিয়া-ভবানীপুরের শিবালয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে আরামে, কোন রকম দুশ্চিন্তা আছে বলে তো মনে হল না।

গুজরাতীর মাকে দেখলে এখন কে বলবে যে তার মন একদিন এত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। একদিন পালাতে গিয়েছিল, এ কথা মনে করে আজ সে হাসে। নিত্য নূতন পরিবেশ পাবার নেশা তাব বোধহয় কেটেছে।

কিন্তু আমার?

নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা মানুষের অদ্ভুত, কিন্তু যে ঘাটে যার সুর বাঁধা সেখানে না পৌছতে পাবলে তো তার মনের অস্থিরতা কাটে না।

বিপদ এসেছে, ঝড়ঝাপটা এসেছে, আবেগ এসেছে, চিত্তচাঞ্চল্য এসেছে, তারপব আবার নিজেব জায়গা থেকে বাইরে বাইবে থাকবার পালা শেষ হয়েছে মনেব।

এতগুলো জীবনেব বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোর মধ্যে এই বকম একটা ধাবা দেখতে পাচ্ছি।

এ ধারা এমন কেন?

হঠাৎ খেয়াল হল।

বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো এক সঙ্গে ঘটেনি। একটা ঘটে যাবাব পব আব একটা এসেছে। সেগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র বয়েছে। হয়তো আছে অনেক, নজরে পড়ছে আমাব একটা মাত্র। সুতোর মালায় গাঁথা··· প্রথমে গুজরাতীব মা, তাবপর অঘোবীবাবা, তারপর মুনিয়া, তারপব রেণু, তারপর দাড়িওলা মহাত্মা, তারপর রঘুয়া, তারপর—

···না না। তা কেন হতে যাবে। যে অজানা শক্তি কোন না কোন সময এদেব নিজেব জায়গা থেকে বাইবে ঠেলে দিচ্ছিল সেটার ধক মরেছে।

ধক মরা। বেশ কথাটি। গুজরাতীব মাযের মুখে শুনতে ভারী ভাল লেগেছিল। সে বলেছিল, 'এক জায়গায় বাঁধা পড়ে ধুন্দুচিটার ধক মবেছে'।

শুনে অতি কষ্টে হাসি চেপেছিলাম তখন—ওর অমন সুন্দর গল্পে বাধা পড়বে বলে।···

···দূর, তাও কি হয়!

আতঙ্কের শিহর লেগেছে মনে।

চুপিসারে স্থান করে নিচ্ছে ওই অকিঞ্চিৎকর জিনিসটা লোকের জীবনের মধ্যে! নিজের কাজ করে যাচ্ছে, অথচ প্রত্যেকে ভেবেছে যে সে নিজের নিজের যুক্তি বিচার খাটিয়ে কাজ করেছে!

অসম্ভব!

এই জন্যই কি, আসল সময়ে প্রত্যেকেরই যুক্তি বিচার, বিবেচনাগুলো এঁকে বেঁকে কি রকম যেন হয়ে গিয়েছে? নইলে সাধারণ সময়ের সঙ্গে মেলে না কেন?

না, না। ভাবতে পারা যায় না!

মুনিয়ার দেওয়া ধুনুচিটা আমার দেশের বাড়িতে রেখে এসেছি, সেই রকমই ন্যাকড়া জড়ানো আছে। আমি খুলেও দেখিনি।

ভয় থেকে বাঁচবার জন্য আঁকড়ে ধরবার মত কিছু খুঁজছি। একটা ক্ষীণ আশা জাগে মনে—গুজরাতীর মা অঘোরীকে যে ধুনুচিটা দিয়েছিল সেটা হয়তো অন্য ধুনুচি। তাই যেন হয়!··

যার হাতে যখন যাচ্ছে জিনিসটা, তখনই নিজের বাঁধা জায়গায় থাকা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অঘোরীকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, মুনিয়াকে স্বামীর ঘর ছাড়তে হচ্ছে, রেণুকে প্রথমে শ্বশুরবাড়ি পরে স্বামীর ঘরও ছাড়তে হচ্ছে, দাড়িওলামহাত্মা ছেড়েছে বাইশ বছরের থাকা শহর। বাচ্চা রঘুয়াকে সুদ্ধ কিছুদিনের জন্য পথ টেনেছিল। প্রতিক্ষেত্রে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি,—একি কাকতালীয় হতে পারে? বিজ্ঞানে তো এই রকম প্রমাণই খোঁজে।

অবিশ্বাস্য, তবু উড়িয়ে দিতে বাধে!

গুজরাতীর মা গল্পে গল্পে বলেছিল, তার ধুনুচির খুরোর দিকটা, মানুষের একজোড়া পায়ের পাতার আকৃতির, তামার না পিতলের

কোন ধাতুর যেন। মুনিয়ার দেওয়া ধুনুচিটা যদি অন্য হয়, তা হলে তবু মনে জোর পাই, তা হলে অন্তত বুঝতে পারি যে গুজরাতীর মায়ের সে মানসিক অস্থিরতা কাটবার সঙ্গে, ধুনুচিটা হস্তান্তরের কোন সম্বন্ধ নাই। যুক্তির শৃঙ্খলের বলয়গুলোর মধ্যে তবু একটা ভাঙে।...তাহলে তবু জোর করে, বাকি কয়েকটি ক্ষেত্রের প্রমাণকে অপর্যাপ্ত বলে খারিজ করে দিতে পারি।

মুনিয়ার দেওয়া ধুনুচিটা একবার দেখতে হয়। না দেখা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না! আমার যে সব গেল! বুদ্ধি, বিচার যদি অত ছোট হয়ে যায়, তবে কি নিয়ে থাকব! তা হলে যে আমার এতকালকার সব জিনিসের ভিত ধসে পড়ে! মরতে পর্যন্ত ভয় পাইনি কোনদিন, কিন্তু ভাবতেও ভয় পাচ্ছি একথা।...

ঘুম থেকে ঠেলে তুললাম দাড়িওলা-মহাত্মাকে। সবুর সইছিল না। সেই রাত্রের গাড়িতেই আমি শোনপুর থেকে রওনা হই।

বাড়ি পৌঁছেই ছুটে গেলাম পুঁটলিটা খুলতে। গেরো খুলবার সময় হাত ঠকঠক করে কাঁপছে। ঠিক সেই ধুনুচিটা!...আর আমার কোন আশা নাই! ভয় ভয় করেছে!...এ সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছতে চাইনি! ভয় কাটাতে হলে যে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারা চাই। আমি যে বুঝতে পারছি না কিছুই!...আমার অস্থিরতা কি ওইটার জন্যই? কিন্তু আমি তো ঘুরে বেড়াচ্ছি ধুনুচিটা আমার কাছে আসবার আগে থেকেই। তবু সাহস নাই ওটাকে আর আমার কাছে রাখবার। যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত, আমার স্বস্তি নাই। এখনও হার মানিনি কিন্তু ভয় পেয়েছি। সেই দিনই ছুটি গুজরাতীর মায়ের কাছে ধুনুচিটা ফিরিয়ে দেবার জন্য।

সেক্রেটারির কথা

এই অংশে বিশ্বাসজীর, এর পরের মনের ভাব ও আচরণ সম্পর্কিত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন তথ্য দিচ্ছি। এগুলোকে আমি সম্পূর্ণ অবিকৃত রাখছি এই জন্য যে, এগুলোর ভিত্তিতে কেউ ইচ্ছা করলে তাঁর সম্বন্ধে নিজের নির্ণয়ে পৌছতে পারেন। আমার নির্ণয়ের সঙ্গে হয়তো তা মিলবে না। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি ?

ধুহুচিটা ফিরিয়ে দিয়ে এসেই তিনি আমাকে ডেকে পাঠান, সব কথা বলবার জন্য। শুনে আমি অবাক।

"তা ওটাকে আবার ছুটতে ছুটতে গিয়ে গুজরাতীব মায়ের হাতে দিয়ে এলেন কেন ? ফেলেও তো দিতে পারতেন টান মেরে ছুঁড়ে যেখানে সেখানে ! বাসনের দোকানে বিক্রি কবে দিলেন না কেন ? জিনিসটার কারুকার্যের বৈশিষ্ট্য আছে বলছেন—তবে ওটাকে মিউজিয়মে দিয়ে দিতেও তো পারতেন ! ঠিক উথলি সামাট নিয়ে মুনিয়ার সতীথানে ছুটবার মত কাজ করেছেন আপনি বিশ্বাসজী !"

"বলছ তুমি ঠিকই, কিন্তু সে সব কথা তো মনে হয়নি তখন।"

দ্বিধা কুণ্ঠায় ভরা তাঁর কণ্ঠস্বর।

"কিন্তু বিশ্বাসজী,—আপনার ভয় পাওয়া মানেই যে হার মানা।"

"না! না! তা কেন হতে যাবে !"

ওঁর কথার স্বরে অসহিষ্ণুতার ঝাঁজ দেখে আমি অন্য কথা পাড়বার চেষ্টা করলাম।

"আপনার মন যা চায়, সেই ধরনের জিনিস আপনি খুঁজে খুঁজে বার করছেন না তো ?"

"ভগ্নদূত মনের মত খবর আনেনি, তার মাথাটা কেটে নিতে ইচ্ছা হয় নিতে পার ! কিন্তু আমিই কি চাই এ জিনিস !"

এই সময় কয়েকদিন তাঁর সঙ্গে কাটাই। হাসি-গল্পের মধ্যে তিনি বোধ হয় তাঁর ক্ষণিক পরাজয়ের গ্লানিটা ভুলবার চেষ্টা করতেন। একদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে শোনাচ্ছেন—নীচের অংশটা পড়বার পর থামলেন। চোখের কোণে প্রশ্নের কয়েকটা রেখা পড়ল। আবার পড়লেন আস্তে আস্তে। তারপর আর একবার আমাকে শোনাবার জন্য জোরে জোরে পড়লেন—

…"যেখানে ওর অন্তর্যামীর আসন পাতা
সেইখানে তাঁর পায়ের কাছে
রয়েছে কোন ব্যথাধূপের পাত্রখানি।
সেখান থেকে ধোঁয়ার আভাস চোখের উপর পড়ে
চাঁদের উপর মেঘের মতো
হাসিকে দেয় একটুখানি ঢেকে।"…

থেমে আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললাম, "ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছে!"
"কোনটা বড়? কী ঘটছে আসলে, না মানুষ তার কি ব্যাখ্যা দিচ্ছে?"
স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে আমার ধরনে উনি ঠিক ভাবছেন না সে মুহূর্তে।

এর পর অনেকদিন দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে। ধুনুচি ফেরত দিয়েও তাঁর মনের অস্থিরতা কাটেনি। কিছুকাল পর যেতেই রেণুদির মা বললেন—"এবার ঠাকুরপো বেরিয়েছে খাঁকির হাফপ্যাণ্ট পরে। আমাদের সঙ্গে পর্যন্ত বেশী কথা বলত না। হাতের রেখা গণনার আর জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর এক রাশ বই আনিয়েছে নতুন। সেইগুলোকেই দিনরাত নাড়াচাড়া করত। আর বাকী সময় বাগান—যা ওর চিরকাল আছে।"

বিশ্বাসজীর স্বভাবের আর একটা দিকের কথা এখানে উল্লেখ করছি, তাঁর সম্বন্ধে আপনাদের বিচারে কারও যদি কোন কাজে আসে, সেই কথা ভেবে। খবরটা তাঁর গল্পের পক্ষে প্রাসঙ্গিক কিনা বলতে পারি না। মেয়েমানুষদের সম্বন্ধে তাঁর মনের মধ্যে একটা শুচিবাই ছিল—যা তাঁর কথাবার্তায় অতর্কিতে প্রকাশ পেত। বুদ্ধদেব ভিক্ষুদের কবে থেকে আলাদা থাকবার ব্যবস্থা করে-

ছিলেন, চৈতন্যদেবের এবিষয়ে কি রকম কডাকডি ব্যবস্থা ছিল, এ সব গল্প তিনি বহুবার আমাদের কাছে করেছেন। আর একবারকার তাঁর একটা ছোট মন্তব্য আমার মনে আছে। আমাদের রাজনীতিক জীবনেব কথা। বিশ্বাসজীর সঙ্গে গিয়েছিলাম এক গ্রাম্য গৃহস্থের বাডিব একটা গোলমাল মিটাতে। গোলমালেব মূলে ছিল একটা পারিবারিক কলঙ্কের কথা। সেই সময় বিশ্বাসজী বলেছিলেন যে বাডি তয়ের কবাবাব সময়, এক ঘর থেকে অন্য ঘবে যাবার দবজা রাখতে নাই।···তাঁর এই শুচিসচেতনতা নিয়ে আমবা নিজেদেব মধ্যে হাসাহাসি করতাম সে যুগে।

তাঁব ওই হাফপ্যাণ্ট-পবে-বেবিয়ে যাবাব যুগের পর, আবাব যখন তাঁব সঙ্গে দেখা হয়, তখন তিনি খুব কম কথা বলেন। বাগানে পায়চাবি কবতেন যখন তখন।—বাত্রিতে পর্যন্ত। বাইরেব লোক কেউ দেখা কবতে এলে বিরক্ত হতেন, কিন্তু আমি গেলে বরঞ্চ খুশীই হতেন। দেখলাম যে ফুলবাগানের জন্য শাবীবিক পবিশ্রম কবেন খুব। কোদাল দিয়ে মাটি কোপানো, বাগানের রাস্তার জন্য সুরকি কোটা, সিমেণ্ট জমিয়ে ফুলের টব তয়েব করা, সব কাজ করেন নিজ হাতে। দেখালেন—সবুজ মাঠেব মধ্যে, সুইট অ্যালিসিয়াম নামের সাদা মবসুমী ফুলেব গাছ দিয়ে তিনি একটা বিরাট ঘডি এঁকেছেন। ঘড়িব কাঁটা দুটোও ওই ফুলের গাছেরই। সময়ের সংখ্যাগুলোও লেখা ওই দিয়ে। থোবা থোবা ফুলগুলো ছডিয়ে পডায়, সময়ের সংখ্যাগুলো খানিকটা আন্দাজে পডতে হয়। আমি বললাম—"হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন আপনি গোরুর গাডির চাকা আঁকতে চেষ্টা করেছিলেন—ঘডির ডায়াল না।"

"আগে তো এ জিনিসের অভিজ্ঞতা ছিল না। আবও অনেক বড করা উচিত ছিল।···অভিজ্ঞতা না হলে, বড করে ভাবা যায় না যে।"

বলতে বলতে দেখলাম একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। ভাবলাম যে তাঁর এত শখ আর পরিশ্রম কবে তয়ের করা ফুলের ঘডির প্রশংসা না করায় বুঝি একটু ক্ষুণ্ণ হলেন।

"আপনার ফুলের ঘড়িতে দেখছি চারটে বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়েছে।"

"হ্যাঁ।"

তিনি গম্ভীর হয়ে বাগানে পায়চারি কবতে আরম্ভ করলেন—আমাব কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে।

সে রাত্রিতে আমার সঙ্গে আর কোন কথা হয় নি। পরদিন সকালে চলে আসবার আগে, তাঁর সঙ্গে বাগানে দেখা করতে গেলাম। তিনি তখন দেখি একখান ডালায় মটর শাক তুলছেন।

"এখনই চলে যাবি? আমি যে তোর জন্য শাক তুলছি!" তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে, শাক খাওয়ার জন্য থেকে গেলাম সে বেলা।

খাওয়ার সময় তিনি বললেন—"বাঃ বেশ সুন্দর হয়েছে আজ অড়বের ডালটা!"

আশ্চর্য হয়ে বলি—"আপনি তো বিশ্বাসজী কোনকালে অড়র ডাল খেতে ভালবাসতেন না।"

"আরে আমি না ভালবাসি, তুই তো বাসিস।"

এক রেণুদি ছাড়া, আর কেউ বোধ হয় তাঁর কাছ থেকে এতটা স্নেহ পায় নি। তবু তিনি আমার কাছেও প্রকাশ করেন নি তাঁর মানসিক অস্থিরতা ঠিক কিসেব জন্য। এক শুধু সেই নিজের গল্প বলবার সময় সেবার যেটুকু বলেছিলেন সেইটুকুনি ছাড়া। নিতেও পারছেন না, ফেলতেও পারছেন না—এইটাই ছিল তখনকার মনের ভাব। সেই অবস্থাটাই কি চলছে? দেখছি যে অষ্টপ্রহর নিজের মন ভোলাবার খেলনা খুঁজছেন। বাড়ীর দরজা জানলায় নিজে হাতে রঙ করছেন, সিমেণ্ট দিয়ে বাগানে পাহাড় তৈরী করছেন, ক্রোটন গাছটাতে গোবর গোলা আর নুনের জল দিচ্ছেন, রঙের জেল্লা বাড়াবার জন্য।...তবে কি তিনি নিজেও জানেন না, কি খুঁজছেন তিনি?

হতে পারে, কিন্তু আমি সঠিক বলতে পারি না। কেন না তাঁর একটা কথায়, আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল। একদিন জ্যোতিষশাস্ত্র

নিয়ে কথা হচ্ছিল। হাতমোড়া থেকেই হাতের রেখাগুলোর সৃষ্টি। হাতের রেখার সঙ্গে লোকের জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তা তিনি জানেন না ঠিক। তবে গত বছর কাশীতে তিনি কয়েকমাস ডান হাতেব পাতা দড়ি দিয়ে এক রকম কবে বেঁধে বাখতেন।

"প্রাণপণে চেষ্টা কবেছিলাম। এখন ছেড়ে দিয়েছি।"—এই বলে তিনি হাসলেন।

"সে তো বিশ্বাসজী, ছুরি দিয়ে কেটেও হাতেব তেলোয় ইচ্ছামত দাগ কবে নেওয়া যায়।"

আমার কথায় বিদ্রূপেব আভাস পেয়ে, তিনি চলে গেলেন বাগানে পায়চারি কববার জন্য।

আমারও মনটা খাবাপ হয়ে গেল। শেষকালে কি তাঁর মাথা খাবাপ হয়ে যাচ্ছে না কি আস্তে আস্তে। তবে একটা জিনিস পেলাম এর থেকে। তিনি কি খুঁজছেন, তা বোধহয় তিনি জানেন। না শুধুই পবীক্ষা করছিলেন নিজেব উপব প্রয়োগ করে? কে জানে।

এবপব দুই তিন বছর বিশ্বাসজী বাড়ি ছেড়ে বার হননি। সেই যবে থেকে বিশ্বাসজী বাজনীতি ছেড়েছিলেন তবে থেকেই জেলাসুদ্ধ লোক জানত যে তিনি 'সাধু' হয়ে গিয়েছেন। এক নিশ্বাসে একথাও বলত যে তিনি চিবকালই 'সাধু আদমী'—যখন রাজনীতিতে ছিলেন তখনও তাই ছিলেন—এখন তো একেবারে "যোগীজী মহারাজ" হয়ে গিয়েছেন—গেরুয়া কাপড় না পরলে কি হয়—হিমালয়েব গুহায় না থাকলেই বা কি হয়—বাড়িখানাকে একেবারে যোগীজীর আশ্রম করে রেখেছেন দেখিস না। তবে যোগীজীমহারাজ কারও সঙ্গে দেখা করেন না, এই যা দুঃখ। শহরে নিজের কাজে এসে গ্রামের লোকরা কেউ কেউ গেটের গবাদেব ফাঁক দিয়ে দূর থেকে তাঁকে দেখে কৌতুহল চবিতার্থ করে যায়। খালি গা, খালি পা, লুঙ্গির মত করে কাপড পবা, মাটিব দিকে দৃষ্টি—বিশ্বাসজী পায়চাবি করছেন। কখনও কারও

দিকে তাকালেও সে চাউনির মধ্যে যেন পরিচিতির সাড নাই। না বললেন কথা, কিন্তু এমন লোককে দেখেও আনন্দ। কাছে একটু বসতে পেলে কত ভাল লাগত আরও। কিন্তু রঘুয়াটা যে কাউকে ওঁর কাছে ভিড়তে দেয় না!

স্থানীয় লোকদের মধ্যে অনেকের রঘুয়াকে উপেক্ষা করে, গেট খুলে ভিতরে ঢুকবার সাহস ছিল। তারা বলত যে তাঁব কাছে এসে চুপচাপ বসে থাকতেও খুব ভাল লাগে।

আমার নিজের তো তার কাছে থাকতে চিরকালই ভাল লাগে। আর আমার সঙ্গে একটু-আধটু কথাও বলতেন। কথাগুলো খুব গোছালো নয়, শোনবামাত্র মানেটা সব সময় বোঝা যায় না, অথচ মানে নাই বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবহেলায় ছিটিয়ে ফেলা কথাগুলো, যেন একটু ভেবে মানে বাব কবতে হয়।

রেণুদির মা একবার বললেন—"রাতে যে ঘুময় কখন, আজকাল বোঝা যায় না। জেগে থাকে। জপতপই করে বোধহয়, নইলে সারা বাত জেগে বসে কত কি ভাববে? তবে পায়চাবি করবাব ঝোঁকটা কেটেছে বোধ হচ্ছে। আর সেই মাঝে মাঝে আপন মনে 'কানাগলি' কথাটা বলে ওঠা, সেটাও শুনছি না কিছুদিন থেকে। শরীবই ভাল যাচ্ছে না নাকি বুঝতে পারছি না। খাওয়া দাওয়া একেবারে কমিয়ে দিয়েছে। মাঝে মাথা ঘুবছিল কয়েকদিন। তার জন্য এবাব হোমিও-প্যাথিক ওষুধ খেয়েছে।..."

শেষের কথাটা ফিস ফিস কবে বলা। সত্যি উল্লেখযোগ্য সংবাদ। বিশ্বাসজী হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেয়েছেন। তাঁর অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ছাড়া কেউ বুঝবে না, এ সংবাদের কত গুরুত্ব তাঁর মনের পরিবর্তনের দিক দিয়ে। আমি জানি তাঁর কাছে এর অর্থ চোখ খুলে না বোঝার কাছে আত্মসমর্পণ!...তবে কি তাঁর খোঁজা শেষ হয়ে গেল? নিরস্ত্র হলেও শুধু হাতে লড়বার লোক যে তিনি! জানি তো তাঁকে।...

মনের অস্থিরতা যে তাঁর কাটেনি, সে কথা যে ঘটনা থেকে বুঝলাম

সে ঘটনার বিবরণ এইবার দিই। এই সময় একবার এখানে হঠাৎ দারুণ বন্যা আসে। এতকাল দেখতাম, পরিবেশের কিছু যেন তাঁর নাগাল পেত না। এবার কেন যেন বিশ্বাসজী আমাকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন বন্যাপীড়িতদের সেবায়। মাত্র চার পাঁচদিনের ব্যাপার। রিলিফ ক্যাম্পের কাজের জের তখনও মেটেনি। হঠাৎ আমাকে বললেন, 'চল বাড়ি যাই।' চিরকাল তাঁর নিরাসক্তির মধ্যেও নিজের বাড়িটার উপর একটা মোহের ভাব লক্ষ্য করে এসেছি। কাজ ফেলে, তাঁর সঙ্গে বাড়িতে ফিরে এলাম। এসে দেখি, রেণুদি আর তার স্বামী আগের দিন এসেছে। প্রণাম করল তারা বিশ্বাসজীকে।

তিনি আমাকে দেখিয়ে বললেন—"বউদি, তোমার মেয়ে জামাই এসেছে; ভালমন্দ খাওয়া দাওয়া হবে নিশ্চয়। তাই একে ধরে নিয়ে এলাম সঙ্গে করে।"

এত হাসিখুশি তাঁর বহুকাল দেখা যায়নি।

খাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করলেন, "অড়রের ডাল রেঁধেছিস নাকি রেণু?"

"পোলাওএর সঙ্গে অড়রের ডাল আবার কি হবে!"

বিশ্বাসজীর মুখে দেখলাম কৌতুকের হাসি। হাসির লক্ষ্য আমি।

এ হাসিখুশির আতিশয্য বেশীক্ষণ টেকেনি। দুপুরে রেণুদির মা কথা পাড়লেন তাঁর কাছে।

"রেণুর ইচ্ছা দীক্ষা নেয়। ছেলে নেই পিলে নেই। আমিও বলি দীক্ষা নেওয়াই ভাল। মণিরও তাই মত। আমি বলেছিলাম আমাদের গুরুদেবের কাছে মন্ত্র নিতে, তিনি ডবল এম. এ.। কিন্তু রেণুর ইচ্ছা তোমার কাছ থেকে নেয়। নিজে বলতে সাহস পায় না। আমাকে বলতে বলল।"...

রেণুদির মা বলতে বলতে থেমে গেলেন দেওরের মুখের ভাবে একটা কিছু লক্ষ্য করে।

ভয় পেয়ে চমকে উঠেছেন বিশ্বাসজী। তারপর কোমল শান্ত মুখে কঠোর গাম্ভীর্যের রেখা পড়ল। একটা খুরপা হাতে নিয়ে তিনি বেরিয়ে

গেলেন বাগানে কাজ করতে। জামাইএর সম্মুখে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা ঠিক হবে কিনা বুঝতে না পেরে, আমি রেণুদির মা দুজনেই চুপ করে গেলাম।

তাঁর গাম্ভীর্যে আমরা সকলেই একটু কিন্তু কিন্তু হয়ে ছিলাম সারাদিন। রাত্রিতে তিনি খেতেন না কিছু অনেকদিন থেকে। আমরা খাওয়া দাওয়া সেরে সবাই তাঁর ঘরে এসে বসলাম। তিনি বসে ছিলেন। তাঁর আদরের পাতাবাহার গাছের ডাল একটা দেখলাম সম্মুখে রাখা। একটু যেন চিন্তিত মনে হচ্ছে। তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁর সম্মুখে বসে আমরা নিজেদের মধ্যে গল্প করব, সে সাহস আজ আমাদের নাই। অনেকক্ষণ ধরে সবাই চুপচাপ। বাইরের বারান্দায় এক বালতি জল রেখে, রঘুয়াও এসে দাঁড়াল দোর-গোড়ায়।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল।

"দূর, তোরাও যেমন।·· কেউ আবার দেয় নাকি? নিতে হয়! · কত পাওয়া, কত নেওয়া···তোদের সকলের কাছ থেকেই। অঘোরী, গুজবাতির মা, মুনিয়া, সব। কাকে ছেড়ে কাকে রাখি! কিন্তু সব চেয়ে বেশী পেয়েছি দাড়িওলা-মহাত্মার কাছ থেকে।·· হ্যাঁ দাড়িওলা-মহাত্মার কাছ থেকে।··· রঘুয়া, মনে আছে, কাশীতে তুই বলেছিলি কম গুরু, বেশী-গুরুর কথা?···বেশ কথাটি। কেউ বেশী-গুরু, কেউবা কম-গুরু।···জিনিসগুলো, ঘটনাগুলো পর্যন্ত।···পরে বোঝা যায়।···আরে বুঝবি কি ছাই! ··ছোট না করে নিলে ধরতে পারা যায় না, আবার বড না করলে বোঝা যায় না। ··আরও বড, আরও বড়।"···

মণির দিকে তাকিয়ে বললেন—"ছোট করিস না কখনও!"

রেণুর হাতে দিলেন ক্রোটনের ডালটা।

আমাকে বললেন—"নিজে তুই যা, তাই হবি, বুঝলি!"

তারপর তিনি উঠে বেরিয়ে গেলেন, অন্ধকারে বাগানে পায়চারি করতে। যাবার সময় রেণুদির মুখের দিকে একবার তাকিয়ে গেলেন।

আমি তাঁর অধিকাংশ কথারই মানে ঠিক ধরতে পারিনি। ভুল হতে

পারে, কিন্তু রেণুদিব চোখমুখ দেখে আমার মনে হল ও যেন জানে পাতাবাহার গাছটার সঙ্গে বিশ্বাসজীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের রহস্যটা।

এই আমাদের শেষ দেখা বিশ্বাসজীর সঙ্গে। পরের দিন সকালে আর তাঁকে দেখতে পাইনি। একবস্ত্রে চলে গিয়েছেন। পাতাবাহারের গাছটা গোড়া থেকে কাটা, তুলসীমঞ্চেব তুলসী গাছটা উপড়ানো।

এবপব বহুদিন কেটে গিয়েছে। বহুদিন ভেবেছি তাঁর অদ্ভুত আচরণের কথা। বহু বছব আমবা অপেক্ষা করেছি তাঁব ফিবে আসবার—এরকম তো এর আগেও কতবার গিয়েছেন। কিন্তু এবার তিনি ফেরেন নি। কার্যোপলক্ষে একবার পশ্চিমে গিয়েছিলাম। কাশীতে 'ব্রেকজার্নি' করে সারাবাত বসেছিলাম অহল্যাবাই ঘাটের চাতালের উপর, মনে একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে। ছেলেমানুষি আচরণ সন্দেহ নাই, কিন্তু তবুও ছিলাম। বলা বাহুল্য যে মিছামিছিই ছিলাম।

তাঁর বাগানের পাঁচিল পড়ে গিয়েছে। কোথাও কোথাও তার উপর বট-অশথের গাছ বেরিয়েছে। যেখানে বাগান ছিল সেখানে দিনে গোরু চরে এখন। বিকালে ছেলেবা, তাঁবই গাছের বাতাবিলেবু দিয়ে ফুটবল খেলে।

মিউনিসিপ্যালিটি ট্যাক্সেব পাওনায় প'ড়ো বাড়িটা নিলাম করাচ্ছিল। আমাব চেষ্টায় ও পাড়াব দশজনের সহযোগিতায় বেণুদিদেব পক্ষে বাড়িখানা জলেব দামে কেনা সম্ভব হয়েছিল। আইনতও নাকি বেণুদিবাই এবাড়ির

উত্তরাধিকারী ; কত বছর নিখোঁজ থাকলে লোকে যেন মৃত বলে গণ্য হয় আইনের চোখে ; তাছাড়া এ বাড়ি তাঁরা দশের কাজেই দিয়ে দিতে চান। এই সব কারণে সকলেই এই বাড়ি কেনায় রেণুদিদের সাহায্য করেছিল।

তারপর রেণুদি ও তার স্বামীর চিঠি পাই। ওই বাড়ি সম্বন্ধে সলা-পরামর্শ করবার জন্য তাঁরা আমাকে একবার যেতে লিখেছেন। জোর তলব।

রেণুদির শ্বশুরবাড়ির উঠনে ঢুকতেই প্রথমে নজরে পড়ল সেই চেনা জাতের পাতাবাহারের একটা গাছ। সযত্নে রাখা। মুখে আসা একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে থেমে গেলাম!

রেণুদি দেখলাম পুজো-আচ্চা জপতপ নিয়ে মেতে আছে আজকাল। বাড়িখানা কি উদ্দেশ্যে দান করা যায়, সেই কথাই সে আলোচনা করতে চায় আমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে বিশ্বাসজীর সম্পর্ক কত অন্তরঙ্গ ছিল, সেকথা তার চেয়ে ভাল করে বোধহয় আর কেউ জানে না। তাই আমার মতামতের দাম আছে তার কাছে।

বিশ্বাসজী বারবার ঘুরে ফিরে কাশীতে যেতেন ; বাবা বিশ্বনাথ তাঁকে বারবার কাছে টানতেন ; তাই তাঁর আত্মার তৃপ্তির জন্য রেণুদির ইচ্ছা বিশ্বাসজীর বাড়িতে একটি শিবালয় প্রতিষ্ঠা করা।

আমি বললাম—"না না! ও বাড়িতে একটা লাইব্রেরি হবে তাঁর নামে।"

